প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। । বৈশাখ ১৩৩৪।



সম্পাদক—

নমুনা সংখ্যা ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ ও প্রকাশক—শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য, বি, এ।

কার্য্যালয়—৭৯।২৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

ধূপছায়ার নিয়মাবলী

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ধূপছায়ার বৎসর গণনা করা হয়। ধূপছায়ার গ্রাহক মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ২॥০ টাকা; ষান্মাসিক ১৸০। নমুনার মূল্য ৵০ আনা ডাকমাশুল সমেত ।০ আনা অগ্রিম দেয়। ভারতের বাহিরে সর্ব্বত্র বার্ষিক ৪৲ টাকা।

মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

প্রতি বাংলা মাসের ১০ই তারিখের ভিতর ধূপছায়া না পাইলে ডাক বিভাগের মন্তব্য সহ সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের নিকট অপ্রাপ্তি সংবাদ জানান আবশ্যক।

অমনোনীত কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। উপযুক্ত ডাক টিকিট সঙ্গে না থাকিলে পত্রোত্তর বা অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। ফেরত রচনাদি লেখকদিগের নিকট পৌঁছান সম্বন্ধে আমরা দায়ী নহি।

কোন মাসের বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে তাহার আগের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়। বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ফেরত লইলে ভাল হয়। নতুবা ব্লক হারাইয়া গেলে বা কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপন দিতে অথবা এজেণ্ট হইতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিবেন।

বিজ্ঞাপনের হার—

কভার সামনের পৃষ্ঠা অৰ্দ্ধেক		—	১০৲	
,, দ্বিতীয় পৃষ্ঠা	সম্পূর্ণ	—	১২৲;	অৰ্দ্ধেক ৭৲
,, তৃতীয় পৃষ্ঠা	,,	—	১০৲;	,, ৬৲
,, শেষ পৃষ্ঠা	,,	—	১৪৲;	,, ৭॥০
সাধারণ প্রতিপৃষ্ঠা	,,	—	৮৲;	,, ৪॥০

অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানের দাম সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া জানুন।

নিবেদক

শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য বি-এ.

কার্য্যাধ্যক্ষ-ধূপছায়া

৭১।২৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিতে হইলে ধূপছায়ার নাম উল্লেখ করিবেন।



(মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৩৪ সাল

সম্পাদক

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

ধূপছায়া কার্য্যালয়।

৭৯/২৩ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বিষয় সূচী।

বৈশাখ—১৩৩৪ সাল।

ধূপছায়া

আনার-কলি

—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৈতের হাওয়া কেবলি শুধিয়ে চলেছে ডালিম ফুলকে—বলি তোর আপন কই সে! খবর পাচ্ছেনা হাওয়া—পাচ্ছেনা সন্ধান!

ফুলবাগানে বুল্‌বুল্‌ বৃথাই গুল্‌তন্‌ করে—ডালিম ফুলের আপনার যে তাকে দেখেনা—কোথাও!

ফুলের পাশে আছে নব-মঞ্জরী তাকে শোধায় রোদ—ডালিম ফুলের গোপন কথা—তরুণ সে আলো ভাবে বুঝি ডালিম ফুল হল তারি রঙ্গে রঙ্গী!

আছে গাছের ছায়ায় ছায়া মিলিয়ে ডালিম ফুলের আপনার সে! আছে সে রোদের পাশেই, রাতের নীলে একেবারে লুকিয়ে!

ভাঙ্গা বাগানে আনারগাছ শিউরে ওঠে রহে রহে, বলে—চৈতবাতাসে এই বুঝি ছেঁড়ে বোঁটার বাঁধন ফুল আমার—ফল আমার—পাতা আমার!

১৪ই চৈত্র ১৩৩৩

মাঙ্গলিকী

—শ্রীকল্পনা দেবী।

ভগবান—ভগবান !
যে আজি ঊষায় আঁখি মেলি' চায়
কোরো তার কল্যাণ।
কাল সমুদ্রে কত তরঙ্গ—
কত বুদ্বুদ জাগে—
ক'টি প্রাণ পায়,— ক'টি বা হারায়,
সংখ্যা কোথায় লাগে !
কেন তারা আসে, কেন তারা হাসে,
কোথা তারা হয় হারা ?
জানি না কো মূঢ়, তথ্য নিগূঢ়
শুধু কেঁদে হই সারা।
তবু জানে মন তুমি নারায়ণ
রাখ সবই সন্ধান,
ভগবান—ভগবান !

অরুণের গতি পথে,
ওই যারা আসে নব আশ্বাসে
উদয় অচল রথে—

তারা কি পাবে না সারা জীবনের
ভাগ্যেরি শুভযোগ ?
আলো, গান, হাওয়া, সুশীতল ছায়া
করিবে না উপভোগ ?
এখনি তাদের মুক্ত আকাশে
যদি গর্জ্জায় বাজ,
প্রথম উষায় রাত্রি ঘনায়,
অকালে ফুরায় কাজ—
সেই কি কপাল ? এ বারের মত
প্রাপ্য কি তার সেই ?
নত মস্তকে মেনে নিতে হবে
অভিযোগ কিছু নেই ?
না না নিষ্ঠুর, তারো বাজে ব্যথা,—
তারো জাগে অভিমান ;
জান তুমি,—ভগবান !

সার্থক কোরো তারে,
দীপ্ত ধূপের প্রখরতা—প্রভু,
সিঞ্চিয়ো সুধাধারে।
পিয়াস তাহার মিটায়ো পিয়ায়ে
স্নিগ্ধ সুপেয় বারি,
কঠোর আঘাত যদি দাও,—দিয়ো
সান্ত্বনা সাথে তারি ;
পথ খানি তার কোরো মনোরম,
কোরো আলো-ছায়া-ঘেরা !

তোমারি করুণা লব্ধ পরাণ—
পাক্ তব স্নেহ ধারা।
শিব, শিব, শিব, ঘুচায়ে অশিব
কোরো তারে সুমহান্,—
ভগবান—ভগবান!

জংলাপাখী

—শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

সন্ধ্যেবেলা ...

সমস্তদিন বৃষ্টির পর বিকেল বেলাটার দিকে আকাশটা একটু ধরেছে! সমস্ত রাস্তা পঙ্কিল কাদায় আচ্ছন্ন নোংরা হয়ে আছে। সহরের উন্মুক্ত চওড়া রাজ পথে গাড়ী ঘোড়া লোকজন চলাচলের কিন্তু বিরাম নেই! ... ...

জলে আধভেজা ময়লা শতছিন্ন উড়্নিটা মাথায় পাগড়ী করে বেঁধে বাবুলাল মোড়ের এক কোনে এসে দাঁড়াল। হাতের শালপাতার ঠোঙা থেকে মিইনো মুড়িক'টা মুখে পুরে শূন্য ঠোঙাটা ছুড়ে ফেলে এ পাশটায় একটু সরে এল।

ট্রামের অপেক্ষায় সুবেশধারী এক ছোক্‌রা বাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট ফুঁকছিলেন—বাবুলাল তারই সামনে হাতটা পেতে অভ্যাসমত বুলি আওড়ালে —বাবু মশায়, একটা পয়সা, সমস্তদিন খাওয়া হয় নি!

একটা বিরক্তি ও ঘৃণা পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে' বাবুটি ওপাশটায় সরে গেলেন।

বাবুলাল কিন্তু পিছু ছাড়লে না, বাবুটীর সামনে এসে আবার বল্লে—একটা আধলা দিয়ে দিন বাবু ...

রক্ত চক্ষু ঘুরিয়ে বাবু হাঁকলেন—ভাগ্ হিঁয়া সে, বেটা ছোটলোক গাঁটকাটা কোথাকার—পুলিশ্ পুলিশ্।

বাবুলাল পিছিয়ে এল। সমস্তদিনের পরিশ্রান্ত দেহটা এলিয়ে পড়তে চাইছে—রগদুটো দপ্ দপ্ করছিল!

সত্যিই আজ তার খাওয়া হয় নি। আজকের মত অপয়া দিন বোধহয় অনেকদিন আসে নি; একটা পয়সার বেশী রোজগার হয় নি। সমস্তদিনের বিরাট ক্ষুধা সামান্য এক পয়সার মুড়িতে যেন আরও জ্বলে উঠ্ছিল ভেতরে ভেতরে। কিন্তু কোন উপায় নেই ...

ছোটলোক ইতরের জাত। বাপ মার ঠিক নেই, রাস্তাতেই রাত কাটে ভিক্ষে করেই দিন চলে যায়। এই ভাবেই তেইশটা বছর বাবুলালের কেটেছে!

পা আর চলে না—সমস্ত শরীরটাতেও জ্বালা ধরছে যেন! কিন্তু কিছু চাইই অন্ততঃ আজকের জন্যে—পেট ভরাবার মতো পয়সা না জুটলেও গগন সা'র দোকানের ধেনো জল খানিকটা গিললেও তবু আজকের পরিশ্রম ও ক্ষুধা তৃষ্ণা অনেকটা ভুলে থাকা যাবে।

বাবুলালের তীব্র শ্যেন দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ওদিককার ফুটপাতের উপর। এক বুড়ো ভদ্রলোক ট্রাম থেকে নেমে ওই কাণাটার হাতে কিছু দিলে যেন।

চোখ কাণ বুজিয়ে মরিয়া হয়ে বাবুলাল ছুটলো রাস্তা পার হবার জন্যে। কিন্তু পৌছুতে পারল না। কপালের লিখনে মাঝপথেই সে আটকা পড়ে গেল!

একখানা বড় নিঃশব্দগামী মোটর তার পায়ে সজোরে ধাক্কা দিতেই সে ছিট্‌কে গিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়লো রাস্তার ওপর। তারপর তার পা ঘেঁসে চাকাখানা চলে যেতেই মোটরখানা একনিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ পারলে না গাড়ীখানা রুখ্তে বা তার নম্বরটা জেনে নিতে।

এক মিনিটের ভেতরেই হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে স্থানটা লোকজনে ভর্ত্তি হয়ে গেল। পায়ের চেয়ে মাথার চোট্‌টা বেশী লেগেছে—স্বপ্ন-ঘোরে বাবুলাল যেন দেখলে—তার নাকমুখ থেকে গরম জল বেরুচ্ছে—আবীর গোলা টকটকে লাল! তার মাথার ভেতর খেল্‌তে লাগল—উৎকট হল্লার ভেতর অজস্র কালো কালো মাথা,—দুটো লাল পাগড়ী—তারপর সব অন্ধকার ......

*   *   *   *   *

মেডিকেল কলেজে বাবুলালকে পৌঁছে দেবার গাড়ী ভাড়া নিজের গেঁট থেকে দিল ময়না!

রিপোর্ট লেখবার সময় ডাক্তারবাবু বল্লেন—তুই এর কে হ'স রে মাগী?

ময়না বল্লে—আপনার জন হুজুর!

বেড্ বোধহয় খালি ছিল—ডাক্তারবাবু কুলিকে দিয়ে রুগীকে ওপরে পাঠিয়ে দেবার সময় ময়না হাত জোড় করে বল্‌লে—আমাকে ওর সঙ্গে যাবার হুকুম দিন বাবু!

ডাক্তারের মনটা বোধ হয় খুসী ছিল সেদিন—বল্‌লেন—আচ্ছা তুই যা, আমি সায়েবের মত করিয়ে দিচ্ছি তোর থাকবার জন্যে।

বাবুলালের সঙ্গে ময়না ওপরে চলে গেল।

অপারেসন ঘর থেকে এনে বাবুলালকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। ময়না পাশেই টুলের ওপর গিয়ে বসলো।

এত বড় ইমারৎ, বিছানার পর বিছানা—আলো লোকজন সে জীবনে দেখে নাই! তার চোখে যেন ধাঁধাঁ লাগ্‌ছিল—কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে ময়না বাবুলালের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো।

হাটখোলার একটা দুর্গন্ধময় গলির ভেতর যে বস্তিটা সমান পূবমুখো চলে গেছে তারই একটা ঘরে ময়না থাকে। বয়সটা কাঁচা, বিশ পেরোয় নি। গায়ের রংটা যত কালো মুখশ্রী তার তত্তটা খারাপ নয়। বেশ আঁটসাঁট শরীরের গঠন! হাতে দুগাছা কাঁচের চুড়ি, পরণে পাছাপেড়ে সাড়ী। ঠোঁট দুটো দোক্তার রসে টস্‌টস্ করছে! দাঁত গুলো মিশির গুণে মিশ্ কালো! বাবুদের বাড়ী বাসন মেজে যা পায় তাইতেই চলে যায় কোন ক্রমে।......

বাবুলালের আড্ডাটাও ছিল ঐ বস্তিটারই সামনে। তাই ময়নার সঙ্গে তার চোখের আলাপ অনেকদিন থেকে।

অপরিসর সরু গলিটায় বাবুলাল যখন ঢোকে ময়না হয়ত তখন বাবুর বাড়ী কাজে যায়;—বাবুলালকে দেখে মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে সে দমক তালে চলে

খায়, বাবুলাল পিছন ফিরে হাঁ করে' তাকিয়ে দেখে—তারপর মুখখানা অসম্ভব রকম ভারি করে' আড্ডায় ঢোকে।

সে মেয়েটাকে দেখতে বেশ লাগে কিন্তু—তবু কথা কইতে সাহস হয় না কোনদিন। নেশার চরম সে করেছে—কিন্তু এইখানাটায় কেন যে সে পিছিয়ে আসে তা বলা শক্ত!

আড্ডার সঙ্গীদেরও এদিকে নজর কিছু কম ছিল না ...

সেদিন নিতাই গাঁজায় দম টেনে কল্কেটা বাবুলালের হাতে দিয়ে বল্লে—ছুঁড়িটা বেশ ডব্‌কা, লয়রে বাবুলাল?

বাবুলাল চুপ করে রইলো।

নিতাই ফের বল্লে—এরকম নিরিমিষ আর ভাল লাগে না মাইরি,—ছুঁড়িটাকে পটাই আয়।

—থাম্ থাম্ আর ইয়ারকি দিতে হবে না—বলে বাবুলাল এমন হিংস্রকুটীল দৃষ্টিতে চাইলে যে অন্যান্য সঙ্গীরা মায় ষণ্ডা নিতাই পর্য্যন্ত চুপ ক'রে গেল। বাবুলালের বলিষ্ঠ বাহুদুটোর প্রতি তাদের সকলেরই বিশেষ আতঙ্ক ছিল।

কিন্তু তাদের মনের উস্‌খুসানি থাম্‌ল না, বেড়েই চল্‌লো—। বাবুলালের অজ্ঞাতে তারা ওৎ পেতে থাকে ...

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাবুলাল হঠাৎ আবিষ্কার করলে—নিতাই ময়নার হাতখানা ধরে এককোণে ঘুপ্‌টি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দিনই নাকের ওপর বাবুলালের লোহাহাতের বিরাট ঘুসি খেয়ে নিতাই সিধে হয়ে গেল।

ব্যাপারটা ময়নার কাছে যেমন আশ্চর্য্যজনক ঠেকেছিল তেমনি ক্রোধের উদ্রেকও করেছিল, এমন কাঠগোঁয়ার সে জীবনে দেখেনি ...

সামনে যত বারই পড়েছে সে—বাবুলালের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছে, তার লম্বাচওড়া দেহখানার দিকে ভাল করেই চোখ বুলিয়ে নিয়েছে—কিন্তু তার গোমড়ামুখে হাসি ফোটাতে পারে নি—একটা বাঁকা চাউনিও সে উপহার পায় নি আজ পর্য্যন্ত! ...

দিন আসে সন্ধ্যে হয়! চোখের বিদ্যুৎ দ্বিগুণ করে' ছুটিয়ে ময়না বাবুলালের

গা ঘেঁসেই প্রায় বাবুর বাড়ী কাজে যায়—সন্ধ্যায় আবার বাসায় ফেরে মুখখানা পানের রসে রাঙা করে'। দূর থেকে পোষা কোকিলের ডাক শোনা যায়—চাঁদের আলোও ঝরে' পড়ে গলিটার ভেতর মাঝে মাঝে! ...

এমনি একদিন সন্ধ্যায় বাবুর বাড়ী থেকে ফেরবার সময় ময়না বাবুলালকে ভীড়ের মাঝে অজ্ঞান অবস্থায় আবিষ্কার করলে—তারপর মেডিকেল কলেজ—

হাসি মুখখানা কালো করে, ময়না চুপটী করে বসেছিল! একটা রাত আর একটা দিন সে বসে আছে মাত্র। ডাক্তারবাবু বলেছে—আঘাত সামান্য আজই জ্ঞান হতে পারে।

হ'লও তাই—। বাবুলাল চোখ মেলে চাইলে বিকেল বেলাটার দিকে সমস্ত শরীর বেদনায় টন্‌টন্‌ করছে! মাথাটা অবধি নাড়বার যো নেই! চোখের সাম্‌নে যেন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা কত কি ভেসে বেড়াচ্ছে—কিন্তু তারই ভেতর, গালের ওপর ঝুঁকেপড়া ময়নার মুখখানা সে একনিমেষেই চিনে ফেল্‌লে।

কণ্ঠে বিরক্তি ফুটিয়ে বল্লে—তুই যে এখেনে বড় ?

মুখ ঘুরিয়ে ময়না উত্তর দিলে—আমি না থাকলে, আজ কোথায় থাকৃতিস্ রে মড়া, চুলোয় জ্বলতিস্ যে।

বাবুলাল চুপ করে গেল। চোখদুটো সে বুজিয়ে ফেললে।

ময়না বললে—এখন কেমন বোধ করছিস্ বল্‌ত ?

—ভালো না, বলে বাবুলাল মুখখানা বিকৃত করলে।

—ও কিছু না, ভাল হয়ে যাবি, ডাক্তারবাবু যে ওষুধ দিয়েছে গা ফুঁড়ে, দুদিনেই চাঙ্গা হয়ে উঠবি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বাবুলাল বল্লে—তুই কেমন করে টের পেলি সেদিন ?

—সে সব পরে শুনিস্, এখন হাঁ কর্ দেখি দুধ-টুকু গালে ঢেলে দিই।

* * * *

সাতদিন পরে বাবুলাল ডাক্তারের কাছে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবার আদেশ পেলে।

কয়দিনই রোজ ময়না বাড়ী থেকে দুটী খেয়ে নিয়েই তার পাশটীতে এসে বসে—দুপুরটা গল্প হাসি ঠাট্টা তামাসা করে' কাটিয়ে দেয়—রাত্তিরটা বসে বসে ঢোলে।

বাবুলাল আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে—কী অদ্ভুত মেয়েটার ব্যবহার! কিন্তু মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়ে তুলে' গোম্‌ড়া হয়ে থাক্‌তে পারেনা। হেসে কথা [illegible] হয়—দু চারটে ঠাট্টা তামাসা ফিরিয়ে দিতেও হয়।

খেয়ে দেয়ে ময়না সেদিন একটু দেরী করেই এল। বাবুলাল তার কথা এ কয়দিন বরাবরই ভাবে,—আজও ভাবছিল বোধ হয়—জিগ্যেস্ করলে—এত দেরী হ'ল যে!

ময়না মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে—তবু ভালো!

না বুঝে বাবুলাল বল্‌লে—তার মানে?

ময়না তেমনি হেসে বল্‌লে—এতদিন বাদে পটেছিস্।

বাবুলালের কান দুটো লাল হয়ে উঠ্‌লো। কিছু না বলে সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

—মান হ'ল নাকি? বলে' ময়না দুটী আঙ্গুল দিয়ে বাবুলালের গাল দুটো টিপে দিলে।

বাবুলালের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সমস্ত মুখটা অসম্ভব রকম লাল করে সে পড়ে রইলো।

ময়না বললে—ন্যাকামি দেখে আর বাঁচিনা, নে উঠে বোস্। তারপর একটু থেমে বল্‌লে—আজত ছুটি পাবি, কোথায় যাবি এখন?

বাবুলাল ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলে—তাইত ভাবছি!

—আর অত ভাবে না, গাড়ী করে আনি, চ'।

বিস্ময়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বাবুলাল বললে—বলিস্ কি, তোর ঘরে?

—না যোম্‌রার ঘরে;—বলে শুধুশুধু মাগ্‌না তোর সেবা করতে গেলুম, না?

বাবুলাল আর প্রতিবাদ করতে পারল না বটে; কিন্তু তার মুখ থেকে অস্ফুটভাষায় আপনা আপনি বেরিয়ে এল—নিতাই!

—নিতাইয়ের ভয়ে কেঁচো হয়ে আছিস্ যে দেখ্ছি, ভাবনা নেই, সেখেনে নিয়ে গিয়ে তোকে তুলবো না—হাটখোলার ঘর ছেড়ে দিয়ে ফুলবাগানের ওধারে আমি ঘর নিয়েছি, তা বুঝি জানিস্ না? বেশ নিরিবিলি থাকবো আমরা ওখেনে, কেউ টেরও পাবেনা, বুঝলি ?

বাবুলালের মুখে কথা নেই !......

বাতাসের দোতুল নাচন গাছের পাতায়, মনের পাতায় ! সবুজের ছোঁয়াচ লাগা দিন !......

বাবুলাল মেটে দাওয়ায় বসে হুঁকো টানছিল। অসুখ সেরেছে—দুর্বলতা টুকু যায় নি এখনো !

কলতলা থেকে কাপড় কেচে ভিজে কাপড় খানা বকে তুলে দিয়ে ময়না সামনে এসে দাঁড়াল।

সারা অঙ্গে যৌবন উথ্লে উঠ্ছে ! বাবুলাল চাইতে পারল না, মুখ নামিয়ে জিগেস করলে—ভিজে কাপড়ে কেন, অসুখ করবে যে !

ময়না হাসলে, এমন হাসি সেঅনেকবার হেসেছে কিন্তু বাবুলালকে টলাতে পারেনি,—আজও বোধ হয় পারলে না।

বল্লে—এত টান শেষ অবধি থাকলে বাঁচি।

তামাকের ধোঁয়ায় বাবুলালের কাশি এল—কথাটা চাপা দেবার জন্যেই বোধ হয়।

কাপড় ছেড়ে এসে ময়না বাবুলালের কাছ ঘেঁসে বসলো—বল্লে—খালি বসে বসে তামাক খাবি আর ভাববি—বাইরে একটু বেড়িয়ে আসবার নামটি নেই—শরীর চাঙ্গা হবে কি করে ?

উদাসকণ্ঠে বাবুলাল বল্লে—ভালো লাগেনা।

—না আমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করেনা ? বলে ময়না বাবুলালের হাতে একটু চাপ দিলে।

বাবুলাল কথা কইতে পারলে না।

ময়নার মাথায় কাপড় ছিল না—এলো খোঁপায় একটা চাঁপাফুল গোঁজা।

সে বল্লে— একবার আমার দিকে ভাল করে চেয়েই দেখ্না, দোষ হবে না।

বাবুলাল একবার চোখ দুটো ওঠালে।

ময়না বল্লে— তুই কী পাষাণ !

বাবুলালের আবার কাশি এল।

গ্রাহ্য না করে ময়না বল্তে লাগলো—তোকে এত জোরে যমের হাত থেকে বাঁচিয়ে তুল্লুম,নিজের ঘরে রেখে ডাক্তারের বেশী সেবা করছি, তবুও তোর মন ভুলুম না কেন বলত ? আমিই না হয় তোকে দেখে মজেছি,—তাবলে' তোর কি একটা মিষ্টি কথা বলাও উচিত নয় রে নেমকহারাম ?

ময়নার চোখে জল্জ্বলে আগুন !

—যাই কল্কেটা বদ্লে আনি—বলে বাবুলাল উঠেই ঘরে ঢুকে পড়লো।

এখেনে আসা অবধি বাবুলালের বিছানা ঘরেই হয়। ময়না বাইরে দাওয়ায় সমস্ত রাত পড়ে থাকে।

আজকের হঠাৎ পাশাপাশি দুটো বিছানা দেখে বাবুলালের বুকটা শিউরে উঠলো—এ আবার কি !

মরণও নেই আমার—কান্নার সুরে ময়নার কথাটা ঘরে ভেসে এল হাওয়ায় !

কালো মুখখানা আরো কালো ক'রে, দুম্দুম্ শব্দে উঠোনটা কাঁপিয়ে সদর দরজাটা ঝনাৎ করে খুলে ফেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ময়না চেঁচিয়ে বল্লে—দোরটা আল্গা রইলো ,—বাবুর বাড়ী কাজে চললুম।

তারপর ঝনাৎ করে আর একটা শব্দ হল, বাবুলালের তা কাণে গেল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বাবুলাল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে তখন মেঘ করে', ঝড় উঠেছে ...

অনেকরাত্রে ময়না কাজ সেরে বাসায় ফিরে বাবুলালকে দেখতে পেলে না। ঘর দোর শূন্য খাঁখাঁ করছে ! শুধু একটা বেড়াল তাকে দেখে ঘর থেকে ছুটে পালাল।—

চীৎকার করে ময়না ডাকলে—বাবুলাল! উচ্চ স্বর বাতাসে মিলিয়ে গেল, কেউ সাড়া দিলে না। ...

ময়নার দুচোখ জ্বালা করে উঠলো—বালিশটা বুকে চেপে সে শুয়ে পড়লো,—চোখে শুধু দুফোঁটা জল!

বাবুলাল আর ফেরে নি! ...

সিন্ধু ও বিন্দু

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিন্দু বিন্দু নামিল বৃষ্টিধারা,
ছুটিয়া চলিল সকল বাঁধন-হারা—
হরষে উছলি উঠে,—
মুকুতার পাঁতি ফুটে—
গাহি কলকলে অবিরাম চলে, সাগরে মিশিবে বলি,
অসীম অতলে ফুঁশিছে সাগর তরঙ্গে উচ্ছলি।

বিন্দুরে ডাকি' সিন্ধু কহিল তায়,—
এত এ মাতন, কিসের লাগি এ হায়!
আমার অগাধ নীরে
মিশিতে চাহিস কিরে?
অতি ছোট তুই,—নেহাৎ তুচ্ছ! স্পর্দ্ধা যে সীমাহীন
কি আছে রে তোর? কি পারিস তুই, বিন্দু, ক্ষুদ্র, দীন!

আকাশের সীমা ছুঁয়ে আছি, ছাখ্ চেয়ে—
কঠিন ভূধরে তরঙ্গে দিছি ছেয়ে!
প্রাসাদে, নগরে, বনে,
চূর্ণ করি যে ক্ষণে,—
প্রলয়-ঝটিকা—তারো সাথে লড়ি দুর্দ্দম, নির্ভীক!
নাহি পার, নাহি তল সে আমার,—বাধা নাই কোন দিক!

বিন্দু কহিল,—সিন্ধু, গরব কর,
বক্ষে তোমার শক্তি সে কত ধর?
আমি অতি ছোট, মানি;
তুমি সে বৃহৎ, জানি,—
তবু তৃষার্ত্ত আমারেই চায় পিপাসায় মিটাবারে,
অথই অতল সাগরের জল পিপাসা মিটাতে নারে।



সাত খুন মাপ

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ফুর্তির ফুর্ফুরি !—মেলা বসেছে !

ঝিনুকের ছোট্ট নোলকটির মতোই মুখ,—কচি, টুল্‌টুলে। বাপের হাতটা টেনে ঝুঁকে পড়ে' বল্লে—বাবা, ঐ ঘোড়াটা।

বাপ ধমক দিয়ে বল্লে—দূর বোকা মেয়ে ! মেয়েমানুষ বুঝি ঘোড়ায় চড়ে? ফুলুরি কিন্‌বি ?

বাপ যত না করে, মেয়ে তত গোঁ ধরে ;—বাপ মেয়ের গালে একটা ঠোনা বসিয়ে দিল।

না কেঁদে মেয়ে বায়নাটা আরো চেঁচিয়ে জাহির করে শুধু। হাত পা ছোঁড়া ছেড়ে মিনতি করে বলে—দাও না গো। চাইনা আমি তেলে-ভাজা।

মা-ছোড়্ মেয়ে,—ন্যাওটা, নাছোড়বান্দা।

দোকানী হাঁক্‌লে—দশ আনা—

বাপ মেয়েকে ছিনিয়ে আন্‌তে পারেন', মেয়ে বসে পড়ে' ঘোড়াটাকে দুহাতে আঁক্‌ড়ে বুকের ওপর চেপে ধরেছে। যেন কতকাল পরে ওদের দুজনের দেখা,—নতুন করে চেনাচিনি।

অগত্যা বাপ ট্যাঁক থেকে দশ আনা পয়সাই বের করে' দেয়।

বল্লে—রাতে কিন্তু এক মুঠো মুড়িও চিবোতে পারবিনা রাক্ষুসি।

মেয়ে স্বচ্ছন্দে ঘাড় কাৎ করে' বলে—আচ্ছা। আজ আমার ক্ষিদে পায়ও নি।

কাঠের ঘোড়াটা একবার কাঁখে, একবার কাঁধে করে' চলে।

বাপ বল্লে—আমার কাছে দে! ফেলে দিবি।

ভুরু বেঁকিয়ে মেয়ে বল্লে—ঈস্ !

শুতেও এল ঘোড়াটা কোলে নিয়ে।

বাপ বল্লে—এ কি পোড়ারমুখী? এটাকে বিছানায় তুলছিস্ কেন? রেখে আয় দাওয়ায়।

মেয়ে ভারিক্কি গলায় বল্লে—হ্যাঁ! রেখে আসি দাওয়ায় ফেলে,—আর রাজাবাবুর ছেলেরা চুরি করে নিক্!

তারপর আর বৃথা কথা কয়না! বাপের আদেশ উপেক্ষা করেই নিশ্চিন্ত মনে শোয়,—ঘোড়াটাকে বুকে জড়িয়ে।

বাপ [illegible]কে দু' হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে আনতে চায়, মেয়ে ঝামটা দিয়ে —ও তা হ'লে কার কাছে শোবে? একলা? ঈস!—

অশ্বত্থ আর ঘেঁটু।—জমিদার-বাড়ীর চ্যাপ্টা গম্বুজ, আর কাহিল খুখুরো পাতার কুঁড়ে। যেন হনুমানের বগলের তলায় সূর্য্যের বোঁচ্কাটা,—ছেঁড়া চ্যাপটানো।

ভোরবেলা দাওয়ায় বসে, বুড়ো বেচারাম শিলে জল ঢেলে ক্ষুরে শান্ দেয়। জমিদার বাড়ীর মুহুরি দড়ি-বাঁধা ঠুন্কো কাঁচের চশ্মাটা খোলে রাখতে রাখতে বল্লে—দাড়িটা চেঁছে দাও হে বেচু।

রোজ এম্নি করেই বেচারা বেচারামের বউনি হয়,—মাগ্না। মুহুরি এক আধ সময় বলে বটে—মাসকাবারে। তা, কাবার হয়, কিন্তু থাবার হয় না। বেচারামের ট্যাঁক দুটো অনবরত ফ্যা ফ্যা-ই ক'র।

তবুও কামাতে হয়। জমিদার-বাড়ীর দেউড়ি দিয়ে দু' বার যে যাওয়া আসা করে, তার প্রতাপে আর যাই হোক্, বেচারামের শান্ দেওয়া ক্ষুরটা অন্ততঃ সায় দেয়।

নাকের ডগায় চশ্মা ঝুলিয়ে ঘাড়টা তুলিয়ে দুলিয়ে চলে তারপর।

কাঠের ঘোড়ার সঙ্গে মাটির মেয়ের নিবিড় জানাশোনা, যেন এ জন্মেরই শুধু নয়। তখনো মাটি আর কাঠ কিছুই ছিল না।

পাঁচ বছরের মেয়ে কাঠের ঘোড়ার কারিগরের কেরামতি দেখে মনে মনে তারিফ করে। জিভ দিয়ে আওয়াজ করে' মুরুব্বির মতো বলে—হ্যাট্ হ্যাট্—

কাঠের ঘোড়াও মাটির মেয়ের কারিগরের কের্দানিতে বোকার মতো মুগ্ধ হয়ে থাকে। তাই নড়ে না বুঝি।—

বেশী সক্ষম নয় বলেই চল্‌তে পারছে না ভেবে পেসাদি ঢেঁকিশাক থেকে শুরু করে' পেঁপে গাছের ডাঁট পর্য্যন্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে এনে ঘোড়াটাকে খাওয়ায়। তবুও ঘাড় বাঁকায় না দেখে ভাবে,—এ বুঝি একেবারেই শিশু। তাই আনাড়ী ঘোড়াটাকে কোলে ফেলে পেসাদি হাঁটু দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়ায়, আবোল তাবোল ছড়া কাটে। ঘোড়াটা ঘুমোয় না হয়ত। তাই ফের কখন্ সওয়ার হয়ে ঘোড়ার ওপর চেপে বসে। নিজেই ঠেলে ঠেলে চলে তারপর। তালে তালে বলে—গড়্ গড়্ গড়্—

দাওয়ার এক ধারে বসে' বেচারাম গাম্‌লাতে ভাতের ফ্যান্ গালছিল।

বল্লে—উনুনের মধ্যে ছিট্‌কে পড়্‌বি পেসাদি।

খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করে' হায়রান্ হয়ে পেসাদি চুপ করে' বসে' থাকে—ঘোড়ার পিঠেই। হয়ত ভাবে।

হয়ত বা সে দিনের কথাই, যখন এই বুড়ী পৃথিবী পেসাদির মতোই পাঁচ বছরের টুলটুলে খুকী ছিল,—নাকে চাঁদের চিকণ নোলকটি! ...

তারপর হঠাৎ ঘোর ভেঙে গেলে পেসাদি দ্বিগুণ উৎসাহে ঘোড়ার ঘাড়টা ধরে' বিষম ঠেলা দিয়ে বল্লে—চল্ চাল্‌তাতলা।—রোগা দুর্ব্বল ঘোড়াটা একেবারে চিৎপাৎ হয়ে পড়্‌ল পেসাদিকে শুদ্ধ্ই। পেসাদির মুখ দিয়ে খালি বেরুল—এই যা—।

জ্বলন্ত উনুনের মতোই ডগ্‌ডগে বেচারামের রাগ,—যেন ফুটন্ত ফ্যান। পেসাদির মাথার সমস্তগুলি চুল একসঙ্গে মুঠির মধ্যে খাম্‌চে ধরে' দারুণ ঝাঁকি দিতে দিতে বেচারাম বল্লে মুখ খিঁচিয়ে—হারাম্‌জাদি, ফেল্‌লি—ফেল্‌লি তো ভেঙে দশআনা দামের জল জ্যান্ত ঘোড়াটা।

সঙ্গে চড় চাপড়, আর জিভের গোড়ায় গালমন্দ যা আসে। তপ্ত খোলায় খই ফোটে।

—সতেরো দিন কামিয়ে সাতটা পয়সার আম্‌দানী নেই,—বেটি, ছুঁচোর বাচ্চা—

মা-ছোড় মেয়ে চাঁছা-সুরে চেঁচায়, আর মা'র মতো মাঝে মাঝে মরা ঘোড়ার পানে চায়,—অসহায়! চারটা পা একসঙ্গে যড়্‌যন্ত্র ক'রে খসেছে। মার সাঙ্গ হ'লে পেসাদি খোঁড়া ঘোড়াটাকে কোলে তুলে নিয়ে ওর গায়ে হাতবুলিয়ে দেয়, আর নিজের চোখের জল মোছে। ভাবে, ও যেন ওর রোগা ছেলে!

পরে ফুঁপোতে ফুঁপোতে বল্লে—আমার জিনিষ আমি ভেঙেছি—

বাপ তেড়ে এসে মেয়ের কোল থেকে ঘোড়াটা ছিনিয়ে নিয়ে বল্লে—মর্ ঘুঁটে। পরে ঘোড়াটা চুলোর তলায় ঠেলে দিল।—কাঠের ঘোড়ার চিতা!

পুরনো জমিদারের, পুকুর-পাড়ের সজ্‌নে-গাছটা বেচারামের এলাকায়। সেই সজ্‌নে গাছের তলায় ছাতা মাথায় দিয়ে বসে' জমিদারের নাদুস্-নুদুস্ গোল-গোবিন্দ ছেলেটা জলে ছিপ্ ফেলে' চেয়ে থাকে,—পলক পড়েনা। গা বেয়ে ঘাম ঝরে, পাশের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খায়,—মাঝে মাঝে পেছনে বসে' চাকর পাখা করে—ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে।

অপরাজিতা-লতার মতো গাঁয়ের বৌ-টি, যেমন শ্যামল, তেম্‌নি নুয়ে'-পড়া। আল্‌গোছে ঘোম্‌টাটা একটু টেনে বলে—ভারি অসুখ ছেলেটার, একটু সজ্‌নের ছাল্ যদি দেন—

গেঁয়ো মেয়ের গা ভরা সবুজ মাঠের স্বপ্ন, বুড়ো বেচারামের চোখ্ ছুটো নরম হয়ে আসে।

পেসাদি তক্ষুনি নোলক নেড়ে ঘাড় কাৎ করে' বলে' উঠ্‌ল—হ্যাঁ, নাওনা যত খুসি। আমাদেরই ত' গাছ। মা'র হাতে পোঁতা। দেখ্‌বে চল কেমন আমি গাছটাকে ছু হাতে জড়িয়ে ধর্‌তে পারি—

বেচারাম আপত্তি করে না। চোখের জলে মুছে-যাওয়া হৃদয়ের পুঁথির ঝাপ্‌সা আখর গুলি যেন হঠাৎ ডাগর হয়ে ফুটে ওঠে;—বোকা নাপিত তাই পড়ে' পড়ে' বিভোর হয়ে যায়। যেমন আখর ফোটে তারার,—রজনীগন্ধার।

ঐ বৌটিকে যেন ও চেনে। ঘোম্‌টার তলায় যে চোখ ছুটি দেখ্‌তে পায়নি, সেই চোখ ছুটিকে!

তারপর শিলের ওপর ক্ষুর ঘষে' ঘষে' সান্ দিতে থাকে।

বৌটি ছোট ছুটি হাতে ভোঁতা দা-টা ধরে' বহু কষ্টে চেঁছে চেঁছে ছাল্ ছাড়ায়। পেসাদি বকে' চলে। বলে—এই দেখ, কেমন মজার জিনিষ,—তোমাদের আছে?

বৌটি সত্যিই অবাক হয়ে দেখে।—প্রকাণ্ড একটা উইয়ের ঢিপি,—যেন প্রকাণ্ড একটা রাজ্য।

কি ব্যস্ততা !—বৌটির দুটি চোখ্ জ্বল্জ্বল্ করে' ওঠে। ভাবে,—এ আ রকটা পৃথিবী,—কি ভাবে, বোঝেনা। পেসাদির টানা টানা চোখ্ দুটি দেখে রোগা ছেলের কথা মনে করে বুকটা টন্টন্ করে ওঠে। আঁচলে সজ্নের ছাল্ বেঁধে নেয়। উঠোনটা পেরোবার সময় তেম্নি আল্গোছে একটু ঘোম্টা টানে।

রোজই আসে ছাল নিতে। সজ্নে গাছটা ছিল বলেই ত' তবু মনে করে' আসে,—নইলে ত' এতদিন ভুলেই ছিল। বেচারামের এক এক সময় ভারি ইচ্ছা হয়, বৌটিকে শুধোয়,—তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কিন্তু ঘোমটা তু[illegible] ফেল্লেই পাছে ও অচেনা, পর হয়ে যায়, সেই ভয়ে কিছুই বল্তে সাহস পায় না। খানিক চোখ মেলে, পরে চোখ বুজে ওকে দেখে।

বৌটি আঁচলে করে' বেঁধে খই আর মুড়ি নিয়ে আসে রোজ। উইর ঢিপিটার চারপাশে সেগুলোর হরির লুট্ দেয়। বলে—এরাও তো প্রাণী। আমি তো আমার ছেলের কল্যাণে এতগুলো গরীব মানুষকে খাওয়াতে পার্বনা। এদেরই খাওয়াই, তুমি চোখ মেলে দেখো হরিঠাকুর।

উইর রাজ্যে তোলপাড় লাগে,—মারামারি,—ভাগবাটরা নিয়ে কাম্ড়া-কাম্ড়ি—যুদ্ধ,—বিপ্লব,—সঙ্ঘর্ষ।

সেদিন গাছটার দুর্দ্দশা দেখে বেচারাম একেবারে থামের মতো থ হয়ে গেল। গোড়ার দিকটা একেবারে ন্যাড়া হয়ে গেছে! যেমন রাগ বুড়োর,—শান্-দেওয়া ক্ষুরের মতোই ধার!

অভ্যেস মতো সেদিনও বৌটি এলে বেচারাম একেবারে ফেটে পড়্ল—তুমি বড্ড বেশি 'নাই' পেয়েছ, না? কি করেছ গাছটার চেহারা? এ কি তোমার বাপের জমিদারি নাকি?

দুর্ব্বল বৌটি ঘোম্টাটা আরো একটু টেনে আস্তে আস্তে ফিরে যায়। আঁচলে-বাঁধা মুড়ির পুঁট্লিটা পথের ওপরই ছিটিয়ে দেয়।

রাগে গর্গর্ করতে করতে পেসাদিকে একটা অকারণ চড় মেরে বেচারাম বগলের তলায় গামছার পুঁট্লিটা নিয়ে বাজারে চলে' যায় তারপর। বুকটা যেন কেন খালি খালি লাগে।

বৌটি আর আসে না। ফের যেন ভুলে গেছে,—এম্নিই মনে হয় বেচারামের। অন্যমনস্কের মতো গাছের গোড়ায় পায়চারি করে একটু।

গাছটা যেন অশ্রুজল ফেল্‌ছে। পরে উইদের বৃহৎ সংসারের ব্যস্ত অভ্যস্ত জীবন যাত্রা দেখে। তারপর ভাতের ফ্যান উত্‌লে পড়্‌ছে দেখে ছুটে যায়।

বৌটি আসে না। বৈশাখের ঝাঁঝালো বাতাসে বুড়ো বেচারাম যেন কোন্ ছেলে-হারা মা'র কাতর ককানি শোনে!

যেন কোন বিরহিনীর—

বাজার থেকে ঘাড়ের ঘাম মুছ্‌তে মুছ্‌তে এসে বেচারাম উঠোনে দাঁড়াতেই,—দক্ষিণ দিকটা কেমন যেন ফাঁকা ঠেক্‌ল। এগিয়ে এসে দেখ্‌ল,—একেবারে ফক্কিকার।

সজ্‌নে গাছটার ডালগুলো সব কাটা,—ঠুঁটো। শুধু ধড়টা জড়িয়ে ধরে' পেসাদি হাপুস চোখে কাঁদ্‌ছে।

বেচারাম চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—কি ব্যাপার, রাক্কুসি?

পেসাদি বলে না, বলে জমিদারদের বেদরদী দরোয়ানটা। ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়. বড় রাজাবাবুর বঁড়শীতে একটা কাৎলা প্রায় কাৎ হয়েছিল, হেঁচ্‌কা টান মারতে শিকার তো ফস্‌কালই, সুতো গিয়ে আট্‌কালো সজ্‌নের ঠালায়। তাইতেই বাবু খাপ্পা হয়ে গাছটাকে একেবারে বেকুব করে' ছাড়্‌লেন।

বেচারাম বোকার মতো চেঁচিয়ে ওঠে,—ফেটে পড়ে বোমার মতো।—কে তোর বড়রাজাবাবু, নিয়ে আয় আঁটকুড়ের ব্যাটাকে,—দেখি তার ঘাড়ে ক'টা মাথা। ইয়ার্কি পেয়েছে হেতা?

দারোয়ানটা দাঁত দেখিয়ে হাসে।

বেচারাম কপাল কোটে গাছের গোড়ায়,—পেসাদি তেম্‌নি দুহাতে জড়িয়ে কাঁদে,—যেন আবার মা হারিয়েছে!

খাবার আর মুখে তোলে না,—অভ্যেস মতো দাওয়ায় বসে' বেচারাম ক্ষুর শান্ দিতে থাকে। ভাবে, দুটি খাড়্‌-হীন পারুল-পায়ে কেউ তার উদাস উঠোনকে চম্‌কে পুকুর-পাড়ে যাবেনা আর। তার যে আরেক ছেলে মরল—

ক্ষুর দিয়ে জমিদারের ছেলের দাড়িই পরিপাটি করে' কামিয়ে দিতে হবে,—ঐ পর্য্যন্ত।

সেই রাতেই।

একলা একলা কাঁহাতক আর একঘেয়েমি ভালো লাগে? বিধাতা মাঝে মাঝে মুখ বদলান' ছিঁচ্‌কাঁদুনের হঠাৎ খেয়াল হল, কাঁদবেন, কুঁদবেন। আকাশের ঝাঁঝরা ফুঁড়ে লাখো ফুটো দিয়ে কান্না নাম্‌ল মাটির পাঁজ্‌রা কাঁপিয়ে,—মীরের যখন যা মর্জ্জি।

ফলে, ভুষো কম্বলের তলায় জমিদারের ডাম্বেল-করা ভোম্বল-ছেলেটার ভুঁড়ি কাঁপিয়ে চৌকস ঘুম হল, আর মরা সজ্‌নে-গাছের তলায় উইর ঢিপিটা গেল ভেসে, হারিয়ে,—ছত্রখান্ হয়ে।

যুদ্ধ বেঁধেছিল, সাম্রাজ্যের ইস্তক্ কাবার হয়ে গেল। কিংবা মহামারীতে উজাড়,—ভূমিকম্পে সাবাড়। আবার কি!

পেসাদি একটু হুতাশ করে, বুড়ো বেচারাম একবার চেয়ে দেখে' খালি ক্ষুর শানাতে থাকে—

যেন কিছুতেই মনোমত ধার হচ্ছেনা।

আথ্‌খুটে খোকার নতুন মর্জ্জি, পিচ্‌কিরিতে রঙ্‌ ছুঁড়্‌বেন। আকাশ গাঢ় নীল, মাটি পাৎলা সবুজ, ফুলে ফুলে প্রজাপতির পাখায় রঙের দীপান্বিতা।—

জমিদারের হোঁৎকা ছেলেটার বিয়ে।

বেচারাম বল্লে—বাঁশের কুলুঙ্গি থেকে তোর মায়ের খাড়ু জোড়া বার কর পেসাদি—

পেসাদি বল্লে—কোথা যাচ্ছ বাবা? রাজাবাবুর বাড়ী নেমন্তন্নে যাবেনা?

—শেষ পুঁজি খাড়ু জোড়া নিয়ে বাজারে যাচ্ছি মা, বাঁধা দিতে। কে যাবে ঐ ছোটলোকদের বাড়ী? আমরাও ফূর্ত্তি কর্‌ব আজ,—মায়ে-পোয়ে মিলে।

পেসাদি মুখ কাঁচুমাচু করে' বল্লে—বারে, যাবনা বুঝি লুচি খেতে?

—আমরা নুন্ দিয়ে ফ্যান্-ভাতই খাব, মা। ওদের চেয়ে ঢের ভালো—

তারপর বাজারেই যায়।

ফিরে আস্‌তেই পেসাদি হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—পেট ভরে' লুচি-মোণ্ডা খেয়ে এলাম বাবা,—সন্দেশ তিনটে খেয়ে, আরো—

বেচারাম ঠাস করে' মেয়ের গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে রুখে বল্লে—পরের বাড়ীতে কেন খেতে গেলি পোড়ারমুখী? বল্লাম না—

কোঁচড় থেকে চা'ল গুলো রাগ করে মাটির ওপর ফেলে দিল। পেসাদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, আর মাটিশুদ্ধু চালগুলো গুছায়।

বেচারাম বুকের মধ্যে দুটি খাড়ুর রুনুঠুন্ শোনে,—অশ্রুত ধ্বনি। পায়ে পায়ে, পাতাবাহারের পাতায় পাতায়, পোকার পাখায় পাখায় খাড়ু বাজিয়ে কে যেন এল।

তারপর ও এক সময় নিজেই জমিদার বাড়ীতে খেতে যায়,—হয়ত তাকেই দেখ্তে।

খেতে খেতে ভাবে—খাড়ু দু'গাছি বাঁধা দেবার কি দরকার ছিল?

যা হোক্, পেট ঢাক করেই বাড়ী ফেরে—

দেখা হয় না। শুধু শুয়ে শুয়ে বুড়ো বেচারাম খাড়ুর আওয়াজ শোনে,—আপন বুকের মধ্যে।—

বেড়া বেয়ে বেয়ে চালকুমড়োর ডগাটা আকাশের পানে আঁকুপাঁকু করে' উঠেছে। তুলতুলে ফুল ফুটতে দেখে পেসাদি হাততালি দিয়ে উঠ্ল। যেন পেসাদিরই মাকে ঝিনুকের ঠুন্কো ছোট্ট নোলকটি। চালকুমড়ো লতাটা যে ওর সই।

বেচারাম বল্লে—আরো পুঁতে দেব বিচি,—বেচ্ব। বেশ হবে।

পেসাদি দুটি চোখ চালকুমড়োর ফুরফুরে পাৎলা ফুলের মতো কাঁপিয়ে বল্লে—তুমি আমাকে কাঁধে করে তুলে ধর্বে আর আমি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ডালা ভর্ব।

বেচারাম দুই চোখের তরল স্নেহে দুর্বল লতাটাকে ভিজিয়ে দিয়ে বল্লে—নামুক একবার বিষ্টি,—থন্থন্ করে' উঠ্বে।

বুড়োর চোখে বোধ হয় ঘোর লাগে। ভাবে সে সব দিনের কথা,—বুড়োর বুকটা যেন এই পোড়া খোলার চাল, আর তার বুক জড়িয়ে লতিয়ে লতিয়ে কার যেন অসংখ্য পেলব বাহু-লতার ব্যাকুলতা।...

সকালবেলা মুহুরি বলেছিল—একটু দাঁড়িয়ে যাও হে বেচু। হেঁচেছি।

বেচারাম বোধহয় দাঁড়িয়েই গেছ্‌ল একটু। কিন্তু বাজার থেকে অভাবনীয় রূপে সাড়ে তিন আনা পয়সা ট্যাঁকে করে' নিয়ে আসতে আসতে বেচারাম হাঁচির বদনামের ওপর দস্তুর মতো সন্দিহান হয়ে উঠ্‌ল।

খাঁ খাঁ রোদ হঠাৎ কুটে কালো মেঘের আঠায় একেবারে লেপ্‌টে চেপ্‌সে গেল। দম্‌কা হাওয়ার বেদম ধমক্ সুরু হয়েছে,—দেয়ার গমক। বেচারাম ঢিমিয়ে ঢিমিয়েই চলেছে,—বগলের তলায় ন্যাক্‌ড়ার পুঁটলিটা। ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলেছে,—চৌদ্দটা পয়সা একসঙ্গে দেখে পেসাদির দুই চোখ্ খানি আগের রোদে-উজল আকাশের মতো খুসিতে উছল হয়ে এখনকার ঠাণ্ডা আকাশের মতো সান্ত্বনায় শীতল হয়ে যাবে।

ঝাপ্‌টা মেরে বৃষ্টি নেমে এল।

বেচারামের হঠাৎ মনে পড়্‌ল ছুঁচো মুহুরিটার হাঁচি। বুকটা ছ্যাঁৎ করে' উঠ্‌ল। মনে হল, সমস্ত আকাশ যেন হাঁচ্‌ছে।

ঘর এলো, বাতি বাতাসে নিবে গেছে। বেচারাম কুলুঙ্গি হাত্‌ড়ে দেশলাই বার করে' জ্বালালে,—দাওয়ায় উঠে ; হাওয়ায় হারিয়ে গেল। ঘরে এসে জ্বালালে এবার।

মাটির ওপর শোয়া পেসাদি,—

সল্‌তেটা বাড়িয়ে পিলসুজের ওপর রাখ্‌তে রাখ্‌তে বেচারাম বল্লে—ঠাণ্ডায় মাটির ওপর শুয়ে আছিস্ কেন? রাঁধার কিছু জোগাড় করিস্ নি বুঝি?

খালি পুকুরের ভরপুর বুকে টুপুর টুপুর নূপুর বাজে। পেসাদি টুঁ ও করে না, পাশ ফিরেও শোয় না, গা মোড়াও দেয় না। অন্ধকারের মতো অচল!

বেচারাম এগিয়ে এসে দেখ্‌ল,—নীল ; মুখ দিয়ে ফেনা উঠ্‌ছে।

দু হাত দিয়ে মেয়েকে ঝাঁকি দিতে দিতে বল্লে—ঘুমিয়ে আছিস্ কেন লো? বিছানায় শুবি চ। লুকিয়ে কি খেয়েছিস্ রাক্কুসি? বাবুদের ছোট দস্যি ছেলেটা বুঝি ঢিল ছুঁড়েছে আজো? নে ওঠ, পেসাদি, বুড়ো বয়সে সারা দিন হয়রাণি করে' আর রঙ্গ করতে পারি না—

বেজায় ঘুম পেসাদির,—ঘরের ও-কোন্ থেকে কোন্ একটা প্রাণী ঘুম ভেঙে নিজের ছিপ্‌ছিপে কৃশ শরীরটি টান্ করে' সটান্ ঘরের বাইরে চলে' যায়,—বেচারাম ঠাহর করে' দেখল,—ডোরা-কাটা সাপ!

বিদ্যুৎ-লতা যেমন অন্ধকার চুঁড়ে চুঁড়ে কী খুঁজে মরে, তেমনি বেচারামের চাম্‌ড়ার চোখ্‌ দুটো চক্‌চক্‌ করে' উঠ্‌ল। চাপা, বসা, ভাঙা গলায় কেমন একটা শব্দ করে' উঠ্‌ল,—বাঘের নিশ্বাসের মতো!

হঠাৎ পেসাদির দুই গালে ঠাস্‌ ঠাস্‌ করে কতগুলি চড় মার্‌তে মার্‌তে বল্‌তে লাগ্‌ল—ওঠ্‌ হারামজাদি, অবেলায় ঘুমোনো হচ্ছে? ঘর ঝাঁট দেওয়া পর্য্যন্ত হয় নি? সারাদিন কেবল খেলা, কেবল ছুটোছুটি? তিজেকাঠ ধরিয়ে কে এখন ফুঁ দেবে?—

অভিমানিনী পেসাদির মতোই আকাশ থেকে কে যেন ফুঁপোতে ফুঁপোতে বল্‌ছে—আমার জিনিষ আমি ভেঙেছি,—তোমার তাতে কি?

বেচারাম ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল বৃষ্টিতে,—হয়ত সেই সাপটারই খোঁজে। এদিক ওদিক ওপ্‌ড়ানো সজ্‌নে গাছটার গর্ত্তের কাছে, উজাড়-করা ঢিপিটার পাশে সাপটাকেই চায় হয়ত। চায় হয়ত সাপের বন্ধু আকাশের বিদ্যুৎকে, চাকুর চাবুক করে' যেন চাব্‌কে চাবকে কাকে ঘেয়ো করে' দিতে চায়।

কিছুই না,—ভরন্ত পুকুরের বুকে বেহায়া শাপ্‌লা দুলে দুলে নাচে, নব নেবুর মৃদু গন্ধে ভিজা হাওয়া উচাটন হয়ে চালকুমড়োর লতার ডগায় আল্‌গোছে চুমু দেয়। আর জমিদার-বাড়ীর আস্তাবলের ঘোড়াটা পর্য্যন্ত—নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

চালকুমড়োর লতা,—আর সাপ।

বিধাতার যখন যা খেয়াল, যখন যে রকম ফুটানি। কেঁচো আর কচ্ছপ।—

ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়, জমিদারের ছোট ক্যাব্‌লা ছেলেটা সহিসের হুঁকো থেকে জ্বলন্ত কল্‌কেটা তুলে ছুঁড়ে দিয়েছে শূন্যে। দিয়েই বাহাদুর ছেলের বাহবা আর ধরে না। কল্‌কেটা পড়েছে গিয়ে খড়ের গাদায়।

বাবার মতো ঝাঁ ঝাঁ রোদ্—চোখে ঝাল লাগে কান্না আসে। আগুনের শিখা যেন সূর্য্যের সঙ্গে একটু খোস্‌গল্প করবার জন্য আকাশে উঠেছে।

পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে বেচারাম হঠাৎ দাঁত কড়্‌মড়্‌ করে' উঠ্‌ল—বেশ হয়েছে। যার আগুনটা ও পাশ দিয়ে আগু বাড়িয়ে, ব্যাটাদের সর্ব্বস্ব যায়,—আমার যেমন পেসাদি গেল।

ভিড় জমে' গেছে। পেসাদি থাকলে ও এদের মতোই চোখ ডাগর করে' আগুনের রাক্ষুসেপনা দেখত।

পরের জিনিষ পুড়তে দেখলে সবারই মজা লাগে—

সহিস দারোয়ান চাকর বাকররা বালতি নিয়ে ছুটে জল আনতে যাচ্ছিল, জমিদারের বড় তরমুজ ছেলেটা খেঁখিয়ে বলে' উঠল—কি হবে জল এনে? যাক না এ ক'টা খড় পুড়ে!—

বেচারামের ইচ্ছা হল, সঙ্গে সঙ্গে এ জাম্বুবানটারও মুখ পুড়ুক!

তা কি হয়? হঠাৎ এক সময় আগুনের শিখা খামোকা বেচারামের চাল বেয়েই এল যা হোক!

যেন চালকুমড়োর লতার জন্য পেসাদি ওর চিতা থেকে বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে!

বেচারাম বোকার মতো চীৎকার করে উঠল। তাড়াতাড়ি দারোয়ানের হাত থেকে বালতিটা কেড়ে নিয়ে ছুটে পুকুর থেকে জল তুলে ছুটল ঘরের দিকে। ঐ একবারই। খালি নিজের ন্যাকড়ার পুঁটলিটা বাঁচাতে পারল। কিই বা ছিল আর?

সজনে গাছটার কাটার পর যেমন,—তার চেয়ে বড় ফাঁকা, একেবারে আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি। চাল নেই চুলোও নেই।

চালই খারাপ হয়েছিল খেলার,—যে খেলোয়াড় এম্নি বেচালই খেলে। পাকা ঘুঁটি ঘরের কাছে এসে মারা পড়ে।

তারপর আবার সন্ধ্যা হয়, তারা ফোটে,—মরা মাদারের ডালে বাতাস কপাল কোটে, শেফালিকারা শিশিরের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করে।

সারা রাত হাতে কোন কাজ নেই। অগত্যা বেচারাম সারা রাত বাইরে বসে' বসে' ভোঁতা ক্ষুরটাতেই শান্ দেয়।

এক এক ক'রে গোনে। কাঠের ঘোড়া, সজনে গাছ, উইর টিপি, খাড়ু, পেসাদি, ঘর, আর চালকুমড়োর লতা; এক এক করে' সাত। বেচারাম আঙুলের কড় গোনে,—আর ক্ষুরে শান্ দিতে থাকে।

বিধাতার সাত খুন মাপ।

কিন্তু আটবারের বার—

এমন কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে? বুড়ো নাপিত, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে, লাউবিচির মতো দাঁত, পণের পেড়িকুত্তার সামিল,—সে কি না প্রতিজ্ঞা করে বিধাতার ওপর প্রতিশোধ নেবে? কথা শুনে আকাশের তারাগুলি পর্য্যন্ত দাঁত বের করে' হাসে!

কিছুর মধ্যে কিছু না,—হঠাৎ বেচারাম শান্ দেওয়া ক্ষুরটা দিয়ে ঘাড়ে একটা পোঁচ্ দিলে—

পরেই ভ্যাবাচ্যাকার মতো চেঁচিয়ে উঠে চুপ করে যায়। গোঙায়।

চেঁচানি শুনে মুহুরি ছুটে এল কাছা খুলে। সঙ্গে বিস্তর লোক। রক্তের ফিনিক্। গরুর গাড়ী করে লোকজন বোকা নাপিতকে পাশের সহরের হাসপাতালে নিয়ে গেল। এখনো প্রাণটা ফুটো দিয়ে বেরোয়নি।

তারপর আবার ভোর হয়ে আসে, ফিঙে ফড়িঙের দল ফুর্ফুর্ করে উড়ে বেড়ায়, মাঠে গরুর দুধ দোয়ার শব্দ গরুর গলার মৃদু ক্ষণিক ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে মিশে যায়!

তিনবচ্ছর ধরে' বুড়ো বেচারাম জেল খাটছে।

কাল ছাড়া পাবে।



কবিগুরুর প্রতি

—শ্রীপ্রভাতাকরণ বসু
—শ্রীমতী স্নেহময়ী বসুজায়া

হে বিশ্বকবি, বিশ্বভুবন ঘুরে
কত কোটিজনে মাতায়ে তোমার সুরে,
ফিরে এলে তুমি নিভৃত পল্লীগেহে
হয়ত শ্রান্ত মানসে ক্লান্ত দেহে !

সেখানে যখন নীরব সন্ধ্যাক্ষণে
দূরদিগন্তে চেয়ে আপনার মনে,
স্মর তুমি কবি দীর্ঘজীবন মাঝে
যশের সঙ্গে অবিরত আসিয়াছে
আপন জাতির হীন কলঙ্ক-মালা,—
বিনা অপরাধে মহা অপবাদ-ডালা—
কাঁটার মতন নিয়ত বেদনা দিতে,
ব্যঙ্গ করিতে স্বর্গীয় সঙ্গীতে,
তখন তোমার কবি মরমের কোণে
কি ব্যথা বন্ধু জেগে ওঠে নির্জ্জনে ?

সাথীহীন তব শূন্য শয়ন 'পরে
অকারণ দুখে হিয়া কি কেমন করে ?
কত আঘাতের কত বেদনার স্রোতে,
হায় কবি ভেসে এলে কতদিন হ'তে !

আজি জীবনের অস্তাচলের কালে
দীপ্ত আলোক হেরিনু তোমার ভালে।

আমরা তরুণ শুনেছি তোমার গীতি,
আমরা পেয়েছি তৃপ্তি, পেয়েছি প্রীতি।
কিন্তু এ গান যেখানে উৎস লভে,
সেখানে কি ব্যথা খুঁজিতে এল কে কবে?
আজি আমাদের দরদী মনের তারে
তোমার বেদনা বাজিতেছে বারে বারে।

আমাদের ঘর ছোট বেড়া দিয়ে ঢাকা;
বনকুসুমের স্নিগ্ধসুরভিমাখা।
চির প্রশান্তি নিতি সেথা যায় ব'য়ে
ছোট জীবনের হর্ষে আকুল হয়ে!
সেখানেও যদি কভু কোন পথ হ'তে
ঈর্ষ্যার জীব চলে আসে কোন মতে,—
ঘৃণায় তাহারে আমরা খেদাই দূরে,—
সেই অতিহীন জঘন্য কুক্কুরে।
এতটুকু কথা যদি এত গ্লানি আনে,
তুমি অতখানি সহিতেছ কোন্ প্রাণে?

তোমার এদেশ মূল্য বোঝেনি তব।
জানেনি প্রতিভা কতদূর অভিনব!
আজ তুমি আছ ব্যাপিয়া তোমার ভাষা
প্রবীণ তাপস, কোটি নবীনের আশা!
বিষের দাহন নীলকণ্ঠের মত
ধারণ করিয়া রহিয়াছ অবিরত!

কথা না বলার সীমাহীন অপমানে
কত জ্বালা আছে, নিন্দুকদলই জানে !—
ভ্রুক্ষেপহীন সেই তব অবহেলা
আগুন লইয়া দিকে দিকে করে খেলা ;
অপযশকারী সেই আগুনের ফলে
জানি কবি জানি চিরদিন ধ'রে জ্বলে ।

তবু যবে ভাবি ত্রুটি তব নাই কিছু,
মিছে ফেরুপাল ঘুরিছে তোমার পিছু ;
দুখঃ বেদনা দাওনি কাহারো প্রাণে,
তোমার রাগিণী আনন্দ শুধু আনে ;—
—তখন হে কবি দুটি হৃদয়ের তারে
তব অবসাদ ধ্বনি উঠে বারে বারে ॥



মাটীর খেলা

—শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

(দৃশ্য কাব্য)

[রাজার প্রকাণ্ড রাজ-পুরী ! ...

রঙীন্ আলোয় চারিদিক্ ঝল্ মল্ করিতেছে। রাজা রত্ন-খচিত সোনার সিংহাসনে বসিয়া আছেন। বন্ধ্যা রাণী কঙ্কাবতীর একমাস হইল কন্যা হইয়াছে —তাহারই উৎসবানন্দ। রাজ্য জুড়িয়া আনন্দের বাণ ডাকিয়াছে। বন্ধু-বান্ধব লইয়া রাজ-পরিবারের ব্যক্তিগণ বসিয়া আনন্দ করিতেছেন এমন সময় রাণী কন্যাকে লইয়া প্রবেশ করিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন]

সভাসদ্‌গণ

কল্যাণম্! কল্যাণম্! কল্যাণম্!

রাণী

বিশ্বের যিনি আধার সেই দেবাদিদেবকে তোমরা প্রণাম কর...বল রাজকন্যা পার্ব্বতীর মঙ্গল হোক্—ভবিষ্যৎ জীবন মধুময় হোক্! [সকলে তাহা করিলেন]

রাজা

রাণী! যে মানুষটী আজ এই পৃথিবীতে এল কেবল তাকে নিয়েই আনন্দ নয়...রাজ্যের কচিদের ডাকো—বলো যে তাদের আর একটী ছোট্ট সাথী এসেচে। এই নবীন অতিথিটীর আগমনে ওরই মতন আর সবাকার কথা ভাবতে শেখো...ও কি কোথায় চল্‌লে ?

রাণী

আমি চল্‌লুম্...উঃ! কী শীত গো...বাছার যে আমার ঠাণ্ডা লাগ্‌বে!

রাজা

ঠাণ্ডা লাগ্‌বে কঙ্ক ?...শুক্‌নো গাছের পাতা যে কচিদের রাত্রির গাত্রা-

তরণ তারা যদি বাঁচে তা তোমার কন্যাও বাঁচ্‌বে !...চোখের দৃষ্টি যে দে'য়ালে ঠেক্‌চে সে দে'য়ালেরও বাইরে চাইতে হবে আজ...

কবি

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ !...রাণীমা, বিশ্বজোড়াই একজনার প্রাণের আসন পাতা রয়েচে ...কেউ দেখে...কেউ দেখেনা এই টুকুনই তফাৎ। এই যে উৎপল আসছেন...[রাজগায়ক উৎপল আপনার একতারাটী লইয়া সভা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। একতারাতে তখন তাঁর বাজিতেছিল ছেঁড়া-মেঘের একটা ঠাঁই না-পাওয়া সুর। কবি অগ্রসর হইয়া তাঁকে সম্ভাষণ করিলেন]

কবি

রাজা ! আজ উৎপলের একতারাটীতেও দেখ্‌চি উৎসবের সেই সঙ্গীত আপ্‌না থেকে বেজে উঠ্‌চে। বাজাও বন্ধু...আজ্‌কের এই আনন্দ তোমার-সুরে ধরা পড়ুক্‌ !...

রাজা

দ্যাখো উৎপল—আমাদের এই ভাঙ্গা নীড়ে সেদিন যে নূতন ছোট অতিথিটী এসেচে আজ তারই আনন্দোৎসবে তোমার সঙ্গীত সুধাবৃষ্টি করুক্‌ !...

রাণী

উৎপল, হাজার ঐশ্বর্য্যের তপস্যাতেও যাকে পাইনি আজ তাকে পেয়েছি নিঃস্ব বাউলের জীবনের পাত্রটীতে। তাকে আমি কেঁদে বল্‌লুম্—'বাউল, জীবনে যা পেয়ে নারী ধন্যা হয় তা তো আমাকে প্রভু আজো দেননি!' সে বল্‌লে—'রাণীমা, রাজকন্যা ঘরে আস্‌বে কিন্তু মেয়াদ্ ফুরোবে তার দু'দণ্ড পরেই !'......

রাজা

আজ এ কী কথা বল্‌ছো রাণী ? কামনার ধনকে বুকে করে একি কল্পনা তোমার কন্যা ? যাকে এত সাধনার পর পেয়েচো তাকে নিয়ে আজ আনন্দ কর। এস তাঁর চরণে আমাদের সকলকার নতি জানাই...। [সকলের নত মস্তকে ধীরে ধীরে উচ্চারণ]

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

উৎপল

রাণীমা, এই একতারাটী হাতে করে যেদিন এই বিপুল পৃথিবীতে এক্‌লাটী

বেরিয়েছিলুম্ সেদিনও ওরই মতন একটা কচি আমায় টেনে রাখ্‌তে চেয়েছিলো কিন্তু পারেনি...তার কল্‌জেটাকে ছিঁড়ে চলে এসেছি। তোমাদের আনন্দে সেই কথাটী মনে পড়ে চোখে যে আমার কান্নার পাহাড় জমাট্ বেঁধে উঠ্‌চে... রাণীমা!...

কবি

বন্ধু, তুমি এমন জায়গায় পৌঁছুতে পেরোচো যেখান থেকে এই দুনিয়াটার কিস্মত্ ভাল করে বোঝা যায় কিন্তু এদের যে শেখ্‌বার অনেক জিনিষ এখনও বাকী পড়ে রয়েচে। তা চলুক্ তোমার সেই সুরের আলাপন যা আলাদীনের প্রদীপের মতনই অন্য একটী জগৎকে এনে দেয়! [উৎপল তার একতারাটী লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। এক তারাটীর প্রত্যেক্ ঝঙ্কারে প্রকাশ হইতেছিল তাঁহার অন্তরের বাণীটি—চোখ দিয়া তাঁর অঝোরে অশ্রু ঝরিতেছিল। রাজ-সভা নির্ব্বাক্। হঠাৎ গান থামিলে সভার লোক চম্‌কাইয়া গেল।]

রাজা

ধন্য উৎপল তোমার সুর-সাধনা...মানুষের মুখ যে সব কথা বল্‌তে গিয়ে থেমে যায় তোমার ওই একতারাটীর প্রত্যেক্ তারে তারা আপ্‌নি এসে ধরা দিয়েছে।

রাণী

উৎপল, আমার এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয়টি তোমার পুরস্কার। গ্রহণ কর......

উৎপল

রাণীমার পুরস্কার আমার মাথায় থাক্ কিন্তু ও তো আমি সইতে পার্‌বোনা। হাতে দিলেই হাত জ্বলে যাবে। সোনা-রূপোর আলোয় আমার চোখ জ্বলে যায় যে রাণীমা!

রাণী

ওঃ তুমি তো সোনারূপো ছোঁওনা। কী তোমায় দিই তাহলে...

উৎপল

রাণীমা, আজ্‌কের উৎসবের দিনে আমায় এই পুরস্কার দিন্ যে, যে সুরকে আমি আশ্রয় করেছি তাকে যেন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে বুঝ্‌তে পারি!...

রাণী

তথাস্তু। তোমার কামনা সফল হউক।

[উৎপল ও কবি নতমস্তকে রাজা ও রাণীকে অভিবাদন করিয়া সভা হইতে বাহির হইয়া গেলেন]

রাণী

সত্যি রাজা, এ লোকটা কেমন ধারা ? হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে গেল। কোন্ বিবাগী একতারার সুরে ওর গান বাজে তা কে বল্‌বে !

রাজা

সে যাক্ কল্প ! আজকের উৎসবায়োজনে মনটাকে বসাতে দাও। জীবনের নানান্ ফিরিস্তির একটু এদিক্ ওদিক্ হোক্।

রাণী

হ্যাঁ, তাই হোক্।

[এমন সময় রাজকন্যা পার্ব্বতী একটু নড়িয়া উঠিল। রাণী দোলাইয়া দোলাইয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সভা-মধ্য হইতে শিল্পী সুন্দর লাল বলিয়া উঠিলেন—রাণীমা, রাজ-কন্যাকে কোলে নেবার আনন্দ কি আমি পেতে পারি ?]

রাণী

হাঁ, শিল্পী—এই নাও, দেখো মাণিক্ আমার যেন ব্যথা না পায়। [মুখে গুন্ গুন্ করিয়া একটা গানের দুই চারিটা পদ গাহিতে গাহিতে রাণী শিল্পীর ক্রোড়ে রাজ-কন্যাকে দিলেন]

শিল্পী সুন্দর লাল

(আপনার মনে মনে)...কী নিখুঁত্ সৃষ্টি ! (রাজার পানে ফিরিয়া) কিন্তু রাজা এই পেলব দেহটীর ভেতরে লুকিয়ে আছে আর একটী পেলবতর প্রাণ—যাকে দেখ্‌তে হলে চাই অন্তরের সত্য দৃষ্টি !... কিন্তু— [শিল্পীর হাত কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ তার মনে হইল হয়তো এ আনন্দ বেশীদিন রহিবে না]

সুন্দর লাল

রাণীমা, রাজ-কন্যাকে আপনি কোলে নিয়ে দাঁড়ান তো ভাল করে...... আমি একটা ছবি এঁকে নিচ্ছি। [রাণী কন্যাকে কোলে লইয়া দাঁড়াইলেন। শিল্পী তুলিকা ও বর্ণ-সম্ভার লইয়া প্রস্তুত হইলেন। চমৎকার আলো শিল্পীর চারিদিকে তখন এক কল্প লোকের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। জীবনের ব্যথা বেদনার লক্ষ পসরা এরা যেন এক গাল হাসিয়া নামাইয়া দিয়াছে—কেবল

আনন্দ, পরিপূর্ণ আনন্দ। রাণীর চোখেমুখে তাহার ভিতরকার মানুষটা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। Venus de milo'র মতনই একেবারে অতুলনীয় তাহার রূপ—দেখিলে চোখ ঝলসিয়া যায়।]

সুন্দর লাল

(আপনার মনে আঁকিতে আঁকিতে) এ রূপকে, আজকের এই বিরাট্ আনন্দকে কি মানুষ ...... রক্তমাংসে গড়া মানুষ ... তার কৃত্রিম তুলিতে ফুটিয়ে তুলতে পারে !... উঃ, এত ভাল !

(রাণীকে লক্ষ্য করিয়া) রাণীমা, দয়া করে একটু বাঁয়ের দিক্‌টায় ফিরে দাঁড়ান। এই হয়েচে... ব্যস্ !...

রাণী

আমি আর পারিনে শিল্পী ...... তুমি শীগ্‌গির কর! দেখ্‌চোনা, বাছার আমার মুখ শুকিয়ে উঠ্‌চে !...... সুন্দর, একটু... এই একটু দেরী কর। এই জরির পোষাকে আমার দুষ্টু মানিক্‌টাকে চমৎকার দেখাবে। [এই বলিয়া শিশুর গণ্ডদেশে চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়া মৃদু আঘাত করিলেন।]

সুন্দর লাল

[তুলিকা দিয়া রঙ্ গুলিতে গুলিতে] জীবন—শিল্পী যে আভরণ দিয়ে দিয়েচেন, মানুষ চায় তারও বাড়া এক ছোপ্ দিতে।... কিন্তু ওরা তো জানে না যে নানান্ কৃত্রিম রঙের বালাইতে সত্যিকারের জিনিষ যেটা তাকে হারিয়ে ফেলে... [খানিক্ চুপ করিয়া থাকিয়া] সেই জন্যেই তো মানুষের এত দুখ্‌খু! শরতের সোনার আলোকেও ওরা চায় আরো রঙীন্ করতে...

রাজা

সুন্দর, এমন ছবি আঁকো যা আমাদের এই হীরের টুক্‌রোটাকে পৃথিবীর-বুকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখে!...

সুন্দর লাল

রাজা, তুমি শিল্পীর তুলিকার তেজ জানো না!... সে ততদূর যেতে পারে মানুষ যতদূর আপ্‌নার মুখে একটা কৃত্রিমতার মুখোস্ চাপিয়ে রাখে কিন্তু যেখানে মানুষ তার যুগান্তরের কষ্টি পাথরে যাচাই করা নিজস্ব নিয়ে রয়েচে

সেখানে তুলিকা তার থম্‌কে দাঁড়ায়—হাজার চালালেও চলে না। বুক যে আমার ভরে আছে রাজা—আমি এত বুঝ্‌চি যে সে বোঝা তুলির মুখে পৌছয়না !... [বলিয়াই শিল্পী আবার তুলিকা লইয়া আচম্‌কা যেন কিছুই হয় নাই এমনই ভাবে বসিয়া গেলেন]

(কবির প্রবেশ)

কবি

রাজা, বাইরের পৃথিবীটাকে একটু দেখতে গিয়েছিলুম্। তোমাদের রাজ-সভার জগৎটা থেকে সে জগতের তফাৎ অনেকখানি !

রাজা

তার মানে কী ?

কবি

তার মানে ? তার মানে ভয়ানক রকম সোজা !...... তোমাদের ক্ষিদে পেয়েছিল... এখন খাদ্য জুটেছে তাই আনন্দ ধরে না। এর মতো সোজা কথা এই রাজ্‌দরবারে খুব কমই শোন—কিন্তু মানব-চিত্তের ক্ষুধার সন্ধান তোম্‌রা পাওনি।......

রাজা

তোমার ওই ধরণের কথা—কবি—আমি একটু কম বুঝি। জীবনের সে দিকটাকে তোমরা বুঝ্‌তে চাও বুঝ, আমাদের টেনো না ! মানুষ তাহলে মানুষ থাকবে না—তারা হবে বিশ্বের বাঁশীতে যে সুর বাজে তারই উপাসক। আমি তা চাইনে, কবি !

কবি

সে বেশ ভাল কথা !

(সহসা শিল্পী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন)

শিল্পী

উঃ, কি চমৎকার রাজা। হাঃ......হাঃ......(শিল্পী পাগলের মত তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতে লাগিলেন)

রাজা

কি সংবাদ শিল্পী ?......একি ?

শিল্পী

কী জিগ্‌গেস করছো রাজা? আজ যে আমার শিল্প সাধনার পরিসমাপ্তি। মানুষ যা পায়না আমি আজ তাই পেয়েছি। উঃ!...(আবার তেমনই হাসি)

রাণী

একী রাজা...ওগো...তোমরা সবাই দেখ বাছা আমার...মাণিক্ আমার নীল হয়ে আস্‌ছে কেন! ...ওঃ... [রাণীর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। সভা গৃহে ব্যস্ততার সাড়া পড়িয়া গেল। রাজা সিংহাসন হইতে লাফাইয়া রাণীর নিকট ছুটিয়া গেলেন]

রাজা

সত্যিই তো...বাউলের কথাই সত্যি হল শেষে।...মাণিক...শেষ, শেষ হয়ে গেছে। কেউ...কে-উ-উ...বাঁচাতে পারলনা—রাণী! রাণী।

(রাজা ও রাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন...শিল্পী ছবি ফেলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন)

যবনিকা পতন

নীলকণ্ঠ

(উপন্যাস)

বৈশাখের শেষাশেষি এক সন্ধ্যায় সুলতা ও মালতী বকুলতলার শান বাঁধানো ঘাটের উপর বসিয়া পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞা করিল, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাহাদের কেহ অপরকে ভুলিবে না;—পৃথিবীর সুখ দুঃখ, ঝড়বাতাস যেমন করিয়াই বহিয়া যাক্, তাহাদের ভালবাসার বাঁধন অটুট থাকিবে!

যুঁই ও বেলের মালা গাঁথিয়া সুলতা মালতীর গলায় পরাইল; মালতীও বকুলের মালা গাঁথিয়া সুলতার খোঁপায় সাজাইয়া দিল। আকাশের 'সাঁঝ তারা'কে সাক্ষী করিয়া তাহারা সেইদিন হইতে আপনাদের এক নূতন সম্বন্ধ পাতাইল—'মনের কথা'।

বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে। শৈশব হইতে একসঙ্গে তাহারা খেলিয়াছে, এক পাঠশালায় পড়িয়াছে। সুলতার পিতা বড়লোক—গ্রামের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার। মালতী গরীবের মেয়ে—তাহাদের প্রতিবেশী ও জ্ঞাতি। অবস্থার তারতম্য থাকিলেও সুলতা ও মালতীর মধ্যে প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। সুলতাকে সেদিন চন্দননগর হইতে বৃন্দাবন বসু, তাঁহার পুত্র গোপালের সঙ্গে বিবাহ দিবেন বলিয়া 'মেয়ে' দেখিতে আসিয়াছিলেন। সুলতাকে তাঁর অপছন্দ করিবার বিশেষ কিছু ছিলনা। দেখিতে রঙ ঈষৎ শ্যাম হইলেও লাবণ্য ও মুখশ্রীর অভাব ছিলনা। বৃন্দাবন 'মেয়ে' দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে। আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় দুইজনে অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। আপনাদের ছেলেবেলার বন্ধুত্ব চিরদিন যাহাতে অটুট থাকে, সেইজন্যই আজ তাহারা নির্জ্জনে মিলিয়া দেবতার চরণে মিনতি জানাইল।

অনেক রাত্রি হইলে পিছনের চাঁদ যখন সামনে ঠিক দীঘির উপর আসিয়া দাঁড়াইল, মালতী তাহা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সুলতাকে বলিল "আজ আসি বোন্! বাবা বোধ হয় রাগ করছেন! যে ক'টাদিন আছিস্ এখানে, ইচ্ছা হয়না একদণ্ডও কাছ ছেড়ে যাই! আবার কাল দুপুরে আস্‌ব!"

সুলতা মালতীকে বাগানের দুয়ার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিল।

বাড়ীতে আসিয়া সুলতা মায়ের কাছে চুপিচুপি সজলনয়নে মিনতি করিয়া বলিল "বাবাকে বল মা,—আমি তোমাদের কাছ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবনা। কেন আমাকে তোমরা তাড়িয়ে দেবে!"

সুলতার মা বলিলেন "পাগলী মেয়ে! এ রকম ভাবতে নেই! অকল্যাণ হয়! ভগবানের আশীর্ব্বাদে চারহাত এক হয়ে যাক,—তারপর দেখব তোর বাপমায়ের জন্য কত টান থাকে! দুমাস স্বামীর ঘর করবার পর দেখব—সাত দিনে একখানা চিঠি লিখে খবর নেবারও অবসর হবেনা!"

সুলতা বুঝিল প্রতিবাদ নিস্ফল। সকলকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া সে বড় ব্যাকুল হইয়াছিল। তাহার বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিবার সময় মাতা পিতা আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই অপূর্ব্ব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। সে নিজে বিষণ্ন হইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। এই বিচ্ছেদ যে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন নয় তা' সে জানিত। তবু মন প্রবোধ মানেনা!

নির্দ্দিষ্ট বিবাহের তারিখ নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। একদিন সুলতার পিতা প্রিয়নাথ মিত্র, ভাবী বৈবাহিকের লেখা একখানি চিঠি পাইলেন। গোপাল পরীক্ষা দিয়া চন্দননগরে আসিয়াছে। বৃন্দাবন তাহাকে সমস্ত কথা জানাইয়াছেন। মেয়ে ভাল দেখিয়া তিনি একেবারেই 'আশীর্ব্বাদ' পর্য্যন্ত সারিয়া গিয়াছেন একথা শুনিয়া গোপাল কিছু দুঃখিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের ভ্রাতুষ্পুত্র নিখিলের কাছে সে বলিয়াছে বিবাহের আগে সে নিজে সুলতাকে দেখিতে চায়। সেকালের নিয়ম সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আগে পিতার পছন্দেই ছেলেরা মত দিত। এক্ষণে তাহারা স্বাধীন হইতে চায়। যাহা হউক প্রিয়নাথ যদি গোপালের এই অদ্ভুত ইচ্ছার পোষকতা করেন, পত্রোত্তরে বৃন্দাবনকে জানাইলে তিনি বাধিত হইবেন।

চিঠি পড়িয়া প্রিয়নাথ উত্তরে লিখিলেন, গোপাল যদি সুলতাকে দেখিতে আসে তাহাতে তাঁহার আপত্তি কিছুই নাই।

শ্রীরামপুরের মত জায়গায়, বর নিজে কনে দেখিতে আসিতেছে এ ব্যাপারটী নূতন নহে। তথাপি মেয়েমহলে আন্দোলন পড়িয়া গেল। কেহ বলিলেন, "শিক্ষিত ছেলে, পাশ করা, সহর ঘেঁষা তাই এরকম আবদার। আগে এমনটা কখনো ছিলনা। আজকাল ছেলেরা মনে করে তাদের বাপের চেয়েও তারা বেশী বোঝে"। আর একজন বলিলেন "বাসরের দিন এর উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। এ ক'টা দিন গেলে বাঁচি''। কোনও নবীনা আবার তাঁহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিল "যার সঙ্গে চিরকালের জন্য বাঁধা পড়তে হবে, আগে থাকতে তাকে নিজের রুচি অনুযায়ী মিলিয়ে দেখতে তিনি যদি চান এতে আমরা দোষ দিতে পারি না।"

যাহ'ক গোপালের এই আচরণ কেহ নিন্দা, কেহবা প্রশংসা করিলেও, সে আসিলে তাহাকে দেখিবার জন্য সকলে আশেপাশে, জানালার আড়ালে, ইতস্ততঃ লুকাইয়া উঁকি মারিতে লাগিলেন। নিখিল গোপালের সঙ্গে আসিয়াছিল। সে বয়সে গোপালের অপেক্ষা দুএক বছরের বড়। তাহারও বিবাহ হয় নাই। এই সব অপরিচিতা রমণীর কৌতূহল-দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া সে অপ্রতিভ হইয়াছিল। গোপাল কিন্তু মোটেই চঞ্চল হয় নাই। সুলতার দিকে একটীবার ভাল করিয়া চাহিয়াই সে চোখ নামাইল। সুলতার মধ্যে আয়েষা বা তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য কিছুই অনুভব না করিয়া সে মনঃক্ষুণ্ণ হইল। তাহার পছন্দ হইল না।

সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া ভাবিতে লাগিল। পিতার আদেশ মনে হইতেছিল "দেখতে যাচ্ছিস্ যা'! কিন্তু মনে রাখিস্—আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করে এসেছি! আমার অপমান করিস্নি!" গোপাল ভাবিতেছিল, বাড়ীতে গিয়া সে পিতাকে কি বলিবে?

গোপালকে বিমনা দেখিয়া সুলতার কোনও আত্মীয় নিখিলকে বলিলেন, বাবাজীর কি ভাব বুঝতে পারছি না! ওহে নিখিল! তুমি আমাদের হয়ে একটু ওকালতী কর। উনি ত সহরের লোক হয়ে ভব্য হয়েছেন। তুমি আমাদের মতই পাড়াগাঁয়ের লোক যখন,—একটু আধটু বুঝিয়ে বল। আমাদের এই বনজঙ্গলের দেশে সহরের অপ্সরী খুঁজে দেখাতে পারবনা এটুকু আগে স্বীকার করছি। তবে, ওরির মধ্যে—যতটা সম্ভব লেখাপড়াও জানে,—কাজকর্ম্ম জানে,—আর নেহাৎ কুৎসিতও নয়— ।......"

নিখিল আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বিজ্ঞের মত বলিল "নিশ্চই ত। বিশেষ কাকা যখন পছন্দ করে গেছেন—আমরা আর কি বলতে পারি? কি বলিস গোপাল—দেখা হয়েছে ত? নে,—এইবার যা জিজ্ঞাসা করবার কর। বেলা পড়ে আসছে। এবার উঠতে হবে।"

মালতী মৃদুস্বরে সুলতার কাণে কাণে বলিল "বর বোধ হয় বোবা। কথা কহিতে জানে না। যাচাই করবার যখন কথা উঠেছে—সেটা দুপক্ষ থেকে হওয়া ভাল। তোর নিজেরও যদি কিছু বলবার থাকে এইবেলা জিজ্ঞেস করে নে। অন্ততঃ কথা কহিতে জানে কিনা ———"

মালতী আস্তে কথা কহিলেও সকলেই তাহা শুনিতে পাইলেন। মেয়েদের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ খেলিয়া গেল।

এখানকার সকলের বিদ্রূপ গোপালের অসহ্য হইয়াছিল! তথাপি মনে হইল যে মেয়েটী এইরূপ কথা বলিল সে চঞ্চল হইলেও তাহার কথার দাম আছে। তাহার পরিহাসের মধ্যে রুচির অসঙ্গতি নাই—বরং তীক্ষ্ণ ক্ষুরের মত ধার আছে। মালতীর দিকে গোপাল চাহিয়া দেখিল। তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া গোপাল মুগ্ধ হইল। সুলতার সহিত তুলনায় সে অনেক বেশী সুন্দর।

গোপাল আপনাকে অবমানিত ভাবিতে গিয়াও পারিল না। মালতীকে দেখিয়া সে আপনার সমস্ত ক্ষোভ ভুলিয়া গেল। ভাবিল যেমন করিয়া হউক তাহাকে জয় করিবে। তারপর,.....তাহাকে প্রমাণ দিবে যে সে বোবা নয়!

গোপাল মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার নাম কি ?"

মালতী হাসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল "মহাশয় বোবা নন তা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু চোখের দোষ আছে স্বীকার করতেই হবে। দৃষ্টিটা বাঁদিকে না এসে সামনে যাওয়া উচিত ছিল।"

আবার একবার সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

গোপাল সপ্রতিভ হইয়া বলিল "যা উচিত ছিল অনেক সময় তা না ঘটতেও পারে। তবে চোখ যে আমার ভুল করেছে তা আমি স্বীকার করব না।...... আমি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি!"

তাহার কথায় এবার মালতী অপ্রস্তুত হইল। তার ঠোঁটদুটা কাঁপিতে লাগিল। সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল "ছিঃ!"

গোপালকে কে যেন সপাৎ করিয়া ছিপ্‌টী মারিল। তার শরীরের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে নিজেকে সংযত করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আচ্ছা, আমি এখন তবে চললুম।"

সুলতার আত্মীয় কুটুম্বেরা বলিলেন "সে কি কথা! জল খেয়ে যাও! একটু জিরোও! কথাবার্ত্তা কও!"

নিখিল গোপালের হাত ধরিয়া বলিল "বোস্! কি পাগলামী কর্‌ছিস্?"

গোপাল বলিল "তোমার থাকতে ইচ্ছা হয় থাক! আমি চললুম।"

অগত্যা নিখিলকেও উঠিতে হইল।

সকলেই বুঝিতে পারিলেন মালতীর জন্যই গোপালের রাগ। গোপাল আপনাকে এতখানি আহত মনে করিল দেখিয়া মালতীর নিজেরও দুঃখ হইতে ছিল। কিন্তু সে ভাবিয়া দেখিল—সেত কিছু দোষ করে নাই! বরং গোপাল নিজেই তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিয়া অপমান করিয়াছে। লোকে এ সব কথা কেহ আলোচনা করিয়া দেখিল না। সকলে জানিলেন মালতী মুখরা—তাহার জন্যই এই গোল বাঁধিল। মালতীকে সকলেই তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

সুলতা মালতীকে বলিল "কাঁদিস্‌নি বোন্। সবাই তোকে বক্‌ছে—কিন্তু সত্যি বলছি আজ তোর প্রতি আমি এতদূর সন্তুষ্ট হয়েছি যে কথায় বলতে পারছি না। আমায় বিষ খেয়ে মরতে হয় তবু তাকে বিয়ে করতে পারব না। লোকটা অভদ্র। মেয়ে বলে কি আমরা মানুষ নই? আমাদের আত্মসম্মান কিছু থাকতে নেই?

মালতী উত্তরে কিছু বলিল না। খানিক চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে উঠিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্ত সুলতার অনুমতি চাহিল। বলিল "বাড়ী যাই' আমি!—তোর মা বারণ করে দিলেন—আর যেন না তোর সঙ্গে দেখা করতে আসি। হয়ত জীবনে ছাড়াছাড়ি হবার সময় এসেছে আমাদের। মাঝে মাঝে মনে করিস যদি তাহলেও ধন্য হব!"

"এরকম করে অমঙ্গল কথা ভাবিস্ নি বলছি! মা বলুকগে! আমি তোকে না দেখে থাকতে পারব না। তোকে না আসতে দেয়—আমি নিজে যাব তোদের বাড়ী। আমি মাকে বলব—"

"বারণ করছি তোকে! আমায় যদি সত্যি কখনো ভালবেসে থাকিস, মার সঙ্গে মনান্তর বাদাস নি, মেয়ে হয়ে জন্মেছি—আজ নাহয় কাল ছাড়াছাড়ি হবেই। লোকে কথায় বলে রাজায় রাজায় দেখা সম্ভব তবু বোনে বোনে দেখা হয় না। আমাদের ভালবাসা—'মনের কথা'ই থেকে যাবে। মনের মাঝেই তাকে ভুলতে হবে। বাড়ী গিয়ে তোর শ্বশুরের কথায় বরের রাগ পড়ে যাবে মিছামিছি বিদ্বেষ করে দূরে থাকিস্ না। কায় মনে ওঁর দোষ ভুলে তাঁকে ক্ষমা করিস! জানিস্—আমাদের ক্ষমা আর ভালবাসা ছাড়া কোন' ঐশ্বর্য্য বা সম্পত্তি নেই!"

"না 'মনের কথা'! আমি তা পারবনা। আমি একথা ভুলতে পারব না যে সে তোকে অপমান করেছে।......যাক্......তার কথা আমি ভাবতেও চাই না। তুই বাড়ী যাবি বলছিস্—যা। কি আর বলব। ভগবান তোকে ভাল রাখুন। শুধু এই অনুরোধ যদি কখনো তোর বাড়ী যাই—তাড়িয়ে দিস্ নি। তুই আস্তে পারবিনা! আমি কিন্তু বাধা মানব না। মুখ বুজে সব সহ্য যায় না। সহ্য করবার একটা সীমা আছে।"

মালতী দেখিল—সুলতা বিষম রাগিয়াছে। এসময় এবিষয়ে কথা কাটাকাটি করা নিস্ফল। এইজন্য সে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে বিদায়ের পূর্ব্বে একটীবার নিবিড় আলিঙ্গনে জড়াইয়া অবশেষে আপনার পথে চলিল।

সুলতা দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। ক্রমশঃ—

শ্রী..................................

নিদাঘে

—শ্রীজিতেন চক্রবর্ত্তী

সমুজ্জ্বল নির্ম্মেঘ আকাশে
গ্রীষ্মের প্রচণ্ডরবি কিরণের তপ্ত স্রোতে ভাসে ;
থাকি থাকি শ্বসিতেছে প্রকৃতির উত্তপ্ত নিঃশ্বাস,
জ্বালা-ময় উন্মত্ত বাতাস !
নীরব নিস্তব্ধ চরাচর—
ইন্দ্রজালস্পর্শে যেন বাক্যহারা জঙ্গম স্থাবর,—
যেন কোন রুদ্র অভিশাপে,
সংজ্ঞা হীন এ জগৎ না জানি সে কোন মহাপাপে !

দূরে দূরে অতিদূরে রৌদ্রদীপ্ত গগনের গায়,
ছুটী চিল ভাসে শুধু অতি ক্ষুদ্র মসীবিন্দু প্রায়
দ্বিপ্রহর ভেদ করি, কাণে আজি লাগে বারবার—
তাপক্লান্ত ঘুঘুর চীৎকার !
হে নিঠুর অদৃশ্য দেবতা !
সম্বর ও রুদ্ররোষ হাসিমুখে কও পুন কথা।
দিগন্তের প্রান্তদেশে দেখি ওই রৌদ্রকণা লোটে,
রুদ্ধদ্বার কক্ষমাঝে প্রাণ মোর হাঁপাইয়া ওঠে !

ছায়াময় শীতল শ্যামল,
ওই যে বনানীকুঞ্জ, নিম্নে দূর্ব্বাবিস্তৃত কোমল—
যার স্নিগ্ধ অন্তরালে থাকি
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ চাতক উঠিছে ডাকি' ডাকি,
স্বপ্নাবেশে পরাণ বিভোর
যেথায় ঘুমায় পাখী—ওখানে কি স্থান নাই মোর?
কৃত্রিম এ কারাগৃহ পরিহরি' হোথা গিয়া আজ,
লুটাইতে সাধ মনে,—বাধা দেয় সভ্যতা সমাজ!

সাহিত্যের দান

—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন

যশ, অর্থ, ব্যবহারাভিজ্ঞতা, অমঙ্গলনাশ, অনির্ব্বচনীয় সুখাস্বাদ ও উপদেশ-লাভ—এইগুলিই হইল সাহিত্যের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। ইহাদের কোন না কোন একটীকে লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্য লিখিত ও পঠিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের এই গুলিই প্রধান লক্ষ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয় কিন্তু ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে অন্য সাহিত্যের লক্ষ্য বুঝি অন্যরূপ; তাহা নহে। দেশ কাল নিরপেক্ষ ভাবে সকল সাহিত্যের মূল নীতি এইগুলি। এক্ষনে এই গুলির বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে।

যশঃ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেক্ষপীর, মিল্টন, কালিদাস, ভবভূতি, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সকলেই অক্ষয় উজ্জ্বল

যশোমণিহারমণ্ডিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন। ফলতঃ প্রসিদ্ধ লেখকগণ কীর্ত্তি গৌরবচ্ছটায় চিরদিন অমর হইয়া থাকিবেন।

অর্থ সম্বন্ধে জানা যায় যে কি আধুনিক কি প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক-গণ যথেষ্ট অর্থের অধিকারী হইয়াছেন ; আজ কাল অনেকের নিকট অর্থই প্রধান লক্ষ্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বাল্মীকি হোমর কবিকঙ্কণ প্রভৃতির রচিত গ্রন্থাদিতে আমরা তত্তৎকালের ও তত্তদ্দেশের ব্যবহারাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকি।

সাহিত্যে অমঙ্গল নাশ হয়। শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্য ও বৈকল্য দূর করিয়া সৎসাহিত্য উভয়কে নীরোগ সতেজ ও প্রফুল্ল করিয়া তুলে। প্রবাদ আছে যে ময়ূরকবি "সূর্য্যশতক" রচনা করিয়া কুষ্ঠব্যাধি-নির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতির পঠন অমঙ্গল দূর করে, এই ধারণা সকলের না হৌক, অনেকের এখনও আছে। রামরসায়ন, মনসার ভাসান প্রভৃতির পঠন অনেকস্থলে এই উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। পাপের স্রোত ফিরাইয়া দিয়া পুণ্যপীযূষধারায় সংসারকে স্নাত করাইয়া সামাজিক পবিত্রতা ও শান্তি স্থাপন করিতে সাহিত্যের বিশেষ উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয় ; অত্যাচার উৎপীড়ণ দমিত করিয়া নিয়মশৃঙ্খলা স্থাপন পূর্ব্বক সাহিত্য জগতের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে, এখানে কেবল মাত্র ''নীলদর্পণ' এর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ঠ হইবে।

সাহিত্যের অনুশীলনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন ; এরূপ অপূর্ব্ব রসাস্বাদ না পাইলে, বিরক্তি বা অতৃপ্তি উপভোগের জন্য, কেহ উহাতে নিরত হইত না।

সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইল সৎশিক্ষা দেওয়া—সাধু আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া লোকহৃদয়কে তৎপ্রবণ করিয়া উন্নত করা। "রামাদির ন্যায় হইতে হইবে রাবণাদির ন্যায় নহে", এই ধারণা অজ্ঞাতসারে রামায়ণ পাঠে আমাদের হৃদয়ে বদ্ধ মূল হইয়া যায়, নায়কের উৎকর্ষ পাঠকের মনকে আপনা আপনি উৎকর্ষান্বিত করিয়া তুলে। শিক্ষক পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন এবং বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা আমরা নানা প্রকারে উপদিষ্ট হই বটে, কিন্তু কাব্য সাহিত্য আমা-দিগকে গুরুজনের ন্যায় আদেশ করে না ; "তোমাকে ইহা করিতে হইবে অথবা ইহা হইতে হইবে" এরূপ কঠোর অনুশাসন-বাক্য সাহিত্যে নাই। সাহিত্য

মুগ্ধা কান্তার ন্যায় সুনৃতভাষিণী, প্রিয়বচনরতা হিতৈষিণী প্রণয়িনীর ন্যায় মধুর আলাপে ও নর্ম্মবাক্যে আমাদের চিত্তকে সরস নির্ম্মল করিয়া দেয়, সৎবিষয়ে অনুরক্তি ও অসৎবিষয়ে বিরক্তি আনিয়া দেয়, অতর্কিত ভাবে আমাদিগকে সাধু আদর্শের দিকে লইয়া যায়। সৎসাহিত্য মনুষ্যহৃদয়কে ও সমাজকে সাধু ভাবে সংগঠন করে।

অসৎসাহিত্য ইহার বিপরীত; ইহাতে সমাজের যত অপকার হয় আর কিছুতে তত হয় না, যেহেতু আদর্শ নীচ হইলে হৃদয়ও মলিন ও নীচ হইয়া যায়। সাহিত্য আমাদিগকে তদানীন্তন সমাজের উৎকর্ষাপকর্ষের বিষয় কতকটা অবগত করাইয়া দেয়, সাহিত্যে সমাজের অনেকটা ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

এখন কথা হইতেছে এই যে কোন্ আদর্শ সৎ, কোন্টাই বা অসৎ, ইহা বিচারিত হইবে কিরূপে? ভাল মন্দ আদর্শের সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষণ নাই। যাহা অন্য দেশের বা অন্য কালের সাধু আদর্শ বলিয়া প্রতিভাত তাহা এ দেশের বা এ কালের সাধু আদর্শ রূপে গৃহীত হয় না, হইতে পারেও না। কোন দেশে বা কোন সময়ে যাহা অসৎ বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাই অন্য সময়ে সৎ বলিয়া আদৃত হয়। আবার একই দেশে সময় ভেদে আদর্শেরও ভিন্নতা ঘটে। ইহার, এই ভাল মন্দের, নিয়ামক কে? সার্ব্ববাদিসম্মত আদর্শ না মিলিলেও, ইহা নিশ্চিত যে প্রথমতঃ আমাদের মনই ভাল মন্দ চিনাইয়া দেয়, মনই প্রধান প্রমাণ ও নিয়ামক। আর তাহাকেও যদি প্রকৃষ্ট প্রমাণ রূপে স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যাইতে পারে যে যাহা নীতি ও ধর্ম্মের পরিপন্থী, যাহা সমাজের অপকারক, যাহাতে মানবকুলের অকল্যাণ সাধিত হয়, সেইরূপ আদর্শই নিকৃষ্ট আদর্শ এবং ইহার বিপরীত হইল উৎকৃষ্ট। এরূপ উক্তিতে বোধ হয় সকলের ঐকমত্য থাকিতে পারে।

সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে, (অব্যভিচরিত ভাবে দৃষ্ট না হইলেও) অনেকটা ধরাবাঁধা নিয়ম আছে। সংস্কৃত সাহিত্য অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট বলিয়া অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। হইতে পারে ২।৪টা উদ্ভট শ্লোকের ভিতর অশ্লীলতা কিছু অধিকতর ফুটিয়া উঠিয়াছে, বা শৃঙ্গার বর্ণনা একটু অতি-রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, (এরূপ দোষ কোন্ সাহিত্যেই বা নাই?) কিন্তু কাব্য নাটকাদিতে সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য কোথায় ও ব্যাহত হয় নাই,

আদর্শকে কোথায় একটুও খাটো করা হয় নাই; দুষ্টের দমন শিষ্টের উন্নতি, ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাভব সর্ব্বত্র সমভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

আজকাল বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি যে ভাবে ও যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া অনেকের মনে একটু ভীতির ও নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে। উপন্যাস নাটক প্রভৃতির উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বন্যায় দেশ প্লাবিত হইতেছে। ইহার ফল কিরূপ হইতেছে তাহা যথাবসরে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ খুব ভালই ছিল। জগতের প্রায় তাবৎ কবিই প্রণয়ের মোহিনী মূর্ত্তিতে ও উন্মাদনা শক্তিতে পাগল; অনেকে তাহার মহিমামাধুর্য্যের অনেক প্রকার স্তুতি গান করিয়াছেন; অনেকে তাহার সম্ভোগ বিপ্রলম্ভাদি অবস্থার নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত করিয়া অমর হইয়াছেন, অনেকে আবার তাহাকে বিকৃত পূতিগন্ধময় করিয়া তাহাকে মসীময় কালিমামণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। কয়েকখানি পুস্তকে গুপ্তপ্রেমের অবাধ স্রোত প্রবাহিত হইলেও, সে স্রোত একেবারে পঙ্কিল হয় নাই; শেষে উহা পুণ্যসাগরসঙ্গমে গিয়া মিশিয়াছে, পবিত্র পরিণয়বন্ধনে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রভাব কিরূপ? সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রয়োজন বা ফলের বিষয় পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। মানুষকে উন্নত করা সমাজের মালিন্য দূর করা সকলকে সাধু আদর্শের দিকে প্রবর্ত্তিত করা—এই গুলিই হইল মুখ্য উদ্দেশ্য। সকলের রুচি এক প্রকার নহে; ভিন্ন রুচি সত্ত্বেও যাহাতে সকলে সমভাবে নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতে পারে, ইহাও ও সাহিত্যের লক্ষ্য। উত্তম সাহিত্যে নানা প্রকার রস আস্বাদিত হয়; সেই রসাস্বাদনজনিত সুখ অনির্ব্বচনীয়, আলংকারিকেরা তাহাকে ব্রহ্মানন্দের সহিত তুলনা করিয়াছেন, বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য "ব্রহ্মানন্দ সহোদর" বলিয়া তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন।

এখন সেই সুখ ব্রহ্মানন্দ সহোদর হইতে গেলে, তাহাকে অমঙ্গল কর পৈশাচিক জঘন্য প্রবৃত্তিসম্ভূত করিলে চলিবে না। অবশ্য সমাজের দোষ উদ্‌ঘাটন ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ কবিকে করিতে হয়। তাহা করিতে হইলে যথেষ্ট বিচক্ষণতা বিচারশক্তি দূরদর্শিতা ও ধীরতা প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন হয়। যে জিনিষটা মন্দ, তাহাকে ঠিক সেই ভাবে লোকের চক্ষুর

কাছে ধরিলে তাহাতে অনেক সময় ভাল না হইয়া বিষময় ফলই হয়। প্রচ্ছন্ন পাপ সকল কালেই বিদ্যমান, কিন্তু তাই বলিয়া পাপের সম্পূর্ণ ছবিটী নগ্নভাবে দেখাইলে পাপের কথা অতিমাত্রায় বর্ণিত হইলে, তাহাতে লোকের ঘৃণা বা বিরক্তি না জন্মিয়া বরং লিপ্সাই হইয়া থাকে। আজ কাল বায়স্কোপের অসৎ চিত্রে লোকের যতটা অনিষ্ট হইতেছে, ততটা অ নষ্ট থিয়েটার মদ্যাদি ব্যসন সেবাতেও হয় নাই। এজন্য পাশ্চাত্য সুধীগণ বিশেষ বিশেষ চিত্র প্রদর্শনকে অপরাধের তালিকাভুক্ত করিতেছেন। মোটরে ডাকাতি করাটা সাহিত্যাদি হইতে য৽টা জানা যায় নাই, ততটা বায়স্কোপ হইতে পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সাপ লইয়া খেলা করা ও কবির পাপ লইয়া কারবার করা উভয়েই একরূপ, একটু অনবধান হইলেই বিশেষ বিপদ।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র অসাধারণ প্রতিভা কৃতিত্ব ও কৌশল লইয়া যে সকল অনুপম গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রভাব এখন বঙ্গ সমাজ সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতেছে। তাঁহার অমর মন্ত্র "বন্দেমাতরম্‌" এখন চৈতন্য লাভ করিয়া এবং তাঁহার "শৈবলিনী" "কুন্দনন্দিনী" প্রভৃতি নায়িকারা আসরে আসিয়া বঙ্গ সমাজকে ও সাহিত্যকে যেন ওলট্‌ পালট্‌ করিয়া দিয়াছে। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্র নাথ ও বড় কম প্রভাব বিস্তার করেন নাই। তাঁহার প্রভাব কেবল বঙ্গ সমাজ নহে, অন্য সমাজও কতকটা অনুভব করিয়াছে। রাজ কৃষ্ণ রায়, গিরীশ চন্দ্র ঘোষ, অমৃত লাল বসু প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ রঙ্গালয়ের সাহায্যে লোকরুচিকে কিভাবে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাও দেখিবার বিষয়। তাঁহারা আমাদিগকে কি দিয়াছেন তাহা বারান্তরে আলোচ্য।

সওদা

বলে—মানে বুঝিনা কবিতার। যেন না বোঝাটাই তার অহঙ্কার। কিন্তু কে তাকে জিগ্‌গেস কর্‌বে—তোমার মন কতখানি? বোঝবার কতটুকু অধিকারই বা তোমার আছে?

উপক্রমণিকা প'ড়ে বুঝ্‌তে চায় উপনিষৎ,—পত্রমালা সাঙ্গ ক'রেই বলাকা।

বাংলা হরফ্‌ চিনি, তাই সব কিছুই আমার আয়ত্তাধীন;—তাই বুঝিনা মানে যেন ও কবিতার কিছুই মানে নেই,—মন্ত্র জানিনা ব'লেই যে 'Sesame' এর দরজা খোলেনা, তাও বা আমি মান্‌ব কেন? না-মানা না-বোঝাটাই ত' সমালোচকের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব।

অবিশ্যি যে ভাষা জঞ্জালের জালে জলের মত প্রাঞ্জল হয়ে উঠ্‌তে পারেনি,—তার জন্য হয়ত একটা অভিধান হ'লেই চলে। কিন্তু ভাষার অপার স্বচ্ছতার অন্তরালেও যে ভাবের একটি সুদূর অনির্দ্দেশ্যতা থাক্‌তে পারে, তা প্রণিধান কর্‌তে অনেকখানি শিক্ষা ও অন্তর্দৃষ্টি থাকা দরকার।

মুদির দোকানে যে হিসাব কষে, সে কড়াক্রান্তি নিয়েই থাকুক্। কবিতায় তার যেন ভ্রান্তি না হয়। কল্পকেতন থেকে মেছো বাজারের বেশি প্রয়োজন আমাদের কাছে!

*　　　*　　　*

বলে—রচনা ভঙ্গী ত' নয়, মুদ্রাদোষ!

যেমন কুঁড়ির মুদ্রাদোষ ফুল হয়ে ফোটার, ইটের ফাটল ফুঁড়ে বটের চারার মুদ্রাদোষ বেরিয়ে আসার।

বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে দিয়ে অনেকদিনকার পুরাণো পথে প্রাচীন গরুর গাড়ী চ'ড়ে যারা চল্‌তে চায়, চলুক! যদি কেউ টিমিয়ে টিমিয়ে চলার পক্ষপাতী না হয়ে পায়ে হেঁটেই ঘুরে ঘুরে মাঠ পেরোতে চায়, যেতে দাও তাকে। পায়ে কাঁটা ফুঁড়বে, কাদা লাগ্‌বে—লাগুক্ একটু। খোলা মাঠের হাওয়াও সঙ্গে সঙ্গে লাগুক্ গায়ে।

*　　　*　　　*

যে হাবা ছেলে ষোল বছরেও কথামালা শেষ করতে পার্‌ল না, সেই বয়সেই

প্রতিবেশীর ছেলে ম্যাট্রিকুলেশান্ পাশ্ কর্‌ল দেখে তার চোখ একটু টাটাবে বৈ কি।

ছেলেবেলা নবধারাপাতের কড়াকয়াটা এড়িয়ে এসেছি বলেই আমার কাছে Astronomyটা একেবারে মিথ্যা? Chancer পড়িনি ব'লে মিথ্যা যেমন শেলি আর বায়রন্!

তা হলে ডিকেন্স থ্যাকারে বুঝ্‌তে হ'লেও ত চাই ফিল্ডিং রিচার্ডসন্—ষ্টার্ণ স্মলেট্—, আরো এগিয়ে গেলে,—Nashএর The Unfortunate Traveller পর্য্যন্ত।

Ars longa, vita brevis!

গোর্কি হাম্‌সুন বুঝ্‌তে দরকার হয় না ডিকেন্স থ্যাকারের,—যেমন ডিকেন্স্ থ্যাকারে বুঝ্‌তে দরকার হয় না Malorya Morte'd Arthur.

তুমি যে বয়সে জিভ্ ভারী ক'রে বি-এল্-এ 'ব্লে' বল্‌তে, সেই বয়সেই অনেকের ডিকেন্স থ্যাকারে হজম হয়ে গেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশটা ইংরেজশাসিত,—এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজিতে এম্-এ পর্য্যন্ত পড়া যায়, তাই না ডিকেন্স নিয়ে ডিগ্‌বাজি খেতে দিল্লি দৌড়ুনো!

কি হবে বোয়ার্ প'ড়ে। আগে পড়ে' নাও Bulwer Lytton, পরে হবে ও সব।

* * *

যাঁরা ভাবে প্রাচীন তাঁদের পারি শ্রদ্ধা কর্‌তে; ভালবাস্‌তে তাঁদের, যাঁরা তরুণ। আর যাদের না আছে গাম্ভীর্য্য, না আছে বা নিবিড়তা, যারা লটকে আছে এ দু'য়ের মধ্যে—আধমরা যারা,—রাতকানা,—তারা পাঁজি লিখুক সাহিত্য ছেড়ে।

* * *

বাংলা সাহিত্যের অভিভাবকদের অভিবাদন করি।

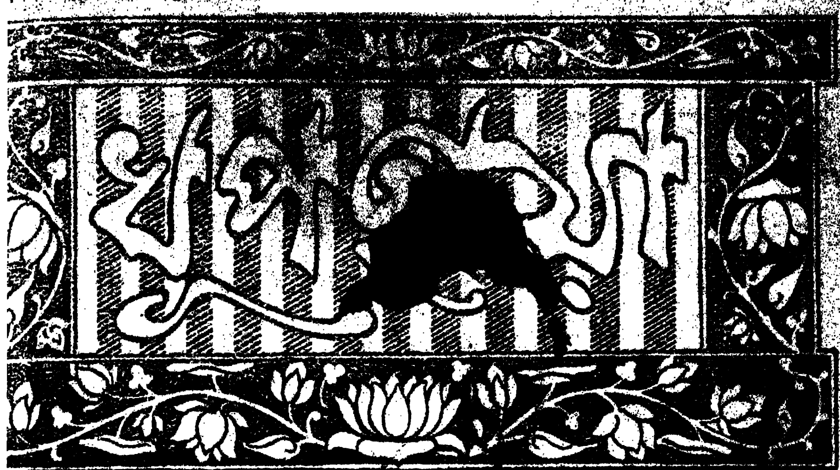
রমাকে গালাগালি না দিয়ে আমিনাবিবিকে নিয়ে তাঁরা শিক্ষানবীশী করুন।

সিংহের গলা ভেঙে যাওয়ায় যদি গর্জ্জন না বেরোয় তবে কুনোব্যাঙই আসুন এবার।

Printed by S. N. Bhattacharyya, at the Venus Printing Press, 66, Maniktolla Street, Calcutta.

Cover Printed at Bela Printing Works,
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।　　　　জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।



সম্পাদক—

প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।　　　　বার্ষিক মূল্য ২৲০ টাকা।

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সহ সম্পাদক—শ্রী[illegible]রেন ভট্টাচার্য্য।

২৭৭
৮.১২.২৮

কার্য্যালয়

৭৯।২৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বৈশাখের "ধূপছায়া" সম্বন্ধে

সংবাদপত্র দিগের অভিমত

Forward (20-4-27) লিখিয়াছেন,—

Dhupchhaya is a newly started vernacular monthly Magazine: From what has been seen of the first number that has just been published, the magazine bids fair to take its place among the best of our literary magazines. Some of the articles in the first number specially those from the pens of Sj. Abanindra Nath Tagore, Achintya Sen Gupta and Jyotsna Chanda reach a high standard of excellence. Some of the most promising writers of the younger generation are also writing for the magazine and it will have done a real service if it can tempt into the field of Bengali literatures the shy talent of young literatures amongst the student population of the country. The get up and printing are excellent.

আনন্দ বাজার (১২-১-৩৪) লিখিয়াছেন,—"......................

কাগজ ছাপা এবং লেখা সব বিষয়েই পত্রিকাটী সুন্দর। শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখা গল্প ও কবিতা খুব ভাল হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের অনেকগুলি তরুণ অথচ শ্রেষ্ট লেখক ধূপছায়ার জন্য লিখিয়াছেন। আমরা পত্রিকাখানির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।"

Dainik Basumaty (10-5-27) লিখিয়াছেন,—"..............

From what we have seen of the first issue of the magazine we think it will establish its position as a good literary magazine. The standard of the articles published is high. The Editor has given us a commendable assortment of contemporary prose and verse within a narrow compass. A special feature of the magazine is its entirely modern and fresh outlook and some of the writers represented in the issue are breaking new ground in Bengali literature.



(মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সাল

সম্পাদক

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য

ধূপছায়া কার্য্যালয়

৭৯।২৩ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বিষয় সূচী।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৪ সাল।



সাজাহান

—হুমায়ুন কবির।

কাছে আয়, আরো কাছে আয়,
শিয়রে বস্‌রে জাহানারা!
অই দেখ্ আকাশের গায়,
সন্ধ্যার মলিন ছায়
জ্বলিছে যে তারা!
ওরি পানে চেয়ে চেয়ে
আমার নয়ন বেয়ে
বহে অশ্রুধারা।
অতীতের স্মৃতিরাশি মনে আসি' হৃদয় করিছে মাতোয়ারা!
অই দেখ্ সন্ধ্যার আলোকে
ছবির মতন ভাসে অচঞ্চল আকাশের পটে
নীলজল মন্দস্রোত যমুনার তটে
মর্ম্মর-স্বপন মম তাজ!

বুক মোর ভেঙে যায় শোকে
শূন্য হিয়া
ওঠে গুমরিয়া
আজি তোরে স্মরি মমতাজ !
কাছে আয়, আরো কাছে আয় জাহানারা
হৃদয় বিকল মম, আজি মোর চিত্ত আত্মহারা !

একদিন ম্লান সন্ধ্যালোকে
হেথায় বসিয়া
ভাদ্রের যমুনাস্রোত কূলে কূলে ওঠে উচ্ছসিয়া
প্রদীপ উঠিছে জ্বলি ঝরোকে ঝরোকে—
সোহাগের হাসি হাসি' কয়েছিল মোরে মমতাজ,
"মহারাজ !
তোমার বিশাল রাজ্য, ঐশ্বর্য্য অতুল তব ভবে,
তোমার অন্তরে—
মোর লাগি কোথা স্থান হবে ?
দুদিনের পরে—
ভুলে যাবে মোরে—
যখন জীবন মম নিদাঘের পুষ্পের মতন
শুকায়ে পড়িবে ঝরি' কঠিন ভূতলে !"
শুনি অশ্রুজলে
চুমিয়া নয়ন
কয়েছিনু তারে,

"তুমি যদি মোরে ছাড়ি' কভু যাও চলি'
অশ্রুর পাথারে—
আমার সকল হিয়া উঠিবে উছলি !
সেই উচ্ছসিত মম হৃদয়ের অশ্রু পারাবার
ছাইবে তরঙ্গজালে সকল জীবন,
শূন্যতা করিবে হাহাকার,
সমস্ত ভুবন ভরি দিবানিশি বাজিবে ক্রন্দন !"

তারপরে একদিন
দয়াহীন
নিষ্ঠুর মরণ
আমার নয়নমণি করিল হরণ !
ভালবাসি যারে'
সাজাইনু মণিণরত্নহারে
বসাইনু হৃদয়ের প্রেম সিংহাসনে
অকস্মাৎ আমার জীবনে
দিবসের অবসানে মরীচিকা প্রায়
মিলাইল হায় !
তারপরে ধীরে ধীরে অশ্রুনীরে বর্ষ বর্ষ ধরি'
আপনার বেদনার খনি হতে মাণিক আহরি'
রচিলাম এ তাজমহল,
বেদনার সিন্ধুনীরে বিকশিল সৌন্দর্য্যের শ্বেত শতদল !
কত দিন কত সন্ধ্যা আসে,—
ক্লান্ত হিয়াখানি বহি, চলিয়াছি জীবনের পথে,

সন্ধ্যার আকাশে
অই যেথা ভাসে
আমার হৃদয় ছবি মলিন আলোতে,
ওরি পানে চেয়ে চেয়ে বেদনায় ওঠে গেয়ে
সকল পরাণ
নিত্য অশ্রুজল ঝরি' সিক্ত করে কঠিন পাষাণ !

আরো কাছে আয় জাহানারা।
হেরি তোর নয়নের তারা,
হেরি তোর মলিন বয়ান,
তোর জননীর কথা শুধু আজি পড়ে মোর মনে।
একসাথে এ ভুবনে চলেছি দুজনে।
জীবনের সুখদুখ যত
সহিয়াছি দোঁহে একসাথে
আঘাতে সংঘাতে
এর সাথে রয়েছি নিয়ত !

আজি আমি একা ধরাতলে।
জীবনের দিন মম আসিছে ফুরায়ে
অশ্রুজলে

স্মৃতির কানন হতে প্রতিদিন কুসুম কুড়ায়ে
করিয়াছি পূজা তার।
স্বপ্নবিভাসিত সাঁঝে রহিয়াছি চাহি তাই মেলি শ্রান্ত আঁখি।
অঙ্গে সুধা মাখি
কিরণে করিয়া স্নান
অনন্ত আকাশে তাজ করে মম প্রিয়ার সন্ধান।
রজত কিরণস্রোতে ভাসাইয়া শুভ্র দেহখানি
মুছে যায় বেদনার বাণী।
জাহানারা মুছে গেল, মুছে গেল আঁখি পট হতে
ভেসে গেল বন্যাস্রোতে অকূল আলোতে!

—:০:—

রাখে কেষ্ট মারে কে!

—শ্রীজগদীশ গুপ্ত।

যদি ডেঁপো না মনে করেন তবে একটা কথা বলি।

কথাটা এই—বেশী শাসন ভাল নয়।……বিদ্রোহ ত ঐ কারণেই ঘটে। স্মরণ করুন শিখ্‌দের কথা।—

শাসন অত্যাচারে দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য—

চল্‌তে চল্‌তে শাসন কখন্ সীমা ডিঙ্গিয়ে যায় সে নিজে তা টের পায় না এমন নয়, কিন্তু গোপন করে। তার মানে আছে।……

শাসন মনে করে, যথেষ্ট সতর্ক হয়ে কড়াকড়ি করা হচ্ছে না—

কোথায় দুষ্টবুদ্ধি যেন ওৎ পেতে' বসে' আছে—সেটাকে ঠিক্ ধরা-ছোঁয়া যাচ্ছে না।

ঐ ধর্‌তে না পারায় ক্লেশাত্মক মনোভাব আর অসোয়াস্তিই হিংস্র হ'য়ে দেখা দেয়।

আর, কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা থাকাই ভাল—কিন্তু প্রয়োগে বিচার শক্তি না ফুট্‌লেই কি না জুট্‌লেই সেটা গো-বস্থির বিষবড়ি হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের ফোর্থ মাষ্টার সারদার সম্পর্কে ঐ সব উচ্চস্তরের কথা আমি ভেবে দেখেছি।

অল্প বিস্তর অত্যাচারী সবাই, কেন না হ'য়ে পারে না।......ছোট ছোট ছেলেরা বেড়াল-ছানার ওপর অত্যাচার করে' থাকে।

আমার মনে হয়, আমরা বেড়াল-ছানা নই, আর সারদা ছেলেমানুষ নয়। কিন্তু তার অত্যাচারে বিষিয়ে আমরা কায়মনে জর্জ্জর হ'য়ে উঠেছি।......কি তার বেতের বেগ!......

দুষ্টবুদ্ধি আর দুর্দ্দশাতার অস্তিত্ব ছেলেদের ভেতর কোথাও আছে কি না, সে খবর রাখিনে; কিন্তু সারদা যেন তা টের পেয়েছে। ...... আশ্চর্য্য!—

"ন্যায়ের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত উষ্ট্রের নিকটে।" নির্গন্ধ জলের গন্ধ অশুদ্ধ হয়ে উটের নাকে গেছে......সারদা তাই জল্লাদের মত নিষ্ঠুর প্রাণে কচি অঙ্গে বেত মারে।—

ধিক্ তাকে।......

নেহাৎ অতিষ্ঠ হয়েই একদিন হেড্‌মাষ্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, দলবদ্ধ আর বিচারপ্রার্থী হ'য়ে।—সারদার বাড়াবাড়িকে অত্যাচার নাম দিয়ে তার নামে নালিশ কর্‌লাম।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মত মুখ অন্ধকার করে হেড্‌মাষ্টার আমাদের নালিশ শুনিলেন—এমন গম্ভীর আর অবহিত হ'য়ে শুন্‌লেন, যেন তিনি জেম্‌স দি ফাষ্ট আর আমরা তাঁকে দিয়ে ম্যাগনাকার্টা সই করা'তে এসেছি—

রাজা বুঝি প্রজার কবলে পড়ে!.........

যা' হোক্, তাঁর গাম্ভীর্য্য দেখে' মনে আশা হ'ল, নালিশের ফল ভালই হবে।

মনে মনে নাচ্ছি, সারদা এবার---কিন্তু হঠাৎ বড় তামাসাই তিনি ক'রে বস্লেন---উল্টে আমাদেরই ধমকে' দিলেন। কি আশ্চর্য্য! একদম্ অবাক্ হ'য়ে গেলাম।

অল্প বিস্তর অত্যাচারী সবাই---

এই অনিবার্য্য সত্যটি পরম অশ্রদ্ধার সঙ্গে উপেক্ষা করে হেড্মাষ্টার এমন অকারণ আর আশ্চর্য্য সব রুষ্ট কথা কি করে যে বল্লেন তা ভেবেই পেলাম না; মুখ একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেল। তাঁর তখনকার অসংখ্য আবোল তাবোল কথার মধ্যে কেবল "ডিসিপ্লিন্" কথাটা মনে আছে।

মনে মনে ডিসিপ্লিনের মুখাগ্নি কর্লাম—কিন্তু তা করলে হবে কি! অকথ্য অপ্রস্তুতে পড়ে' গেলাম।

মিষ্টান্নের ঝুড়ির মধ্যে আত্মগোপন করে শিবাজি পালালে ঔরংজেব যেমন হতাশ আর ক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন, বিচারের ফলে আমরা হ'লাম ততোধিক।

তাতে বাহ্যিক কোন ক্ষতি হ'ত না, কিন্তু ক্ষতির কারণ হ'ল এইটাই যে সারদার আরও সুবিধে হ'য়ে গেল।·· ···

আগে সারদা বেত আন্ত একখানা; মাম্লা ডিস্মিসের পর আন্তে লাগল দু'খানা করে'—দু'খানাই অমানিশায় বিদ্যুতের মত ভয়ঙ্কর।

বল্লে,—নরবলির প্রথা নেই কি না, তাই এই বেত; থাক্লে খাঁড়া আন্তাম।······বলে' একটু হেসে বেতজোড়া টেবিলের ওপর একবার চটাং করে' আছ্ড়ে' নিলে। তার হাসি দেখে' আমাদের গায়ে কাঁটা দিল—এম্নি তা' ধারাল আর ক্রূর।—

নরবলির প্রথা নেই তাই রক্ষে—

বেত শুধু মাংসের ভেতর কেটে বসে, খানিকটা মাংস চিটিয়ে তুলেও আনে, কিন্তু দেহ দু'খণ্ড করে না।

যা-ই হোক, সার্কাসের আফিং-খোর বাঘের মত সারদার পদদলন সহ্য করি—

কিন্তু গদা মাঝে মাঝে গর্জ্জন করে' ওঠে, আপনা আপনির মধ্যে; তাল ঠুকে, বাতাসে ঘুষি ছোড়ে; বলে,—দেখে' নিস্ একদিন। এই মুঠো, দেখেছিস্? এই মুঠো যার চোয়ালে পড়বে তার দাঁতের পাটি শিকড়শুদ্ধ বেরিয়ে আস্‌বে। —বলে আর লাফায়।......

শুনে' আমরা যেন চোখের সাম্‌নে দেখতে পাই, সারদার দাঁতের পাটি শিকড়শুদ্ধ বেরিয়ে এসেছে।—খুসীর সীমা থাকে না।......

মনে ভয়, কিন্তু বাহিরে এমন ভাব দেখাই যেন নিজামের পক্ষে ইংরেজের মত আমরা তার সাথেই আছি।

কিন্তু গদা তা বিশ্বেস করে না—

ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে,—তোরা কি মানুষ? তোরা ভ্যাড়ার দল।

শুনে' আমরা লজ্জা রাখবার ঠাঁই পাইনে—নিজেকে খুব অকিঞ্চিৎকর আর গোবেচারী মনে হয়।......

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে' গেল—

সামান্য একটু শব্দ করে' থুথু ফেলার তুচ্ছ অপরাধে সেই গদাই সারদার হাতে এমন বেত খেলে যেন তার দেহ রাবার দিয়ে মোড়া।—গায়ের রক্ত গড়িয়ে গদার জুতোয় ঢুক্‌লো।......

মার খেয়ে গদা টিপু সুল্‌তানের মত ক্ষেপে' গেল—

বল্‌লে,—যায় যাবে প্রাণ, শালাকে খুন ক'রবই।

যেন কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের নদী একেবারে চোখের সামনে নেমে এসেছে, আমরা এম্‌নি কেঁপে উঠলাম। চট্ করে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে গদার মুখ চেপে' ধরে' বল্‌লাম,—চুপ্, চুপ্।......কিন্তু বিদুরের হিতবাক্য দুর্য্যোধন কানে তোলেনি, গদাও আমাদের কথা কানে তুল্‌লে না—

যেন কা'কে না কা'কে বল্‌ছি—

উপরন্তু চোখ পাকিয়ে বল্‌লে,—প্রাণ যায় সে বি কবুল......

কোথায় যেন পড়েছি, কি কার মুখে শুনেছি,—মানুষের অখণ্ড মনের প্রবর্ত্তিকা শক্তি কখন ব্যর্থ হয় না ; অর্থাৎ মানুষ অপরকে দিয়ে যা' করা'তে চায় অক্লেশে তা' করা'তে পারে, যদি অকপট সাধনা তার করা থাকে।……কিন্তু গদাকে নিরস্ত ক'র্‌তে আমরা অখণ্ড মনের প্রবর্ত্তিকা শক্তি নিশ্চয়ই প্রয়োগ করিনি, আর পূর্ব্বেকার সাধনাও আমাদের ছিল না।……কাজেই আমাদের চেষ্টায় গদা থাম্‌ল না।—

তখন আমাদের স্বভাবতঃই মনে হ'ল, সিরাজদ্দৌলা যদি মীরণের হাতে একেবারে নিহত না হ'য়ে কিছু শিক্ষা পায় ত ভালই।—

পরামর্শসভায় গদা বল্‌লে,—কাপুরুষের মত লুকিয়ে অন্ধকারে মার্‌ব না, দিনমানে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মার্‌ব।

গণেশ বল্‌লে—তারপর ঠ্যালা সাম্‌লাতে পার্‌বে? মেরে গা চষে দেবে যে। নাম কেটে—

গদা বল্‌লে—তা' দিক্; দু'টোর কোনটাতেই শর্ম্মা পিছপাও নয়। তোম্‌রা আর একজন কে আমার সঙ্গে যাবে বলো।—বলে' গদা বড় আশা করেই আমাদের মুখের পানে চাইলে।

কিন্তু প্রাণ তখন আমাদের প্রাণপনে পিছিয়ে পড়েছে—

এক নিমিষেই মনের উপর দিয়ে ভেসে' গেছে ভবিষ্যতের একটা ছায়াচিত্র ……বাপ, মা, খুড়োমশাই, মার, রাস্‌টিকেস্‌ন……এরা সব দলবদ্ধ হয়ে একটা বিভীষিকা দেখিয়ে গেছে।

আমাদের মুখের নিরুদ্যম অনৌজ্জ্বল্য দেখে' গদা ভেতরের বার্ত্তা টের পেলে; পরম দুঃখিত ভাবে বল্‌লে,—যারা বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে চেয়েছিল তোরা সেই ইঁদুরের এক পাল। তোমাদের কাউকে আমার দরকার নেই। যদি বেটাছেলে হই তবে একাই পারবো। তোরা কেউ বেটাছেলে ন'স্।

পুরুষত্বে ধিক্কার দিতেই লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হ'য়ে গেল—

ঐ পর্য্যন্তই।—

কিন্তু সমাপন মহিমান্বিত ক'রতে সকলের পেছন থেকে হাত তুল্‌লে, বৃন্দাবন!—মুখচোরা বৃন্দাবন!……এম্‌নি অচিন্ত্যনীয় সে ব্যাপার যে, আমরা

বিস্ময়ে লজ্জা ভুলে' গেলাম। মনে পড়ে' গেল মহাকবি সেক্সপীয়ারের সেই অমূল্য কথাটী—

There are more things in your dreams, Horatio, than your Philosophy.

ঠিক্ মনে নেই—তবে বোধ হয় কথাটা ঐ।

বৃন্দাবন সারদার বেত খেয়ে কাঁদে না, খালি হাত বুলোয়; আমাদের চাঁটি খেয়ে রাগে না, খালি ঠোঁট চাটে; তার চোখ দেখে মনে হয়, সদ্য ঘুম থেকে উঠে এল; চিঁ চিঁর ওপর চেঁচাতে সে জানে না; অথচ—

বাস্তবিক, দর্শনশাস্ত্র আর স্বপ্নতন্ত্র—দু'টি একত্র হ'য়েও এমন আশ্চর্য্য বিষয়ের আবিষ্কার কর্‌তে পারেনি যা' এর সঙ্গে তুলনীয়।

বৃন্দাবন মার্‌তে উঠেছে!!!

চিঁ চিঁ করে' বৃন্দাবন বল্‌লে,—আমি সঙ্গে যাব; কিন্তু, ভাই, ছদ্মবেশে।

গদা যেন মিইয়ে ছিল, এবার বৃন্দাবনের রসায়নে চমৎকার তাজা হ'য়ে উঠ্‌ল; এত খুসী হতে তাকে আগে কখনো দেখেছি কি না মনে পড়ে না।……বোধ হয় ক্লাইভ মীরজাফরকে পেয়ে এত খুসী হয়নি।………গদা এগিয়ে এসে বৃন্দাবনের হাত ধরে' ঝাঁকা দিয়ে বল্‌লে,—সাবাস্ ভাই; এরি নাম বেটাছেলে, মরদকি বাত।……এখন ছদ্মবেশ কি হবে ঠিক্ করে' ফেল।

বুদ্ধি জুগিয়ে দিতে আমার তুল্য আর নেই—

বল্‌লাম,—পরচুলো আর রং।

কিন্তু ভেতরের কথা এই যে, ফি বার পূজোর সময় গাঁয়ের থিয়েটারে পরচুলো পরে' আর রং মেখে আমায় ষ্টেজে নাম্‌তে হ'ত—কোনোবার শ্রীলেখা, কোনোবার সহদেব সেজে—তাই পরচুলো আর রঙের কথাটী অমন চট্ করেই বল্‌তে পার্‌লাম।—

পঞ্চানন দূরদর্শী লোক; বল্‌লে—ধস্তাধস্তিতে পরচুলো খসে' গেলেই আর রং মুছে গেলেই—

বৃন্দাবন বল্‌লে,—রং পাকা হওয়া চাই; পরচুলো না হলেও চলবে।

কেষ্ট বল্‌লে,—আমায় যদি না ধরিয়ে দাও, ভাই, তা' হ'লে আমি তোমাদের সাজিয়ে দিতে পারি। চিত্রবিদ্যা কিছু কিছু আমার জানা আছে।

কথা দিলাম যে, তাকে ধরিয়ে দেব না—

আর, অদৃষ্ট যদি সুপ্রসন্ন থাকে তবে ধরা পড়লেও রঙের কথাটা হয়তো উঠবেই না।.........

কেষ্ট বল্‌লে,—আমি তখন বল্‌বো রং আমি মাখিয়ে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু কেন যে ওরা রং মেখেছিল তা' আমি জানিনে। তখন কি করবে আমার ?

বলে' কেষ্ট আত্মপক্ষ নিরাপদ রেখে' রং মাখাতে রাজি হ'ল।—

ঠিক্ হ'য়ে রইল, রবিবারে বৈকালে যখন সারদা রোজকার মত "কৃষ্ণকুমার এ্যাভিনিউয়ে" মেঠো হাওয়া খেয়ে বেড়াবে, তখন গাছের ওপর থেকে আচম্‌কা তার গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে'—

তারপর যা হয় হবে।

রবিবারে বিকালের দিকে ঘরের দরজা জান্‌লা সাবধানে বন্ধছন্দ করে' কেষ্ট, গদা আর বৃন্দাবনের মুখ রং করে' ছেড়ে দিলে।—

ডিজাইনটি আমার—

মুখমণ্ডলের সবটা ঘোর কালো, কপালের ওপর শুধু সাদা একটা চন্দ্রবিন্দু আঁকা।.........

ঐ সাদা প্রান্ত থাকার দরুণ চারিদিক্‌কার কালোটা আরো বীভৎস ঘোরালো দেখাতে লাগল—

মনে হ'ল, চন্দ্রবিন্দু যেন দু'জনের ললাটে আরোহণ করে' "আল্লা হো আকবর" বলে বিজাতীয় চীৎকার করছে, প্রাণে বিন্দুমাত্র ভয় নেই।.........

কেষ্টর শিল্পপ্রচেষ্টা সবাইকে সন্তুষ্ট করে' সার্থক হ'ল।

গদা বল্‌লে,—কিন্তু বড় চট্‌চট্‌ করছে।

শিল্পী বল্‌লে,—তা' করুক্। শুকিয়ে গেলেই চট্‌চটে ভাবটা যাবে।

চার্‌টে বেজে বিশ মিনিটের সময় দু'জনে মুখচোখ ঢেকে চুপচাপ বেরিয়ে গেল—

কাকে বকে টের পেলে না।

আমি বার বার ক'রে বলে' দিলাম,—খবর্দ্দার, সে যেন আগে আক্রমণ কর্‌বার সুযোগ না পায়; আর, আত্মরক্ষার পথ দেখে' রেখে' আক্রমণ ক'রো।............

বলে দিলাম বটে বীরের মতন, কিন্তু তারা চলে' যেতেই বীরহৃদয় কণ্ঠে উঠে কাঁপতে লাগলো।.........যুদ্ধে যারা যায় তাদের চাইতে ঘরে যারা থাকে তারাই সহ্য করে বেশী এটা প্রমাণিত সত্য।............

* * * * *

ঘণ্টা দেড়েক পরেই বোর্ডিং-এ হেডমাষ্টারের রুমে একটা গোল—

আর তাই শুনে দুর্জ্জয় ভয়ে আমাদের হাঁটু হি হি করে কেঁপে উঠল।...... অনেক বিবেচনার পর, ভালমানুষের মত, একেবারে কিছুই জানিনে, কেবল গোল্‌টা কিসের তাই অমনি দেখতে যাচ্ছি............এম্‌নি সরল মনে একে একে এগিয়ে দেখতে গেলাম, ব্যাপারটা কি!............

গিয়ে দাঁড়ালাম্‌—

ঢোক্ গিল্‌তে গিল্‌তে দেখলাম, যা' ভেবেছি তাই—গোলের কারণ সারদা।.........সারদা শুধু পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, গায়ের সার্টটি যেন ক্ষ্যাপা কুকুরে চিবিয়েছে এম্‌নি তার ছিন্নদশা।.........হেডমাষ্টার সারদার পিঠের দিক্‌কার সার্টের কাপড় দু'হাতে উঁচু করে তুলে ধ'রে আছেন এবং তিনি, আর থার্ড মাষ্টার তারাকুমার বাবু, ফিফ্‌থ মাষ্টার রমানাথ বাবু এবং "সুপারি" সীতাকান্ত বাবু তার পিঠ, ভুরু কুঁচিয়ে নিরীক্ষণ কর্‌ছেন।.........

সারদার পিঠ ছিল ওদিকে—

অবস্থাটি স্বচক্ষে দেখতে পেলাম না; কিন্তু যাঁরা স্বচক্ষে দেখছিলেন, তাঁদের মুখ দেখে আর মুখ চাওয়া চাওয়ি দেখে যা' অনুমান হ'ল তা প্রায় প্রত্যক্ষদর্শনের কাছাকাছি............

খুব শোচনীয় না হ'লে সাধারণ পিঠ দেখে মানুষ মুখচোখের অমন ভঙ্গী করে না।............

সারদার পিঠের ওপর জামাটি আল্‌গোছে নামিয়ে দিয়ে হেডমাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন,—তারা ক'জন ছিল ?

সারদা পাঁচটি আঙ্গুল তুলে' বল্‌লে,—পাঁচ জন।

শুনে', আমি কেষ্টর মুখের দিকে চাইলাম, কেষ্ট অবিনাশের মুখের দিকে চাইলে, অবিনাশ দিলে ঠোঁট উল্‌টে।............

হেডমাষ্টার বল্‌লেন,—তারপর ?

সারদা বল্‌লে,—আমি ঐ ছড়িখানা হাতে ক'রে আপন মনে বেড়াচ্ছি—

চেয়ে দেখলাম, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা একখানা বেতের ছড়ি দেয়ালে ঠেস্ দে'য়া রয়েছে।

সারদা সেইদিকে একবার চেয়েই বল্‌তে লাগল,—বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম, পাঁচটা ফিরিঙ্গী ছোঁড়া হাস্‌তে হাস্‌তে ন্যাক্‌রাপানা কর্‌তে কর্‌তে আমার সাম্‌নের দিক্ থেকে আস্‌ছে............

যেন দুনিয়াটা একমাত্র তাদেরই—এমনি হতচ্ছাড়াদের চলার ধরণ। তাই দেখেই চন্ করে আমার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে উঠ্‌ল।............আমি সব সইতে পারি কেবল মানুষের দেমাক্ সইতে পারিনে।............আমি রাস্তার মাঝখানটী দিয়ে চলেইছি, পাশকাটানো ধাত আমার নয়। তারা দু'ভাগ হ'য়ে আমায় পথ দিলে: কিন্তু যাই তারা আমার পেছনে পড়েছে, অমনি তাদের একজন, মোটা গোপসাথানা—নাহাতক্, বদমায়েশের দল কিনা—আমার পিঠে মেরে দিয়েছে ছড়ির এক খোঁচা।............তখন আর কে কার কড়ি ধারে—সাঁ করে' ঘুরে' দাঁড়িয়ে মেরে দিলাম সেই বেটাচ্ছেলের ঠিক্ এইখান্‌টায় প্রাণপণ এক ঘা............

এইখানে সারদা বাঁ হাত দিয়ে কাঁধ আর ডান হাত চালিয়ে প্রাণপণ ঘা মারবার রকমটা দেখিয়ে দিলে।·········বল্‌লে,—তারপরই রীতিমত যুদ্ধ বেধে গেল।············

রমানাথ বাবু লিক্‌লিকে দুর্ব্বল মানুষ, শুধু হাঁটুতেই তাঁর পা কাঁপে, কথায় কথায় হোঁচট্ খান।·········তিনি হাঁ করে সারদার সর্ব্বাঙ্গীণ বীরত্বের দিকে চেয়ে ছিলেন; সারদা থাম্‌তেই তিনি বল্‌লেন,—পাঁচজনের সঙ্গে আপনি একা লড়লেন?

—লড়লুম বৈকি; তার পাঁচ না হ'য়ে পঞ্চাশ হলেও লড়তুম্।······আমি একা বটে, কিন্তু তাদের মনে হচ্ছিল, বুঝেছেন রমানাথ বাবু, তাদের মনে হচ্ছিল, একশো লোক দুশো হাতে মুগুর চালাচ্ছে।—বলে' সারদা দুটো হাত আকাশে বরাবর চালিয়ে দিলে।

শুনে, আমাদের মনে হ'লো, অভিমন্যু ব্যূহ প্রবেশের কৌশল মাতৃগর্ভেই শিখেছিলেন কিন্তু নির্গমের কৌশল শিখেননি; সারদা তাঁর ওপরে টেক্কা মেরে দুটোই শিখে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

"সুপারি" সীতাকান্তবাবু বল্‌লেন,—আমি ভাবছি, আমি হ'লে কি কর্‌তুম!

সারদা বল্‌লে,—ফিরিঙ্গীর ছড়ির খোঁজ পকেটস্থ করে' পালাতেন নিশ্চয়ই, আর কিছু করুন আর নাই করুন।······নেটিবের গায়ে তারা আর হাত দেবে না; এখন আপনারা নির্ভয়ে বেড়াতে পারেন।

হেডমাষ্টার বল্‌লেন,—পিঠে এখন মলম্ লাগান' উচিত।

সারদা সে-কথাটা তেমন গ্রাহ্য কর্‌লে না; কর্‌লে বোধ হয় বীরত্ব ক্ষুণ্ণ হ'ত।

রমানাথবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সারদা সেই পাঁচজনের প্রত্যেকের চেহারারও একটা করে' বর্ণনা দিলে। শেষে বল্‌লে—কিন্তু যাবার সময় হ্যাণ্ডসেক্ করে' গেল।······জাতটার ঐ গুণটা আছে।

তারপর শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চা আর স্বাস্থ্যানুশীলনের প্রসঙ্গ তুলে' হেডমাষ্টার এক সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন; এবং আজকালকার ছেলেদের দৈহিক অবনতি প্রভৃতির উল্লেখ করে' তাদের অনেক নিন্দাবাদ আর আক্ষেপ কর্‌লেন।...

শুনে' সারদা বল্‌লে,—আমারও মত তাই। লাঠি চালানোটা ওস্তাদের কাছে শিখেছিলুম। কাপুরুষের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।···বলে' সে চারিদিক্ চেয়ে এমনভাব ধারণ কর্‌লে যেন মৃত্যুকে সে যে আজ জয় করে এসেছে এটা মানতেই হবে।

সারদা অমর হ'য়ে থাক্, আপত্তি নেই কিন্তু আপাততঃ আমাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না এই জন্যে যে, মার্‌তে গেল গদা আর বৃন্দাবন, কিন্তু মারামারি হ'ল ফিরিঙ্গীর সঙ্গে।······এ রূপান্তর ঘট্‌ল' কি করে!

তবে কি গদা আর বৃন্দাবনের কাজ ফিরিঙ্গীরাই শেষ করে দিয়েছে?······ প্রশ্নটি চিন্তাগ্রস্ত করে' তুলেছে এমন সময় কেষ্ট আমায় আড়ালে টেনে' নিয়ে বল্‌লে—শুন্‌লি ত' সারদার কথাগুলো?

—শুন্‌লম ত', কিন্তু ফিরিঙ্গী—

—সব সারদার মিছে কথা। ব্যাটা যে মিথ্যেবাদী আজ তা' টের পেলাম। ভূত সেজে' ছুটো নেটিভে পিটিয়েছে সে কথা কি বলা যায়! তাই এই ফিরিঙ্গীর আম্‌দানী······পিঠের ঘা ঢাকৃতে'।······কেমন অক্লেশে বীর বনে' গেল।

কেষ্টর কথাটা বাস্তবিক বলেই মনে হ'ল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)



সূর্য্যোদয়

শ্রীরুদ্রেন্দ্র কুমার পাল।

স্থান—টাইগার হিল।

তারিখ—১২ই মে।

বেলা—পূর্ব্বাহ্ণ—৫টা ২ মিনিট।

দ্রষ্টা—
ডি, মিত্র, ঢাকা
কে, ব্যানার্জ্জি
পি, ভট্টাচার্য্য
টি, তালুকদার } কুচ্‌বিহার।
আবুল হায়াত, হলদিবাড়ী।
আর, পাল, কলিকাতা।

(ডায়েরী হইতে)

ভোরবেলা চা খাওয়ার সময় যখন বলেছিলুম—আজ টাইগার হিল যাবো, তখন স্যানিটোরিয়ামের বন্ধু কটি খুবই উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন—তাঁরাও যাবেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখি সেই সকাল বেলাকার ঠিক কথাটা বেঠিক হবার যোগাড় হচ্চে। আমাদেরই কামরায় বসে আলোচনা হচ্চে, সে মাসের পয়লা থেকে স্যানিটোরিয়াম্ হতে টাইগার হিলে সূর্য্যোদয় দেখতে আর যে কটি দল গেছেন,—কারো ভাগ্যে তা' দেখা হয়নি। দু একজন খাড়া পাহাড়ের উপর উঠতে না পেরেই ফিরে এসেছেন; আবার যাঁরা উপরে গেছেন, তাঁরাও হয় বৃষ্টির জন্য, না হয় খুব কুয়াসা ও মেঘের জন্য ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এসেছেন। তার উপর, পথও বিপদ সঙ্কুল; বাঘ ভালুকের ভয় ত আছেই, আর যেতেও হবে নিস্তব্ধ নিশীথ রাতে। ইতিমধ্যেই দুঃসাহসী যুবক-

দলের শুভকামী দু একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং ভীতু প্রকৃতির আমাদেরই মত যুবক দু একজনও নাকি কিছুক্ষণ আগে নানা ভয় দেখিয়ে আমাদের এই প্রচেষ্টার মূলে ঠাণ্ডা জল ঢাল্‌তে ত্রুটি করেন নি। আমি ফিরে আস্‌তেই বন্ধুদের কেউ বল্লেন 'যাওয়া হবেনা'; কেউ বল্লেন 'দেখা যাক্ কি হয়'; কেউ বা বল্লেন 'যাব কি না ভাবছি'। শুনে মনে ভারী রাগ হ'ল, কিন্তু মুখে তা' প্রকাশ না করে বল্লুম —'বেশ আপনারা দেখুন, আমাদের হেঁটেই যাবার কথা, পথ ঘাট জানি না, আপনারা না যান্, ত একাই ঘোড়ায় যাবো'। বন্ধুরা আমার পানে একটা অবিশ্বাস ও বিস্ময়মিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্লেন—কিন্তু কেউ কিছু বল্লেন না।

রাত্রিতে বিছানায় শুতে একটু দেরীই হয়েছিল, কিন্তু শোবার বেলা হাতঘড়িটা হাতের পাশে রাখতে ভুল হয়নি। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্‌লে ঘড়িটা হাতে নিয়ে দেখি দুটা বাজতে চার মিনিট বাকী। নাঃ—আর ত দেরী করা চলে না, তাই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম। ইচ্ছা ছিল সঙ্গীদের আর জাগাবোই না—কিন্তু বাতির সুইচ্ ঠেলার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনের ঘুম ভেঙে গেল। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে একজন জিজ্ঞেস্ কল্লেন 'আপনি সত্যিই যাবেন'? সুয়েটারটা গায়ে পর্‌তে পর্‌তে আমি বল্লুম্ 'আশা করি'। আমি চুপ করে কাপড় পরছি, তখন তাঁরাও একে একে উঠে কাপড় পর্‌তে লাগলেন। ব্যাপার দেখে আমি পাসের কামরা হতে আর আর বন্ধুদের ডেকে নিয়ে এলুম। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই টাইগার হিল Expedition-এর বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল। আমরা ছ'জন জামা কাপড়ে যতদূর সম্ভব শীতক্লিষ্ট দেহকে জড়িয়ে নিয়ে বীরদর্পে পথে বাহির হয়ে পড়লুম। সন্ধ্যার সময়ই বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছিল, তাই আকাশখানা খুবই পরিষ্কার ছিল। ওদিকে চেয়ে দেখলুম, Mount Everest Hotel-এর মাথার উপর কালাপাহাড়ের গায়ে কতকগুলি পাইন গাছের আড়াল হতে চাঁদ স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাহাসি ছড়িয়ে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছেন। তিথিটা কি ঠিক মনে ছিল না, পূর্ণিমার পর চতুর্থী বা পঞ্চমী হবে।

আমাদের গন্তব্যস্থান দার্জ্জিলিং হতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রায় আট মাইল দূরে। ঘুম ষ্টেশন প্রায় পাঁচ মাইল; সেখান হতেও মাইল তিনেক পথ যেতে হয়। আমরা তাই দার্জ্জিলিং হিমালয়ান্ রেলওয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে ঘুম ষ্টেশনের পথে চলেছিলুম। নীরব নিশীথ রাত্রি; পথে জনমানবের সাড়া নেই, শুধু মাঝে মাঝে দু একটা কুকুরের ডাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। ওয়েষ্ট পয়েণ্ট

(West Point)এর পাশ দিয়ে যাবার বেলা একবার শুধু একজন প্রহরীপুঙ্গব ঘুমের ঘোরে মাথা তুলে, আমাদের পানে চেয়ে আবার নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়লেন। আমরা ঘুমলুপ (Ghumloop) রেল লাইন ধরে না গিয়ে সোজাসুজি পাহাড়ের উপর দিয়ে পার হয়ে গেলুম, তাতে আমাদের প্রায় পোনর মিনিট লাভ হ'ল। ৩টা ২০মিনিটের সময় আমরা ঘুম ষ্টেশন ছাড়িয়ে গেলুম। এখানেই একটা ভালুকের শব্দ শুনে আমাদের মধ্যে নানারকমের জল্পনা কল্পনা চল্‌ছিল। কে কে বন্ধুদের টাইগার হিলের পথে ভালুকের ভয় দেখিয়ে তাদের নিবৃত্ত কর্ত্তে চেয়েছিলেন সেই ভয়ই তাদের মনে বদ্ধমূল হতে চলেছে দেখে আমি বল্লুম 'এ পোষা ভালুক, তা না হলে আমরা ত এখনো পাহাড়ের উপর উঠিনি, এই বাড়ীঘরের ভিতরে বুনো ভালুক আস্‌বে কোত্থেকে ?' তাঁরা বোধ হয় একটু আশ্বস্ত হলেন, কারণ ভালুকের প্রসঙ্গ ওখানেই চাপা পড়ে গেল।

ঘুম ষ্টেশন হতে প্রায় আধ মাইল গিয়ে জোড়বাংলা পার হয়ে আমরা সিংচাল রোডে পৌছলুম। এখান থেকেই রীতিমত পাহাড়ের উপর উঠ্‌তে হয়। রাস্তার নাম সিংচাল রোড হলেও সিংচাল লেক (Singchel Lake)এ যাবার এ রাস্তা নয়, সে রাস্তা নীচে দিয়ে গেছে; এ রাস্তা বরাবর টাইগার হিলের উপর উঠে গেছে :—আমরা পাহাড়ের উপর অপরিসর খাড়া উঁচু রাস্তা দিয়ে চলেছি। দুপাশে ঘন তরুলতাসমাচ্ছন্ন জঙ্গল। তার মাঝে নানারকমের পাইন গাছই উল্লেখযোগ্য; তাদের উঁচু উঁচু মাথাগুলি দূর হতে ঠিক কালোকালো গম্বুজের মত দেখায়। প্রায় সব গাছের উপরেই নানারকমের অর্কিড্ শিকড় গজিয়ে বসে আছে। এগুলির মাঝে কোথাও দু চারিটি ফুল ধরেছে, কোথাও বা অম্নি লতাগুলি বাতাসে দুলছে। জ্যোৎস্নার আলোতে চেয়ে দেখলুম পাইন গাছ-গুলির মাথা একে অন্যের সঙ্গে জড়াজড়ি করে পথের দুধারে ভারি সুন্দর তাঁবুর মত তৈরী করেছে; গাছের ছোট বড় গুঁড়িগুলি যেন খুঁটি হয়ে তাঁবুকে উচুঁতে তুলে ধরেছে, আর শুক্‌নো ঝরা পাতাগুলি নীচে, কতদিন হ'তে ঝর্‌তে ঝর্‌তে যে একটা প্রকাণ্ড নরম গালিচার সৃষ্টি করেছে, তা' কে বল্‌তে পারে! দেখে মনে হ'ল, শেয়াল ভালুক আর বেশী কি, এর ভিতর বড় বড় বাঘ সিংহও অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। মনে যে একটু ভয় না হল তা নয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তেমন কোন জন্তুর দর্শনলাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটে নি। রাস্তার দুপাশে পাইন গাছের পরই উল্লেখযোগ্য ও দেখবার মত নানারকমের ছোট বড়

ফার্ণ। কোনগুলি হাত তিন চার উঁচু, আবার কতগুলি আঙুল পরিমিতও আছে। কোথাও কোথাও ছোট সরু লাঠির মত—বাঁশের ঝাড়—তাদের সরু আগাগুলি বাতাসে পত্ পত্ শব্দে নড়্ছে। কিন্তু এগুলি দাঁড়িয়ে দেখবার মত সময় আমাদের ছিল না; ঘড়িতে চেয়ে দেখি প্রায় চারটে বাজছে। যেমন করেই হউক আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের উপরে পৌছাতে হবে, তা' না হলে আমাদের সকল শ্রমই পণ্ড হবে, তাই আমরা ছুটে চলেছিলুম।

আমি সব সময়ই আগে আগে চলেছিলুম, কারণ পাহাড়ে চড়া আমার অনেক দিনের অভ্যাস আছে। শিলং Peaks, নর্থ ইষ্টার্ণ ফ্রাণ্টিয়ার্ এ Elephant Saddle, Tidding Saddle প্রভৃতিতে আমি অনেকবার উঠেছি। কিন্তু আমার সঙ্গীরা, যতই পাহাড়ের উপর উঠতে হচ্চে, ততই পেছন হতে আমাকে ডাকছে। তাদের ধীরে ধীরে উঠতে বলে, আমি পাহাড়ী লোকের মত ধাপে ধাপে পা ফেলে উপরে উঠছিলুম। এম্নি সময় হঠাৎ কোথেকে ক' টুকরো কালো মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে ফেল্লে। সেই মুহূর্ত্তে আমাদের মনের যা' অবস্থা হ'ল সে আর কী বোলব? আমাদের এত কষ্ট এত উদ্যম সব বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়! কয় মিনিট শুদ্ধ নির্ব্বাকভাবে দাঁড়িয়ে আমরা আবার চল্লুম, কিন্তু ভাগ্যি খুবই ভাল, ইউরোপিয়ানদের গল্‌ফ ফিল্ডের পাশ দিয়ে যাবার বেলা আবার মেঘ কেটে গেল—আমাদের মনে লুপ্তপ্রায় আশা আবার ফিরে এল, বুঝিবা সফল কাম হলেও হতে পারি। এখন যেখানে গল্‌ফ ফিল্ড আছে, আগে সেখানেই সিপাহীদের প্রথম ব্যারাক ছিল; তারই ভগ্নাবশেষ স্তম্ভগুলি দূর থেকে দেখা যায়। দূর হতে আমরা ও গুলি কি, প্রথম ঠিক কর্ত্তে পারিনি, কিন্তু পাশে এসে তাদের স্বরূপ বুঝতে দেরী হয় নি।

আমরা যতই উঠছিলুম ততই শীত বাড়্ছিল। এতখানি হেঁটে আসার পরিশ্রম সত্ত্বেও হাত পা শীতে আড়ষ্ট হয়ে যাবার মতন হচ্চিল। সিংচাল রোডের আড়াই মাইল রাস্তা ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে, কিন্তু টাইগার হিলের শেষ আধ-মাইল রাস্তাটুকু একেবারা খাড়া পাহাড়ের উপর উঠে গ্যাছে—আমি সকলের আগে আগেই চলেছিলুম, কিন্তু এটুকু উঠ্তে আমারো গতি অনেকটা মন্দীভূত হয়ে গেছিল। আমরা একটু উপরে উঠি, আর দাঁড়াই, তারপর ক' পা এগিয়েই আবার হাঁটুতে খিল ধরে যায়, আবার দাঁড়াতে হয়। কতখানি উঠেই মনে হয় না জানি কতটকু উঠেছি, আর কত বাকী! সাড়ে সাত

মাইল রাস্তা আসতে যতটুকু কষ্ট হয়েছিল, এ আধমাইল রাস্তা উঠতে গিয়ে কষ্ট হ'ল তার চেয়ে অনেক বেশী। সেই কন্‌কনে হাড়ভাঙ্গা শীতের মধ্যেও আমাদের গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল; আর নিস্তব্ধ নীরব রাত্রিতে আমাদের ছ'টি প্রাণীর মুহুর্ম্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসে মিশিয়ে যাচ্ছিল। আমরা দুজন হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে উঠছি, পেছন হতে চারজন ডেকে বল্লে 'একটু দাঁড়ান, আর যে পারি নে'। এক মুহূর্ত্ত পিছনে ফিরে দাঁড়ালুম;—পরমুহূর্ত্তে পূবের দিকে চেয়ে দেখি, পূবের আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখুনি হয়ত প্রভাতের অরুণ লালিমায় ভরে উঠ্‌বে। না, আর দাঁড়ানো যায় না, তাই চেঁচিয়ে বল্লুম "না আর দাঁড়াবার সময় নেই—বিশ্রাম কর্ব্বো আমরা উপরে উঠে, তার আগে নয়; ঐ ভোর হ'ল বলে।" শরীরে ও মনে যতটুকু শক্তি সঞ্চয় সম্ভব—তাই করে মিত্র আর আমি দুজনে এসে উপরে পৌছলুম। যাক্ বাঁচা গেল, আমরা ততক্ষণে ছুটে গিয়ে টাইগার হিলের মঞ্চের (Pavillion) উপরে দাঁড়িয়ে দুজনে সেকহ্যাণ্ড কর্‌লুম। ক' মিনিট পরেই ওরাও এসে পৌছালো। আমাদের মনে তখন যা' আনন্দ হচ্ছিল, তা' ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পূবের দিকে চেয়ে দেখলুম—সাদার উপর লালের একটা রেখা পড়েছে; উত্তরের দিকে চেয়ে দেখলুম কাঞ্চনজঙ্ঘা ধীরে ধীরে বায়স্কোপের ছবির মত চোখের সুমুখে ভেসে উঠ্‌ছে; আর পশ্চিমে—আমাদের গভীর নিশীথের বন্ধু,—চাঁদের রশ্মি তখন উষার প্রথম আলোকচ্ছটায় ম্লান হয়ে গেছে। যাক্, আমরা ত ব্যর্থকাম হইনি। জানি না, আমেরিকা আবিষ্কার করে কলাম্বাসের কতটুকু আনন্দ হয়েছিল; কিন্তু আমাদের এই সাফল্যের পূর্ব্বক্ষণের আনন্দ যে তার চেয়ে কোন অংশে কম নয় তা' জোর গলায় বলতে পারি।

টাইগার হিল দার্জ্জিলিং হতে প্রায় দেড়হাজার ফিট উঁচু (৮৫১৫ ফিট)। উপরে একটা Pavillion ও Tower আছে। তারি নীচে দর্শকদের জন্য ছোট্ট একখানি ঘর আছে। পাশেই ঘোড়ার বিশ্রামের জন্য লম্বা একখানি টিনের ঘর। নানা দেশদেশান্তর হতে শুধু সূর্য্যোদয় দেখবার জন্যই এখানে কত লোক আসে। যাদের ভাগ্য ভাল, তারা সফলকাম হয়, কিন্তু শতকরা নব্বুই জনকেই ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়। মঞ্চটি অষ্টকোন্‌বিশিষ্ট,—চারিদিক রেলিং দিয়ে ঘেরা, তাতে দর্শকদের জন্য বসবার বেঞ্চ আছে। আমরা যখন গিয়ে তা'র উপর দাঁড়ালুম, কন্‌কনে হাওয়া এসে সূচের মত আমাদের শরীরে বিঁধতে

আরম্ভ কর্লে। পায়ে মোজার উপর মোজা, হাতে গরম দস্তানা, গায়ে ওভার-কোট তবু মনে হতে লাগ্‌লো, হাতপাগুলি যেন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শীতে বুঝি বা সারা দেহের রক্তই জমাট হয়ে যাবে। * দু-তিনজনের গায়ে র‍্যাপার ছিল—কোটের উপর তাই জড়িয়ে কোন রকমে শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা বসে রইলুম বেঞ্চির উপর। এম্নি সময় একজন সাহেব ও মেম আর সঙ্গে চাকর এসে পৌঁছলেন Pavillionএর উপর। শীতে আমাদের মত তাদের অবস্থাও যে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল—তা' তাদের দাঁতে দাঁতে ঘসার শব্দ থেকেই বেশ বুঝা যাচ্ছিল।

এতক্ষণ পূবের আকাশে সাদা সাদা মেঘগুলি পাহাড়ের উপর—সমুদ্রগর্ভে ঢেউএর মত দেখাচ্ছিল। উচু কালো কালো পাহাড়গুলির গায়ে লেগে প্রতিহত হয়ে তা'রা এদিক ওদিক ছুটাছুটি কচ্ছিল। দেখতে দেখতে চোখের সামনে কে যেন একটা লাল লাইন এঁকে দিয়ে গেল! পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই সেই লালিমা সমস্ত পূবের আকাশটাকে ছেয়ে ফেল্লে। এবার তার উপর কে যেন এক পোঁছ সোনালি রংএর আভা ছড়িয়ে দিয়ে গেল! সেই একই মুহূর্ত্তে আমাদের চোখ পড়্‌ল—উত্তরে দৃশ্যপটের মত কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর। এতদিন তাকে ধব্‌ধবে সাদাই দেখে এসেছি, দেখে মনে হতো এ কাঞ্চনজঙ্ঘা কেন, রজতজঙ্ঘাই বুঝি এর উপযুক্ত সংজ্ঞা। কিন্তু আজ সে ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখলুম 'তুষারধবল কিরীটমণ্ডিত' সর্ব্বোচ্চ শিখরের (২৮০০০ ফিট) উপর কে যেন তুলি দিয়ে একটা সোনালি রংএর আঁকাবাঁকা রেখা কেটে দিয়ে গেল! সে রেখা উজ্জ্বল, আরো উজ্জ্বল হয়ে চোখের সম্মুখে তপ্ত 'গলিতস্বর্ণের' মত ঝক্‌ঝক্ কর্ত্তে আরম্ভ কর্লে! ওদিকে পূবের আকাশের লালিমা একটু গাঢ়তর হ'ল আর অম্নি কে যেন সমস্ত কাঞ্চন-জঙ্ঘার উপর রাশি রাশি আবির ছড়িয়ে দিলে! ব্রীড়ানতা প্রথম অভিসারিকা বধূর মুখের মত কাঞ্চনজঙ্ঘার সমস্ত দেহ লালে লাল হয়ে উঠ্‌লো। এ যেন ঠিক ফাগুনের ফাগ্! দার্জ্জিলিং হতে—সমস্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা আর কখনো দেখি নি, আজই প্রথম ও শেষ দেখলুম, সমস্ত গিরিশৃঙ্গ সোণালি রংএ রঞ্জিত হয়ে, কাঞ্চন-জঙ্ঘা নামের সার্থকতা সম্পাদন কচ্ছে।

---

* সেদিন দার্জ্জিলিংএর Temperature ছিল ৫৬° সুতরাং টাইগার হিলে ৪৫°—৫০°এর ভিতর ছিল বলেই মনে হয়।

আবার পূবের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলুম। ততক্ষণে রক্তরাগরঞ্জিত পূবের আকাশে আর সেই নয়নমুগ্ধকর লালিমা নেই—তার তীব্রতা এত বেড়ে উঠেছে যে চোখ ঝল্‌সে যায়! সূর্য্য তখনো দেখা যায় না—তবু তার তীব্র খর তেজরাশি জানিয়ে দিলে—এক মিনিটের মধ্যেই আমরা চোখের সামনে তাঁকে দেখবো। হলোও তাই; হঠাৎ দেখলুম লাল পিণ্ডাকার কি একটা পাহাড়ের পেছন হতে লাফিয়ে উঠলো, সম্পূর্ণ দেখা যায় না, শুক্লপক্ষের চতুর্থীর খণ্ড চাঁদের মত। তার-পরই দেখতে দেখতে সূর্য্য উঠতে লাগলো, তাঁর সমস্ত গরিমা, সমস্ত মহিমা, সমস্ত লালিমা নিয়ে; এ যেন কোন এক 'সমুদ্র গলিতস্বর্ণে' ডুবে গেছিল, ঢেউএর পর ঢেউ তুলে কাঁপতে কাঁপতে আবার উপরে ভেসে উঠলো। অরুণ তপনের সেই প্রথম রশ্মিতে আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগছিল, তবুও আমরা অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম;—দেখতে দেখতে সূর্য্যদেবের সারা দেহ চোখের সমুখে আলো ছড়াতে লাগলো। কোটি কোটি Candle Powerএর আলো বুকে নিয়ে ঠিক একখানা প্রকাণ্ড Concave mirror এর মত। আর সেই আলো গায়ে মেখে পাহাড়ের পর পাহাড় ঊষার প্রথমচ্ছটায় হেসে উঠলো! আমরা আর ওদিকে তাকাতে পার্লুম না; চোখ ফিরিয়ে নিলুম; চোখের উপর ঘন অন্ধকারময় সবুজ নীল নানা রংএর after image খেলা করে যেতে লাগলো! তুলির সাধ্য নেই—সেই ছবি আঁক্‌তে পারে; ভাষার সাধ্য নেই তা' বর্ণনা কর্ত্তে পারে। আমরা ছয়টি প্রাণী সকলেই ভাবাবেশে স্তব্ধ নির্ব্বাক! কারো মুখে একটুও শব্দ নেই; আমার শুধু মুহুর্ম্মুহু মনে হচ্ছিল অভিমন্যুর মুখে নবীনচন্দ্রের সেই দুটি লাইন—

"পারে লো বর্ণিতে বর্ণে কোন চিত্রকর,
কোন কবি পারে তাহা চিত্রিতে অক্ষরে?"

বাস্তবিকই বর্ণ এখানে বৈচিত্র্যহীন; ভাষা এখানে মূক, স্তব্ধ, নির্ব্বাক্!

সূর্য্য যখন অনেকটা উপরে উঠে গেল, তখন আমরা চারিদিকে যা' কিছু দেখবার মত দেখে নিলুম। সূর্য্যের সেই প্রথম আলোকে Mount Everest (গৌরীশঙ্কর) একটা ত্রিকোণ শৃঙ্গের মত দেখতে পেলুম। তারই দুপাশে সিংহালিয়া ও ফুলাট গিরিশ্রেণীর কতকটা দেখা গেল। দেখে মনে হয়, গৌরীশঙ্কর এ দুটির মাঝে অবস্থিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা' নয়—গৌরশঙ্কর এদের অনেক পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই ছোট ছোট দুটি শৃঙ্গ দেখা যায়—তাই তারা Two Sisters নামে পরিচিত।

ততক্ষণে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর সোণালি নেই—আমাদের চোখের আড়ালে সোণালি যে কখন রূপালিতে পরিবর্ত্তিত হয়েচে আমরা কেউ বলিতে পারি না। কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে বরফগুলির উপর সূর্য্যতেজ তখন চক্‌চক্ কচ্ছিল। সর্ব্বোচ্চ-শৃঙ্গের ছায়া একপাশে পড়ে কতকটা জায়গা কাল দেখাচ্ছিল। ওদিকেই দেখলুম কতকগুলি পার্ব্বত্য নদী এঁকে বেঁকে গিয়ে রমণ ও রঞ্জিত নদীতে পড়ছে। দক্ষিণের দিকে ফিরে দেখলুম কার্শিয়াং দেখা যায়—ঠিক যেন ঈগল্‌স্ ক্রেগের (Eagles Craig) এর ঢালুর উপর ছোট সহরটাকে বসিয়ে রাখা হয়েচে। শুনেছিলুম এদিকেই আরো দূরে সমতল ভূমিতে দৃষ্টিপাত কর্লে সাদা রেখার মত নাকি গঙ্গা, মহানদী, ও তিস্তা দেখা যায়। যতদূর চোখের দৃষ্টি যায়, চেষ্টা কর্লুম কিন্তু তেমন কিছুই দেখা গেল না।

পিছনে ফিরে টাইগার হিলের নীচেই—পাহাড়ের পর পাহাড়, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, আর মাঝে মাঝে উপত্যকা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এদিকেই জলা পাহাড় ও কাটাপাহাড়ের উপর ক্যাণ্টনমেণ্ট প্রভাতের আলোকে বেশ দেখা গেল। তারই ওদিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলুম সমস্ত দার্জ্জিলিং সহরটা দেখা যাচ্ছে, ঘর বাড়ীগুলি যেন পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঝুলছে। যেদিকে চোখ ফিরাই 'পিবন্ত ইব চক্ষুভিঃ' চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। দেখে দেখে আরো দেখতে ইচ্ছা হয়,—আশা যেন আর মিটে না। ততক্ষণে বেশ রোদ উঠে গেছিল, তবু আমাদের কাঁপুনি যায়নি। আমাদের সঙ্গী সাহেব মেম দুটি কিছুক্ষণ আগে নেমে গেছিল; আমরাও নেমে এলুম। নীচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ঘরের ভিতর বড় বড় করে লিখে এলুম Six Pedestrians at Sunrise, 12th May 5-2. A. M.

প্রায় আধঘণ্টা বিশ্রাম করে আমরা নেমে এলুম—তখন দেখি দুজন মেম উঠ্‌ছেন। আমাদের জিজ্ঞেস কর্‌লেন—'সূর্য্য উঠে গেছে?'—'ওঃ সে কবে!' বলে হেসে আমরা নেমে এলুম। সেখানে আমাদের বন্ধু আজব সিং এণ্ড সন্স কোম্পানীর ম্যানেজার 'অনু' বাবু আমাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা কর্‌লেন চা—লুচি ইত্যাদি। সুতরাং খেতে খেতে আমাদের সাফল্যমণ্ডিত শ্রমসাধ্য ভ্রমণ-কাহিনী এখানেই 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করি।

——:o:——

মন্দির

—শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

আমি মন্দির, অন্তরে মোর দেবতা নিত্য করিছে লীলা,
শান্তি বহিছে ফল্গু যেমন, বহিরাবরণ কঠিন শিলা।
স্তম্ভের মত গম্ভীর ঠামে শম্ভুর মাথে ছত্র রাখি,
কৃষ্ণকে ঢাকি যশোদার মত বর্ষা রৌদ্র অঙ্গে মাখি'।
আমি হিমালয়, অম্বুধি আমি, আমিই পুলোমা দৈত্যরাজ ;
উমা, ইন্দিরা, ইন্দ্রানীরে পিতাসম ধরি বক্ষোমাঝ।
চণ্ডী করালী, কপালিনী কালী এঁদেরও রেখেছি যতনে অতি,
মোর ছায়াতলে অন্নপূর্ণা, রবি ও ব্রহ্মা, সরস্বতী।
বিষ্ণুর সেই চক্রহস্তে, মহেশের শূল ত্রিশূলধারী,
ধরি স্কন্দের বৈজয়ন্তী, তাঁদেরই আমি ভৃত্যদ্বারী ;
আমিই নন্দী, ভৃঙ্গীও আমি, আমি মাধবের জয় বিজয় ;
বৈকুণ্ঠ ও কৈলাশ আসি আমার হৃদয়ে পেয়েছে লয়।
পঞ্চনদে ও বঙ্গে মিলিবে কতশত বার আমার দেখা,
দাক্ষিণাত্যে পাষাণ-গাত্রে এ দীন জনার নামটী লেখা ;
কাঁপি কণ্খলে গিরিকন্দরে বনে জঙ্গলে আমার বাস,
চন্দ্রনাথ ও জ্বালামুখী হেরি, তবুও তোমার মিটেনি আশ।
বরোদায় আছি সুন্দর হয়ে, আছি মথুরায় ও মদুরায়,
বৃন্দাবনেও আছি আমি, আছি বিন্ধ্যগিরির বনচ্ছায়।

প্রয়াগ সোহাগে রেখেছে আমারে, মণিকর্ণিকা, দ্বারকাপুরী,
মধুরাত হেরি মথুরাতে বসি', রয়েছি কনোজ কাঞ্চী জুড়ি'।
আছি মহীশূরে, গয়া, পুস্করে,ভুবনেশ্বরে গগন চুমি',
ভুলি পথশ্রম করি পরিক্রম, অবলীলাক্রমে ভারতভূমি।
কুমারিকা হতে বদরিকাধাম যেথা যাও পাবে আমার সাথ
ত্রিবাঙ্কুর ও জয়পুর ভ্রমি, সোমনাথ হতে জগন্নাথ।
ঊষর ক্ষেত্রে রয়েছে ধুসর, গলে পরি কভু তুষার হার,
ছবি মোর হেরি যেথায় কাবেরী, মর্ম্ম মুকুরে নর্ম্মদার;
গোদাবরী আর তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণা যমুনা মন্দাকিনী
তুলে কূলে কূলে উর্ম্মির ধ্বনি ছন্ ছন্ ছন্ রিণিকি ঝিনি ;
বিন্দু বিন্দু নির্ঝর বারি ঝরে কভু মোর কপোল বেয়ে,
সিন্ধু কভু বা ফেনাফুল নিয়ে পাষাণ-সোপানে আসিছে ধেয়ে,
কঙ্করতীরে রেখে যায় ধীরে রঙীন শঙ্খ ভক্তিমান;
পবন স্বয়ং ফুৎকার দিয়ে ঘোষে অবিরাম বিভুর নাম !
মন্দির আমি মন্দার-মালা হরিচন্দন নাহিক মোর,
ভাস্কর দিল শত শত দল মন-আনন্দে হয়ে বিভোর;
বিশ্বকর্ম্মা মোরে নির্ম্মাণ করেনি দেখায়ে গুণপনা,
মর্ত্ত্যশিল্পী কল্পনাবলে পাথরে এঁকেছে আলিপনা,
ক্ষুদ্রযন্ত্রে ক্ষোদিত করেছে অমূল তরু ও অতুল লতা,
কত পশুপাখী অঙ্কিত রহে পুরাতন কত পুরাণ-কথা।
হোথায় গরুড় উড়িতে না চাহে, রহে কেশবের প্রসাদকামী
ধ্যানে নিমগন মুদিত নয়ন পাষাণকাননে দিবসযামি।
হেথা শিখি নাচে পাথরের গাছে নৃত্য তাহার হয় না শেষ,
অক্ষয়রূপ ভুঞ্জে কুসুম, কোরকপুঞ্জ নবীন বেশ;

চিত্রকরের তুলিসম্পাতে আলোকিত তনু দেখিয়া নিয়ো,
মার্জ্জিত করে মুদ্রিত করে রেখে গেছে রেখা অভাবনীয় !
নারদ করেনা বন্দনা হেথা পরাজয় তবু মানিবনা,
বিহঙ্গমের সঙ্গীত শুনি নিন্দা বদনে আনিব না !
বিল্ব নিম্ব বট কদম্ব, বন্ধুর মত আমার পাছে,
সম্মুখে মোর দুর্ব্বা তুলসী বকুল শেফালি ছড়ায়ে আছে।
পারিজাত নাই—নহি পরাজিত— কুঞ্জ রচেছে অপরাজিতা,
ফুটে হেথা সেথা কুঞ্জ যূথিকা কত কি কলিকা অপরিচিতা।
রজনীগন্ধা কামিনী চম্পা গন্ধ বিতরে অন্ধকারে,
খদ্যোত তাই ঘূরি নর্ত্তনে সাজায় তাদের বিজলী-হারে।
এত বিচিত্র রূপের চিত্র, হেন গুঞ্জন কাণের কাছে,
হেন সাথী আর হেন উপাসক বল কোন লোকে
কোথায় আছে ?
প্রথম প্রভাতে প্রাঙ্গনে আসে পুরাঙ্গনা ও পূজার মালা,
দিগ্বলয়ের পার হতে আসে যাত্রী বহিয়া অর্ঘ্যডালা !
মধ্যাহ্নের পূর্ণ লগ্নে ক্ষীণ ব্রাহ্মণ আরতি করে
সন্ধ্যায় ঘন মন্দিরা বাজে কাংস্য ঘণ্টা মধুরস্বরে
অগুরু-গন্ধে গুগ্‌গুল ধূমে পঞ্চ প্রদীপ শিহরি উঠে,
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি মোর ওঙ্কারনাদ গগনে ছুটে;
গম্ভীর রবে বাজে মৃদঙ্গ, গাহে জয় বালা বালক সনে—
এলে শর্ব্বরী, যায় ঘরে ফিরি, করে কর ধরি' ফুল্লমনে।
আমি মন্দির সাগ্নিক সম হোমের কুণ্ড রেখেছি জ্বালি'—
অন্ধ, ক্লান্ত, পন্থা-ভ্রান্ত আলোক দেখিয়া আসিবে বলি' !
আমি নামাবলী ভারত-অঙ্গে, অক্ষৌহিণীর অক্ষমালা,
আমি শাশ্বত রত্ন-আকর, অমল গর্ব্বে ললাট আলা।

আমি হিন্দুর ধর্ম্মের ধ্বজা—দেখাই ঊর্দ্ধে পথটি হোথা ;
সমাজের আমি মণিবন্ধনী—দেখাই সমাজে গ্লানিটি কোথা।
শ্মশানে মশানে মরুভূমে বাস, আছি লোকালয়ে বিজন-তীরে,
আমি ভোলানাথ—ভেদাভেদ-জ্ঞান দিয়াছি সঁপিয়া গঙ্গানীরে,
কি মোহদম্ভে একথা ভুলেছ, নাহি এতটুকু মাথার বোধ ?
দেবের সেবক, আমার অতিথি—তাদের প্রবেশ করেছ রোধ
আমার দেবতা দীনের আবাস ভাসায় আশিস্-কিরণ-ধারে,
ভিক্ষুর মত আমার দেবতা ঘুরে ছত্রিশ জাতির দ্বারে,
হীন চণ্ডালে প্রেমালিঙ্গনে আমার দেবতা যতনে বাঁধে,
গোপাঙ্গনার অঙ্গনে বসি' আমার প্রাণের দেবতা কাঁদে,
আমার দেবতা একাসনে বসে ক্ষেয়া-পাটনীর তরণী' পরি,
নিষাদ কুটিরে আমার দেবতা বিরাজিত রাজরাজেশ্বরী !
আমার দেবতা কান্ত শান্ত, আমার দেবতা নম্র-হাস,
দৈত্যের কাছে রুদ্র হলেও চারু মঙ্গল ভক্ত পাশ।
তোমার দেবতা তুমিই হয়েছ, ভোগের বাসনা আসন তার,
ভক্তি তেয়াগি ভণ্ড সেজেছ, পূজেছ আপন অহঙ্কার।
উৎকোচ দিয়ে উদ্ধার হবে, ভক্তির দাবী রুধিবে বলে !
দেবতা পারেনা রুধিবারে তাহা ! মূর্খ কি কভু বৃক্ষে ফলে ?
ভূমি-কম্পেও কম্পিত নহি, অচল অটল ঝঞ্ঝাবাতে,
গ্রাহ্য করিনা কালের ভ্রুকুটি, তর্জ্জনী তুলি বজ্রাঘাতে,
অনাদর আর অপমান দেখে অন্তরে মোর জাগেনা ভয়,
অনাচার-স্রোত বন্যার বেগে ভিত্তি আমার করেছে ক্ষয় !
আমার বিষ্ণুপঞ্জর হতে উঠিছে নিনাদ মৌন রোলে,
ইচ্ছা হয়তো ভেবো এ আদেশ, ভেবো আবেদন ইচ্ছা হলে—

ভণ্ড অশুচি অহঙ্কতেরে দণ্ডপ্রদান ভুলিয়ো না ক',
ভক্ত যাহারা হলেও রিক্ত রক্তের মত বক্ষে রাখ;
রক্ষ আপন দেহ-মন্দিরে যক্ষের মত যতন ক'রে,
ভিক্ষা করিয়া দেবতা সদন আনিব মোক্ষ তোদের তরে।

পরিচয়

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

দিনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার দেখা পেতুম আড়ালে আবছায়ায়। সুরের অন্তরালে মীড়ের মতন সে জীবনের নিকুঞ্জবনে একটা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের আভাস রেখে যেত।······

হঠাৎ শোনা একটা গানের পদের মত তার আভাস ক্ষণিকের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়ে যেত, রেখে যেত একটা সুরের রেশ। মনটা হঠাৎ আকৃষ্ট হয়েই তখনি আবার ছাড়া পেয়ে ঘড়ির দোলকের মত আকাঙ্ক্ষায় অবিরত ঢুল্‌তে থাক্‌ত।

একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে তার অকুণ্ঠিত রূপের দেখা পেলুম। বৈশাখ প্রভাতের মত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল তার রূপ অচঞ্চল মাধুর্য্যে পূর্ণ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে!······

দুই চক্ষের ডানায় ভর ক'রে মন উড়ে চল্‌ল রূপের সাথে পরিচয় কর্ত্তে। কাছে যেতেই হঠাৎ যেন রূপের উপরের ঘোমটা খুলে গেল, চেয়ে দেখেই আচমকা মন বলে উঠল—

—"এ কি, তুমি এখানে!"

মুচকে হেসে রূপ বল্‌লে, "হ্যাঁ আমি এখানে। সন্ধ্যারাগের ওপারে যার খোঁজ করেছিলে, বেদনার নিশীথে ব্যাকুল প্রার্থনায় যার দেখা পেয়েছিলে, আমি সে-ই। আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি?" অশ্রু আবার এসে আমাদের মিলন ঘটিয়ে দিয়ে গেল।

—চেয়ে দেখি ঘর শূন্য, এবার আর মন তার সন্ধানে বেরুতে চাইলে না।

বিজ্ঞাপন রহস্য

—শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য

বৈশাখ— মাসে শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের— **অরক্ষণীয়া** একটু নমুনা দিই [প্রতীক্ষা করিবার আর তিলার্দ্ধ অবসর নাই—বিদায় কর—বিদায় কর! যেমন করিয়া হোক্ যাহার হাতে হোক্—কাল তাহার বৈধব্য অনিবার্য্য জানিয়া হোক্, অসহ্য দুঃখ ও চিরদারিদ্র্য চোখের সামনে জাজ্বল্যমান দেখিয়া হোক তাহাকে সঁপিয়া দিয়া জাতিধর্ম্ম এবং পিতৃপুরুষের পারলৌকিক প্রাণ রক্ষা কর।] অতঃপর তার বুকফাটা রোদনের মর্ম্মান্তিক সুর প্রাণে বাজিলে—

জ্যৈষ্ঠ— মাসে জলধর সেন **আশীর্ব্বাদ** করিলেন :—'গৌরীদানের' বয়স উত্তীর্ণপ্রায় বলিয়া দুঃখ করিবার কিছু নাই ; ৯ এর মধ্যে না হউক ১৯ শের আগে 'অভাগী' নিশ্চয়ই 'সোণার বালা' হাতে পরিতে পাইবে। কিন্তু তাহার 'চোখেরজল' যখন ইহাতেও কমিল না—তখন

আষাঢ়— মাসে রায় বাহাদুর দীনেশ সেন **গায়ে হলুদ** দিবার জন্ত ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু এখানেও রেহাই পাবার জো' নাই। তত্ত্ব সাধ্যাতীত

খরচ করিয়া পাঠাইয়াছিল, 'কিন্তু বেয়ান ঠাকুরাণীর' চশমা শোভিত কুলের আঁটি সদৃশ অক্ষি যুগলের শ্যেন কটাক্ষ্যে এই সব ৩০শটী থালা পূর্ণ দ্রব্য সম্ভারের মধ্যে যথেষ্ট গলদ ধরা পড়িয়া গেল—আর এর ফল—বুঝিতেইত পারিতেছেন 'বিয়ের' পুরোহিত শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চৈতন্ত দেব ধূলায় লুটাইলেন। আর

শ্রাবণ— মাসে উকিল শ্রেষ্ঠ কেশব গুপ্তের পরামর্শে **বিবাহ বিপ্লব** জনিত ক্ষতিপূরণের মামলা রুজু হইল। তখন বেদান্ত শাস্ত্রী সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মধ্যস্থ হইয়া আপোষে মিটাইবার পরামর্শ দিলেন এবং "বর বিনিময়" যে শাস্ত্র সম্মত তাহা পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে ঘোষণা করিলেন। তখন—

ভাদ্র— মাসে শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের **দ্বিতীয়পক্ষ-**হারা উড্ডয়ণ শক্তি রহিত অশীতি বৎসর বয়স্ক ঠাকুরদাদা মহাশয় আসরে নামিয়া মেয়েটীর জাতি কুল রক্ষা করিতে রাজী হইলেন। [বিশেষ দ্রষ্টব্য—অরক্ষণীয়া কন্যা বলিয়াই ভাদ্রমাসে বিয়ে হইল।]

আশ্বিন— মাসে শ্রীপরেশনাথ সরকারের, ঠাকুমার **বৌভাত** উপলক্ষে অনেকগুলি টাকা খরচ হইয়া গেল; পরেশ বাবু আপনার গ্রামবাসীদের ডাকাইয়া তাঁর দুর সম্পর্কীয় ঠাকুরদাদার 'নূতনগিন্নী'কে দেখাইয়াছিলেন, অবশ্য প্রাগুক্ত নরেশবাবু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন নাই।

কার্ত্তিক— মাসে দীনবন্ধু মিত্রের **সধবার একাদশী** করায় সহস্রমোক্ষ ফলফুলাদি কীর্ত্তন শুনিয়া

আমাদের 'নূতন ঠাকুরমার' ব্রতনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। তাঁর অত্যধিক যত্ন আত্তির ফলেই হউক আর যে জন্যই হউক ঠাকুরদাদার পা'দুটা ফুলিয়া কলাগাছ হইল। আর্শীতে মুখ দেখিয়া ঠাকুরদাদা ভাবিলেন— কয়দিনের মধ্যে মাথার সব শাদা চুলগুলা ফের কালো হইয়াছে! যৌবন ত' ফিরিয়া আসিয়াছেই—নববধূর আয় পয়ে শিশুত্বও অচিরাৎ ফিরিবে সন্দেহ নাই।

অগ্রহায়ণ— মাসে বঙ্কিমের **কৃষ্ণকান্তের উইল** এর অনুকরণে ঠাকুরদাদাও তিনবার উইল করিয়া তিনবার ছিঁড়িলেন। অবশেষে

পৌষ— মাসে সরোজ সুন্দরী দেবীর **প্রেমের সমাধি** দেওয়া সম্বন্ধে যুক্তি সমীচীন বুঝিয়া ঠাকুরদাদা তাঁর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ঠিক করিলেন। ঠাকুরমার ভাগে পড়িল ০ আনা বখ্‌রা।

মাঘ— মাসে পরমেশ বাবুর নিকটে ব্যবস্থা লইয়া **পঞ্চামৃত** সম্বন্ধে ফর্দ্দ পেশ করিয়া ঠাকুরমা একটা পয়সাও আদায় করিতে পারিলেন না। উপরন্ত গোদা পায়ের তিন লাথি খাইয়া শানের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িলেন। তারপর

ফাল্গুন— মাসে হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের রচিত **তুষানল** এর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। এবং বুড়া স্বামীর আগে মরিতে পাইয়া

চৈত্র— মাসে যতীন্দ্রনাথ পালের প্রদর্শিত **সতীর স্বর্গ-ধামে** প্রয়ান করিলেন ও অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত সুখভোগ করিতে লাগিলেন।

——:০:——

দূরের যাত্রী

—শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেটা পৌষমাসের মাঝামাঝি। আজ চার পাঁচদিন সাহেবদের বড়দিন উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দশীর টুকরা চাঁদের মত ছুটির দুই একটা দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঠিক সেইসময় একদিন পৌষের হিমাচ্ছন্ন শীতের গভীর রাত্রে দেওঘর ষ্টেসনে একটী যুবক ট্রেন হইতে অবতরণ করিল। সঙ্গে লটবহর কোন কিছু নাই,—সে হন হন করিয়া ষ্টেসনের বাহিরে আসিল। সম্মুখেই একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী দেখিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল এবং গাড়োয়ানকে "ঝামাগুড়ি" যাইতে হুকুম দিল।

গাড়োয়ান বলিল, "বাবু কত ভাড়া?"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল "কত নিবি?"

"একটাকা"

যুবক বলিল একটাকা ঢের বেশী, কিছু কম নে।"

গাড়োয়ান বলিল, "বার আনার এক পয়সা কম হবেনা বাবু বলে রাখছি,—শেষে গোলমাল ভাল নয়।"

যুবক বলিল, "আচ্ছা।"

যুবকের কথায় মনে হইল, যুবক বোধহয় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঝামাগুড়ি আসে নাই। দূরত্ব হিসাবে ভাড়ার গুরুত্ব সে নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না।

গাড়োয়ান দেখিল, বাবুকে পৌছাইয়া আর একটা ক্ষেপ অনায়াসে দেওয়া যাইবে। সে কারণ সে খুব জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

যুবক গাড়ির ভিতর হইতে দুই একবার মুখ বাহির করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি যেন দেখিতেছিল।

প্রায় ডুমকা রোডের উপর পড়িয়া গাড়োয়ান বলিল, "বাবু"

"এসেছিস্? অন্ধকারে ঠিক চিনতে পারিনিরে।" বলিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া তাহার হাতে বার আনা ভাড়া দিয়া সম্মুখে পথ ধরিয়া সে চলিতে সুরু করিল। গাড়োয়ান মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া পুনরায় ষ্টেসন অভিমুখে ছুটিল।

২

নীরব নিস্তব্ধ রজনী। পথে জনমানব নাই। অনেক দূরে দূরে এক একটা মাড়োয়ারীদের 'গোলা'—ফটক বন্ধ। এক একটা হরিকেন মসীসমাচ্ছন্ন অবস্থায় মিট মিট করিয়া জ্বলিয়া মনুষ্যবাস প্রমাণ করিতেছে। কোথায় মাঝে মাঝে পথের কুকুরগুলা অকারণ চীৎকার করিতেছে—যুবকের কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। একরূপ ছুটিয়াই চলিয়াছে। একবার কি ভাবিয়া মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়াইল, পশ্চাতে দেখিল না। তারপর রাস্তা ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া পড়িল। যুবকের চলা দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে, যুবক এপথে সম্পূর্ণ নূতন পথিক। এত দ্রুত চলিতেছিল—প্রায় ঘণ্টায় ছয় মাইল হইবে।

সামান্য ভোরের আলো হইবার মাত্র যুবক একটা ঘন অন্ধকার শাল বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন সে অসম্ভব রকম ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সমস্ত শরীর টলিতেছিল বুঝি বা এখনই একটা কিছুতে বাঁধা পাইলেই পড়িয়া যাইবে। একরকম সে জোর করিয়া নিজের দেহটা কোনপ্রকারে অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে টানিয়া লইয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া একটা প্রকাণ্ড বটগাছের নিম্নে দেহভার ঢালিয়া শুইয়া পড়িল। মনে হইল মুহূর্ত্তের ভিতর সে সকল আশা আকাঙ্খা ও ভয় ভাবনার বাহিরে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

৩

তরুণ অরুণের কনক কিরণ রশ্মি, সুন্দর পরিশ্রান্ত ও চিন্তাকাতর মুখখানির উপর নিবিড় তরুপত্রের মধ্যদিয়া আসিয়া পড়িতেই যুবকের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাসে তাহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে বেশ শীত অনুভব করিল। চারিদিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। উঠিতে চেষ্টাকরিল কিন্তু পারিলনা। সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ

বেদনা। পা ফুলিয়া গিয়াছে। অসহায়ের মত সে পড়িয়া মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিল সে ত কোন অপরাধ করে নাই, কোন দোষের দোষী নয়—মানুষ মানুষের সঙ্গে মেশে—এই মিলনই হইতেছে জীবন! নইলে মানুষ যে একদণ্ড বাঁচিতে পারেনা। ভাবের বিনিময় না করিতে পারিলে সে কি লইয়া বিশ্বের দরবারে আত্মপরিচয় দিবে। এই আত্মপরিচয় দেওয়াই বুঝি পরাধীন জাতির পক্ষে অমার্জ্জনীয় মহাপাপ। নইলে সে ত কিছু করে নাই কেবল সুরেশের সহিত মিশিয়া বেড়াইত। সুরেশের যে কি গুরুতর অপরাধ ছিল, তাত' সে জানিত না, তারপর একদিন সুরেশকে কি কারণে জানিনা বাড়ী হইতে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গেল। সে বাপ মার একমাত্র পুত্র—তারা বড় মানুষ—কি অর্থই না সতীশের বাবা জলের মত তার জন্য ব্যয় করিল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা। সে নাকি দেশের জন্য রাজার বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল—তখনি একটা অপরাধে তাহার জেল হইয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে একজন অপরিচিত যুবক আসিয়া তাহাকে ইসারা করিয়া রাস্তায় ডাকিল, তারপর—ক্রমান্বয় পথে পথে সে ছুটিতেছে। সম্মুখ হইতে তাকে ফাঁকি দিবার জন্য যেমন করিয়া শিকার প্রাণপণ শক্তিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া বেড়ায়, যুবকেরও ঠিক সেই অবস্থা।

শুষ্কপত্র সহসা খড় খড় শব্দ করিয়া উঠিতে যুবক চমকিয়া উঠিয়া চতুর্দ্দিকে ভয়ব্যাকুলিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। অকস্মাৎ সে দেখিল একটী মহুয়া বৃক্ষের অন্তরালে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে—এক সাঁওতাল তরুণী। সে কি অপূর্ব্ব নিষ্কলঙ্ক দৃষ্টি—কি সমবেদনার করুণায় তাহার চক্ষু ঢল ঢল করিতেছে। যুবক তাহাকে নিকটে ডাকিল। যুবক তাকে সাহস দিয়া বলিল, "অসহ্য পিপাসা! একটু জল দিতে পার?" সে প্রথমটা নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়া যেন ইতঃস্তত করিতে লাগিল। যুবক তাকে সাহস দিয়ে বলিল, "তোমার কোন চিন্তা নাই, তোমার হাতের জল আমি খাব। একটু জল দেও।" সে জল আনিতে যাইতেছে জানিয়া সে বলিল, "একটা কথা শোন, আমার কথা কাহাকেও বলিও না।" তাহার কথা শুনিয়া যুবকের মুখের দিকে সে এমনভাবে চাহিল এবং ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, "আমাকে বিশ্বাস কর কোন চিন্তা নাই।"

তাহার সহিত চারি চক্ষুর মিলন হইয়া গেল। মুহূর্ত্তে তাহাকে সমস্ত অন্তরের সহিত সে বিশ্বাস করিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে যুবককে জল আনিয়া দিল। আঃ কি তৃপ্তি!

৪

তার সেই পাতার ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে সে যুবককে বুকে করিয়া নিয়া গিয়া আশ্রয় দিয়াছে। এই শীতের বনের ফাঁকেই তার পর্ণ কুটীর। কি করিয়া যে সে তাঁহাকে বাঁচাইবে এই তার প্রাণপণ চেষ্টা! কত রকম পাতার রস, কতরকম মন্ত্র তন্ত্র যা সে জানিত তা করিতে সে কিছুমাত্র ত্রুটী করিল না।

আজ কয়েকদিন মাত্র অতীত হইয়াছে, কলেরায় তার পিতামাতা তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। সেই বেদনাভরা গভীর হৃদয়তলে তার সমস্ত স্নেহভালবাসা দিয়ে সে যুবককে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল।

বিধাতার সহিল না! বেশ বুঝিতে পারিলাম যুবকের জীবন অবসান হইয়া আসিতেছে। তাহারই কোলে কি আনন্দে শেষ বিদায়! তার কোমল করস্পর্শে, তার ব্যথাভরা কোমল দৃষ্টির স্নিগ্ধ ছায়াতলে মরিয়া কি সুখ!

বেশ মনে আছে, তরুণী যুবকের মুখের কাছে তার শঙ্কাশূন্য নিষ্কলঙ্ক মুখখানি নিয়ে এসে বলিল,

'তুমি ত চুরি করনি, ডাকাতি করনি, মানুষ মারনি, তবে তোমাকে তারা ধরবে কেন?" তারপরের কথা জানিবার সৌভাগ্য যুবকের অদৃষ্টে আর ঘটেনি।

যুবতী এবার যুবককে অনেকবার ডাকিল, সাড়া নাই। ঠিক এমনি করিয়াই তার পিতামাতা উত্তর দেয় নাই। তরুণীর নয়নাশ্রুতে বক্ষ ফাটিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। কত কথাই তার তরুণ হৃদয় ভেদ করিয়া আজ জাগিয়া উঠিতেছিল।

যুবতীর কাণে গেল, বড় রাস্তার উপর অনেক লোকের কণ্ঠস্বর। সেদিকে সে মন দিলনা। অনিমেষ নয়নে সে যুবকের মুখের প্রতি চাহিয়াছিল। এই সময়ে সে দেখিল যুবক দক্ষিণ হস্তে একটা কি ধরিয়া রহিয়াছে।

সে বিস্ময়ে তাহা হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল—হতভাগিনী জানিতনা যে সাক্ষাত মৃত্যুকে সে বরণ করিয়া লইয়াছে।

যুবকের হাতে গুলিভরা রিভলভার ছিল। তরুণী যেমন তাহার ঘোড়াটি টানিয়া দেখিতে গেল—অমনি বিদ্যুৎগতিতে তাহার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া গুলি ছুটিয়া চলিয়া গেল। সে যুবকের বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িল। তপ্ত শোণিতধারা অনন্ত পথের যাত্রীদের মিলন উৎসবকে আনন্দে রাঙা করিয়া দিল।

বন্দুকের শব্দ শুনিয়া পুলিশ সেই দিকে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু তখন দূরের যাত্রী, অনেক দূরে—মানুষের শক্তি ও অহংকারের অনেক বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

---:০:---

নীলকণ্ঠ

(উপন্যাস)

—শ্রী ... ...

দুই

নিখিল ও গোপাল ব্যতীত বৃন্দাবনের সংসারে আর কেহ ছিল না। মাতা পিতা উভয়েই লোকান্তরে গমন করিবার পর হইতেই নিখিল কাকার কাছে আছে। ইংরাজী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত সে পড়িয়াছিল। বৃন্দাবন তাহাকে লেখাপড়া ছাড়াইয়া আপনার কারবারের কাজ দেখিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোপালকেও পড়া ছাড়িতে বলিয়াছিলেন, সে অনেক আবদার ও জেদ করিয়াই কলিকাতায় গিয়া কলেজে ভর্ত্তী হইয়াছিল। বৃন্দাবন বনেদী বড়লোক নন। তিরিশ বছর আগে নিজের মাথায় মোট বহিয়া তুলা ধান ও পাট বেচিতেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ তাঁর অবস্থা ফিরিয়াছে। এখনও তাঁর পাট ও লোহার কারবার ভাল রকম চলিতেছে। বাত ও অন্যান্য রোগে জীর্ণ হইয়া তিনি

নিজে কিছু পর্য্যবেক্ষন করিতে পারেন না। নিখিল কাজ শিখিয়া তাঁর প্রতিনিধি হইয়া সমস্ত তদারক করে।

বছর কয়েক আগে গোপালের মা মারা যান, সেই থেকেই বৃন্দাবনের সকল কাজকর্ম্মে উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। গোপাল কাছে থাকে না, এজন্যও তাঁর দুঃখ হয়। তাহলেও ছেলের ইচ্ছায় তিনি বাধা দেন নাই। কলিকাতায় যাহাতে সে সুখে থাকে এই জন্য সম্প্রতি একটী বাড়ী কিনিয়া দিয়াছেন। সেখানে চাকর বামুন সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। গ্রামে বাড়ীতে অষ্টধাতুর দশভুজা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেবতার পূজার্চ্চনায় যাহাতে ক্রটী না হয় সেইজন্য দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় ছেলের কাছে থাকিতে পারিলেন না। গোপাল শনি রবিবার বাড়ী আসিত। এই দুটীদিন বৃন্দাবনের অনেক আনন্দে কাটিত।

প্রিয়নাথ মিত্র যেদিন নিজে আসিয়া সুলতার জন্য গোপালকে জামাতারূপে প্রার্থনা করিলেন বৃন্দাবন উৎফুল্ল হইলেন। তাঁর মনে হইল গোপাল ও নিখিলের বিবাহ দিয়া ঘরের হারাণো শ্রী ফিরিয়া আনিবেন। তিনি নিখিলের জন্যও দুচার জায়গায় 'মেয়ে' সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সতের'ই গোপালের,—এবং এই দশ বার দিন যা বাকী আছে ইহারই মধ্যে নিখিলের 'সম্বন্ধ' কোথাও ঠিক করিয়া পনেরই তাহারও বিবাহ দিবেন।

গোপাল নিখিলকে বলিল "আমায় এ যাত্রা তোকে উদ্ধার করতেই হবে। —ভাবছি, বাবাকে কি বলে বোঝাব।.........তবে—তুই যদি রাজী হস—!"

নিখিল বলিল "আমি তোর কোন কথাই বুঝতে পারছি না। হেঁয়ালী রেখে সাদা কথায় বল তুই কি করতে চাস্?"

"আমি বিয়ে করবনা শুনে বাবা নিশ্চয়ই রেগে উঠবেন। তাঁকে জানি তাঁর কথার অবহেলা কেউ করলে কোন মতেই তিনি মাপ করবেন না। তবে তুই যদি রাজী হস্—সুলতাকে বিয়ে করতে—!"

"তোর আপত্তি কোনখানে সেইটে আমায় বল। দেখতেও মন্দ নয়! তবে—বুঝেছি তুই সেই বেহায়া মেয়েটীর কথায় রেগেছিস্! তাই বলে—কিন্তু—

"আমি তোকে অনুরোধ করছি।.........বাবাকে আমি কিছু বলতে পারব না। তাঁকে বুঝাবার ভার তোর!"

"আমি পারবনা।"

"বেশ।"........

দুইজনেই নির্ব্বাক্। পাশাপাশি পথ চলিতেছে। গোপাল গম্ভীর হইয়া মতলব ঠিক করিতেছিল। নিখিল প্রতিমুহূর্ত্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনের কথা বুঝিতে চেষ্টা করে। আবার তখনই চোখ ফিরাইয়া লয়। গোপালের রকম দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু সে যা বলে তা অসম্ভব। গোপাল অবশ্য স্নুলতাকে বিবাহ না করিতে পারে। ইহাতে বৃন্দাবনের মাথা হেঁট হইবে। তথাপি, তিনি প্রথমে রাগিলেও মায়ার বশে ছেলেকে ক্ষমা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রিয়নাথ ত তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন না। তিনি একজন বিশিষ্ট জমিদার। তাঁর ও মান অপমানের জ্ঞান আছে। তিনি পুনরায় স্নুলতার সহিত নিখিলের বিবাহ দিতে কখনও সম্মত হইবেন না। তাছাড়া স্নুলতাকে প্রার্থনা করিবার অধিকার নিখিলের কি আছে? প্রকৃত বলিতে গেলে কাকার আশ্রয় ব্যতীত তার নিজস্ব কিছু নাই। সে এমন কিছু বিদ্বানও নয়। সংসারে তাহাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পথ করিয়া লইতে হইবে। তাহার পক্ষে 'জমিদারের মেয়ে' বিবাহ করিবার আশা পাগলামী ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

কিছুক্ষণ পরে নিখিল বলিল "রাগ কর্‌লি?"

গোপাল উত্তর করিল না।

নিখিল "তুই বিয়ে না করতে পারিস্ না করবি। কাকাকে যা বলবার আমি বলব। কিন্তু আমার নাম যেন তুলিস্ নি। লোকে পাগল ঠাউরাবে!"

গোপাল বলিল "কেন? আমার মত তুইও ত বাবার সন্তানের সমান। অন্য কোনও রকম ব্যবহার কখনো পেয়েছিস কি? সত্যি বলতে তুই তাঁরই বড় ছেলে। তোতে আর আমাতে তফাৎ কোন খানে!"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

"কি?"

"তুই কি আর কাকেও ভালবেসেছিস? আমার কাছে গোপন করিস্‌নি। হঠাৎ ভীষ্মের মত এরূপ প্রতিজ্ঞা করবার মানেটা কি?"

"প্রতিজ্ঞা আমি করতে চাইনা—তবে—"

"তবে কি?"

"বিয়ে করতে যদি হয় ঐ মুখরা মেয়েটাকেই আমি চাই। তোরা আমার মুখ চেয়ে সবাই তার ওপর রেগে উঠেছিস্! কিন্তু ভুল বুঝেছিস্। তার তিরস্কার আমার মর্ম্মে বিঁধেছে। তাই—তাকে জয় করে—পদানত করে—দেখাব—! যাক্—সে কথা—!"

"ওঃ। তাই বল! স্পষ্ট না বললে কি করে বুঝব? সুলতার চেয়ে সে সুন্দর সত্যি! কিন্তু কোন জাত—কি বৃত্তান্ত—কিছুই না জেনে একেবারে কায়মন সমর্পণ করে বসিস্ নি, পস্তাবি! এক দৃষ্টিতেই তাকে ভালবেসেছিস্? তোর জন্য এ ঘটকালী করতে আমি রাজী আছি। সুলতাকে যখন বিয়ে করবি না তখন সে নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কাকা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হবেন সত্যি কিন্তু বুঝিয়ে বললে হয়ত তাঁর রাগ পড়ে যাবে।"

নিখিলের কাছে বৃন্দাবন সমস্ত শুনিলেন। তিনি মুখে কিছু বলিলেন না—। অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন।

পরদিন তিনি প্রিয়নাথের কাছে ক্ষমা চাহিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন এমন সময় প্রিয়নাথ তাঁহার বাড়ীতে আসিলেন। বৃন্দাবন তাঁহাকে সমাদর করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

বৃন্দাবন বলিলেন "দেখুন, আজকালকার ছেলেরা পিতার বাধ্য নয়। আমরা বুড়ো হয়ে পড়েছি। আর আমাদের কথা মান্য করবার প্রয়োজন দেখেনা। সুলতাকে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরে আনব ভেবে মনেমনে কত আশার জাল বুনছিলুম। সব ভগবানের হাত! আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

প্রিয়নাথ বলিলেন "সেকথা ঠিক। গোপাল বাবাজীর যখন এত আপত্তি তখন এ বিয়ে হতেই পারেনা! আমার অন্য আর্জ্জি আছে সেইজন্য এসেছি। আপনাকে কথার খেলাপ করতে দেব না। যখন আশীর্ব্বাদ করে মেয়েকে চরণে স্থান দিবেন বলেছেন তা দিতেই হবে। নিখিলের সঙ্গে তার বিয়ে হতে ত' কোন আপত্তি হতে পারেনা! তার মতটা যদি একবার জিজ্ঞাসা করেন!"

"নিখিলের কথা বলছেন? তার কথা আমিও ভেবেছিলুম। তাকে আমি গোপালের থেকে মোটেই পৃথক দেখিনা; আমার বিষয়েরও সে অর্দ্ধেক

ভাগ পাবে। তবে আপনার ঠিক মত হবে কিনা বুঝতে না পেরে একথা বলিনি। তার কাছেই গোপালের সম্বন্ধে কালকের সব ব্যাপার আমি শুনেছি। সে সময় সুলতার প্রতি নিখিলের নিজের ধারণা কি তাও জানতে পেরেছি। তার নিজের কোনও অমত হবেনা।”

সেইদিনই কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গেল।

বৃন্দাবন মালতীকেও দেখিলেন। পরিচয়ে জানিলেন সে প্রিয়নাথের জাঠতুত ভাইএর মেয়ে। মালতীর বাপ গরীব; কায়ক্লেশে দিন কাটে। মালতীর বড় একটী বোন বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতেছে। পিতা ভাবিতেন মালতীর বিয়ে অল্প বয়সে দেবেন না। ভয় হইত হয়ত তাহারও অদৃষ্টে এমনই কোন শাস্তি লেখা আছে। যতদিন কাছে থাকে মাছ ভাত খাইবে। বাপ যে কত দুঃখে একথা বলিতেন মালতী তাহা বুঝিত। সেও পিতৃগতপ্রাণ ছিল। বলিত সে বিয়ে করিবে না। তার কনিষ্ঠ আর কোনও বোন বা ভাই নেই সুতরাং তাহার বিবাহ না হইলে কাহারও জাত যাইবার ভাবনা ছিলনা।

কিন্তু মালতী অথবা, তার পিতা কাহারও সঙ্কল্প ঠিক রহিল না। বৃন্দাবনের ছেলে মালতীকে নিজে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে শুনিয়া অবধি শ্রীনাথ তখনি আনন্দে সম্মতি দিলেন। আর মালতী, বাপের নিগূঢ় মর্ম্মবেদনার কাহিনী জানিত বলিয়া নিজে কোনও আপত্তি জানাইল না। গোপালকে বিয়ে করিতে তাহার মন হয়ত প্রথমে ঠিক রাজি হয় নাই কিন্তু সে যখন ভাবিল—পিতার ইহাতে কতখানি উৎকণ্ঠা দূর হইবে—তিনি কত সুখী হইবেন—মালতী আর তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হইবে না, —তখন সে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার সম্মতি জানাইল। গোপালের প্রতি তার যতটুকু বিদ্বেষ ছিল আর কিছু মনে রাখিল না।

হিন্দুর মেয়ে শিশুকাল হইতে শিবপূজা করিয়াছে, শিবের মত বর পাইবে এই কামনায়। মালতী স্বামীকে শিবের সমান ভাবিয়া ভক্তিনত হইয়া প্রণাম করিল।

সুলতা কিন্তু মালতীর বিবাহে সুখী হয় নাই। একত্র থাকিতে পাইবে এইটুকু আনন্দে উৎফুল্ল হইবার কারণ ছিল। তবু সুলতার মনে হইল, গোপাল বিবাহ করিতেছে একটা মোহের বশে। মালতীর

কথায় সে আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছিল তার প্রতিফল লইবার জন্যই সম্ভবতঃ বিবাহ করিতেছে । এ বিবাহ সুখের হইবে না। মালতীর পরিণামে অনেক দুঃখ আছে। এই কথা ভাবিয়া সুলতার চোখে জল আসিল। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল গোপাল যেন সমস্ত ভুলিয়া যায়;—মালতীর যথার্থ হৃদয় চিনিতে পারিয়া তাহাকে ভালবাসে!

সুলতার মনে সন্দেহ জাগিলেও সে তাহা কারও কাছে প্রকাশ করিল না। ভাবিল ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাহা মিথ্যা হইয়া যাইবে! মালতী যদি জানিতে পারে মনে ব্যথা পাইবে! যা হবার কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না। মিছা ভাবিয়া মন ভারী করায় কোন লাভ নেই।

নিখিলের মনেও ঠিক এই সন্দেহ জাগিয়াছিল কিন্তু নিজের মনকেই সে অবিশ্বাস করিল। সে ভাবিয়াছিল মালতীর রূপ গোপালের চোখকে ঝলসাইয়া দিয়াছিল। সুলতার কাছে মালতীর স্নেহমাখা অন্তরের পরিচয় শুনিয়া সে ভাবিল, গোপাল যাহাই মনে করুক মালতী তাহাকে বশীভূত করিবে!

শুভদৃষ্টির সময় গোপাল চোখ চাহে নাই। লোকে ভাবিল—লজ্জায়! কেহ হাসিল—কেহ টিটকারী দিল। গোপাল কিছু গ্রাহ্য করিলনা।

বাসরে গিয়া সে অসুস্থ ভাণ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। যেসব রমণী তাহাকে দুকথা শুনাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন সেরাত্রির মত তাঁরা আপনা আপনি বকাবকি করিয়া অবশেষে যে যার ঘরে চলিয়া গেলেন। মালতীর মনে এবার খটকা লাগিল।

ফুলসজ্জার রাতেও তাহার এই সন্দেহ আরও সুদৃঢ় হইল। গোপাল প্রতি কাজে যেন এই কথাটাই তাহার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে চায় যে মালতী তাহার কাছে নগণ্য খেলার সামগ্রী মাত্র! তাহাকে গোপাল প্রতি পদক্ষেপেই পদদলিত করিতে পারে!

মালতীর মনে পড়িল পূজার মন্ত্র—স্বামী যেমন হোক, কুশ্রী হোক কদাকার হোক, অসৎ এবং ঘৃণিত হোক, তাঁহাকে দেবতা ভাবিয়া ভক্তি করিবে। যদি পারে ত তাঁহার অভাব অথবা দোষ সংশোধন করিয়া দিবে—না পারে সব নীরবে সহিবে!

শিবের চরণে প্রণাম করিয়া মালতী প্রার্থনা করিল, তাহার ভক্তি অটুট থাকুক! তাহার ভালবাসা অমর হউক!

বিবাহের সব কটা অনুষ্ঠান একে একে অতিক্রান্ত হইলে গোপাল মালতীর দিকে চাহিয়া আপন মনে বলিল "এইবার তোমায় বাগে পেয়েছি। তোমার একটী দিনের অবজ্ঞার প্রতিদান আমি তোমার প্রতিদিনের চোখের জলে স্মরণ করিয়ে দেব। তুমি কত তেজ ধর আমি একবার যাচাই করে দেখব! তোমার এই ঘৃণিত স্বামীর চরণতলাতেই লুটিয়ে পড়ে যখন কাঁদবে, আমি অবহেলায় সরে দাঁড়াব। তোমার ধর্ম্ম,—তোমার সাহস—তোমার আনন্দ—আমার ভ্রূকুটী ও লাঞ্ছনার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! দয়া মায়া ক্ষমা কিছুরই মুখ না চেয়ে আমার এই নির্ম্মম প্রতিশোধ তোমাকে অহর্নিশ দগ্ধ করবে!"

(ক্রমশঃ)

—:০:—

অভাগীর ছেলে

—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

কুঁড়ে ঘর। গোল পাতার ছেঁড়া চাল।

অনন্ত অকাশ উপর হইতে হাতছানি দিয়া ডাকে। ছোট্ট ছেলেটী তাহা শুনিয়া আত্মবিহ্বল হইয়া চাহিয়া থাকে! অস্ফুট ভাষায় প্রত্যুত্তরও জানায়।

স্বপ্নপুরীর রাজকন্যা, চাঁদের জ্যোৎস্নার পথ দিয়া সোণার রথে চড়িয়া তাহারই পাশটীতে নামিয়া আসে, গান গায়, চন্দনের পাখা দিয়া বাতাস করে, পদ্মহস্তের সোহাগ মাখা পরশে কপালের ঘাম মুছাইয়া দেয়।

কোন অভাব নেই, কোন বেদনা নেই! মাতৃবক্ষের অমৃত ক্ষীরধারা অপার তৃপ্তি আনিয়া দেয়। মায়ের ওইটুকু সম্পদের উপর সন্তানেরই একমাত্র দাবী। আর কেহত' সে অধিকারে ভাগ বসাতে আসে না!

শিশুর শৈশবটুকু, আড়ালে আবছায়ায়, কোন রকমে বাড়িয়াই চলে !......

জন্মদাতা পিতা জন্ম দেবার দায়ীত্ব হইতে মুক্ত হইয়াই, আর কোন ভাবনা ভাবে না। শিশুর বাঁচার দায়িত্ব বুঝি একমাত্র মায়েরই !

নবকুমার দিনের বেলা বাড়ী থাকে না। সারাদিনই বৃথা কাজে ঘুরিয়া বেড়ায়। কথনো বা গ্রামস্থ গাঁজার আড্ডার পাশে বসিয়া থাকে—যদি কেহ এক ছিলিম খাইয়া তাহাকে এতটুকু প্রসাদ ভিক্ষা দেয় এই আশায়! কথনও সে পল্লীর নিষ্কর্ম্মাদের কাছে বসিয়া তামাক খায় আর খোসগল্প করে।

রাতদুপুরে অভুক্ত স্বামী ঘরে ফিরিয়া অত্যাচার করে,—হতভাগিনী শান্তা কি দিয়া তাহাকে শান্ত করিবে ভাবিয়া পায় না। নিজের না খাওয়ার কষ্ট কোনও রকমে হয়ত' সহ্য যায়,—কিন্তু সারাদিন না খাইয়া, এবং দিনান্তে লম্পট স্বামীর কাছে একটী পয়সাও না দেখিয়া, অগত্যা নিদ্রাদেবীর 'বেদনা ভুলানো' কোলটীতে যখন ঘুমাইয়া পড়িবে ভাবে, অধিকন্তু এইরূপ স্বামীর নূতন নূতন অত্যাচার এবং গঞ্জনা, তাহার সহ্য করিবার সকল সীমা অতিক্রম করিয়া দেয় !

পানাসক্ত নবকুমারের প্রহারের শব্দ এবং শান্তার মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদে প্রতিবেশীদিগের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহারা গালাগালি করিতে থাকেন, 'লক্ষ্মীছাড়া দুজনের জ্বালায় সংসারে তিষ্ঠান দায় হইল' !

শান্তা ভাবে অসহ্য এই জীবন! কথনো বা আত্মহত্যার মতলবও মনে জাগে। কিন্তু মরিবার সঙ্কল্প করিয়া যখন, শিশু পুত্রের মায়ের প্রতি চিরনির্ভর মুখখানির কথা মনে পড়ে, আর মরা হয় না।

ঐ এক রত্তি শিশুটা—সকল দুঃখ বেদনার মাঝে অভাগীর একমাত্র বাঁধন !

অন্তরের নির্জ্জন অন্তঃপুরটীতে ছেলেকে কাছে ডাকিয়া শান্তা জিজ্ঞাসা করে—'বড় হয়ে তুই-ই আমার দুঃখ ঘুচাবি কি বলিস ? পারবি ত ?'

মায়ের কাতরতা শিশু বোঝে কি না কে বলিবে! হয়ত বা আশ্বাস দিয়া বলে—পারব মা !

মায়ের প্রাণে এই আশাটুকুই সান্ত্বনা।

শান্তার পিত্রালয়ে আপন বলিতে কেহ ছিল না। খুড়তত ভাই ব্রজেন কলিকাতায় উকীলের মুহুরীগিরি করিয়া দু'পয়সা রোজগার করে। শান্তার দুঃখ দেখিয়া সে তাহাকে মাসে মাসে দশটী করিয়া টাকা পাঠাইয়া দেয়। উহার

দ্বারাই যতটুকু পারে শান্তা খরচা চালায়। প্রতিবেশিনীরা শান্তার দুঃখে মৌখিক্ সহানুভূতি প্রকাশ করে—শান্তা আপনার বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মোছে!

কালের সংসারে গোঁজামিল দিয়া বছর কাটে।

ছেলে বড় হয়। এবং মায়ের দুমুঠা ভাতের মাঝ খানেও একটী গ্রাস দাবী করিয়া বসে। পাঁচহাতী একখানি কাপড় এবং শীতকালে পাঁচসিকার একখানি 'দোলাই' না হইলেও ত চলে না। মা হয়ত কোনদিন একবেলা খায়, কোন দিন হয়ত বা উপবাসও করে, ছেলে তাহার কিছুই খবর রাখেনা। গোপালের কোনও দিন খাওয়া দাওয়ার একটুও ত্রুটী হয় না!

সন্ধ্যার সময় যথাসাধ্য ভাল কাপড় জামা পরাইয়া তাহার হাত ধরিয়া শান্তা প্রত্যহ কালীমন্দিরে আরতি দেখিতে যায়। তথায় সমাগতা প্রতিবেশিনী-দিগের ছেলেদের সহিত গোপাল যখন দৌড়াইয়া খেলিয়া বেড়ায়, শান্তা তখন পুত্রের পানে নির্নিমেষলোচনে চাহিয়া থাকে। গোপালের সুন্দর বলিষ্ঠ ক্রীড়মান দেহখানি শান্তার হৃদয়ে গর্ব্ব ও আনন্দ ভরিয়া দেয়।

গোপাল এখন বিশ বৎসরের যুবক। তাহার দেহে অসাধারণ শক্তি। সে ডাম্বেল ভাঁজে, আখড়ায় কুস্তি খেলে। কিন্তু তাহার বলিষ্ঠ দেহ দর্শনে শান্তা আর আনন্দ পায় না। গোপাল এখন গুণ্ডার দলে মিশিয়াছে। গোপাল বড় হইয়া তাহার দুঃখ ঘুচাইবে এই আশায় শান্তা এতদিন বুক বাঁধিয়া ছিল। গোপাল লেখাপড়া শেখে নাই, নিয়ত অসৎ সঙ্গে মিশিয়াছে, যেন মায়ের কোন ধারই সে ধারেনা। মায়ের বুকের কতখানি রক্ত শোষণ করিয়া এই কুড়িটা বছর সে বাঁচিয়াছে, সে কথা বারেকের জন্যও ভাবে না! অবশেষে একদিন ডাকাতি করার অপরাধে গোপাল ধরা পড়িল।

অভাগিনী শান্তা এ সংবাদ শুনিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। শান্তা সেই যে শয্যা গ্রহণ করিল আর উঠিল না। তাহার জীবন নাটকের যবনিকা পতন হইল।

বিচারে গোপালের চৌদ্দবৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

জেলে যাইয়া গোপালের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল। অমন দুর্দ্দান্ত স্বভাব কোথায় লুকাইয়া গেল। সে এখন মাটীর মানুষ হইয়াছে। তাহাকে লইয়া জেলের পাহারাওয়ালাদের কোনই বেগ পাইতে হয় না। তাহার শরীরে অসুরের বল। নিজের কাজ ত নিয়মিত ভাবে করিতই—অধিকন্তু দুর্ব্বল কয়েদীদিগের কাজেও সাহায্য করিত।

মার কথা সময়ে অসময়ে বারবার মনে হয়। আজ এই এতদিনে মা যে কি জিনিষ সে প্রথম বুঝিল। মা—মা—মা—চির কল্যাণময়ী মা! পুত্রের এই দুর্গতির কথা শুনিয়া মা কি তাহার বাঁচিয়া আছে? মা কাছে থাকিতে তাঁর অভয়দায়িনী মূর্ত্তি চোখে পড়ে নাই, আজ তাঁরই অভাবে কেমন করিয়া দিন কাটে! ঐ মায়ের পরাণে কত ব্যথা সে দিয়াছে,—অকুণ্ঠিত মনে মা সব সহিয়াছেন! মা কি তাহার আজও বাঁচিয়া আছে? ইচ্ছা হয়, কারাগারের রুদ্ধ প্রাচীর পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া, ছুটিয়া গিয়া মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়ে!—নিজের বুদ্ধিহীনতার জন্য, এবং এই অশেষ কুকর্ম্মের জন্য মায়ের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চায়!—বলে, এবার তোকে চিনেছি মা, কখনো আর কোন বেদনা দেব না,—এবারের মত ক্ষমা করে যা'!·········কিন্তু ক্ষমা চাহিবার অবসর যদি আর না থাকে? মা যদি তার জন্মের মত এই অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুর জগতের কাছ হইতে চির বিদায় লইয়া চলিয়া যান?············দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর—কতদিনে অতীত হইবে?·········মায়ের এতটুকু সংবাদ, কেহ কি দয়া করিয়া জানাইয়া যায় না?······

জেলে ভাল ব্যবহারের জন্য গোপালের দুবৎসর শাস্তি মাপ হইয়াছিল। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের প্রতীক্ষার পর একদিন রাত্রি প্রভাত হইল!

গোপাল জেল হইতে বাহির হইয়া স্বীয় গ্রামের দিকে চলিল।

তেমনি মাঠ, তেমনি জঙ্গল, তেমনি পড়ো বাড়ী—সেই বার বছরের আগেকার স্মৃতি বুকে করিয়া জাগিয়া আছে। ওই ত ঘোষেদের তালপুকুর······ তারপর বেণেদের আকৃক্ষেত······তারপর রায়দের চণ্ডীমণ্ডপ·········তার পরই

ত·········হাঁ·········ওই তাহাদের ভিটা। মা এখন কি করিতেছেন কে জানে! তার পিতারই বা খবর কি! অত্যাচারী এবং লম্পট পিতার প্রতিও আজ কেমন যেন একটু অনুকম্পা জাগে! এইরূপ নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে গোপাল কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আবেগ ব্যাকুল স্বরে ডাকিল—"মা"!

হঠাৎ পিছন হইতে 'কে রে? চোর?' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কে তাহার স্কন্ধদেশ চাপিয়া ধরিল। গোপাল একটুও বিচলিত না হইয়া বিদ্যুৎ-বেগে লোকটার দিকে ফিরিয়া তাহাকে সজোরে আঘাত করিল। লোকটী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

গোপাল, জ্যোৎস্নালোকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পিতা!

"আমি বুঝতে পারিনি বাবা—তুমি"—এই বলিয়া গোপাল প্রণত হইয়া পদধূলি লইবার জন্য অগ্রসর হইল।

নবকুমার রাগে গজ গজ করিতে করিতে পা সরাইয়া লইল। বলিল—"তুই······শালা আবাগীর বেটা······বেরো······বেরো······ডাকাত খুনে···"

"আমি থাকতে আসিনি বাবা!······তোমার পথে কাঁটা হয়ে পড়ে থাকতে চাই না।······একবার শুধু মাকে দেখে যেতে চাই······আমার অভাগিনী মাকে দেখতে চাই!······মা কোথায় বাবা?·········"

"চুলোয় গেছে তোর মা, হতচ্ছাড়া!·········তুইও যা!"

নবকুমার আপন কাজে ফিরিয়া গেল।

গোপালও ফিরিল। মা তার বাঁচিয়া নাই! আর কোথায়ই বা তাহার আশ্রয় মিলিবে?

সারা জগতের মাঝে সে আজ একান্ত একাকী·········অসহায়!·········



সওদা

হাতে পুষ্পপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে, চলেছেন মন্দিরে, কিন্তু বসন স্খলিত, অর্দ্ধচ্যুত,—চক্ষু মদালস;—হয়ত বা উপাধানে মস্তক এলিয়ে শুয়ে আছেন, চোখে তৃষ্ণা, বক্ষে লহরী;—হয়ত বা 'গ্লোবে'র ওপর দেহভার রেখে বসুমতীতে অকারণ ভূমিকম্প বাধাচ্ছেন;—বা হয়ত চোর-প্রণয়ীর তুলিকার মসি-বিন্দুতে ললাট কলঙ্কিত করে' নিচ্ছেন;—কিম্বা নবযুগ ঘোষণা করতে নেমে এসেছেন ঘাগ্‌রা ঘুরিয়ে,—বাংলার মাসিক পত্রিকার আবরণ পত্রের ওপর তরুণীদের ভিড় লেগে গেছে।

বেচারী পথচারীদের প্রলুব্ধ কর্‌তে।

জীবনে ক'টা জীবন্ত নারীর সঙ্গেই বা দেখা হয়? বোঝাই হয়ে গেল তোরঙ্গ, ঘরের দেয়ালে একেবারে বাজার বসিয়ে দিয়েছে।..........

হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে হায়রান্ হয়ে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়্‌বার জন্য একটা 'মুষ্টিযোগ ত' চাই গিন্নিদের।—মাথার চুল যাতে শিউরে ওঠে,—ট্রেণ-কলিশান্‌এর পর জাঁতা' চেপ্‌টে যাওয়া অপরিচিত অপরিচিতার চুম্বন,—কিম্বা পিস্তলের গুলি,—কিম্বা বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে গুণ্ডার হাতে চক্‌চকে ছুরি,—কিম্বা একটা জাহাজ প্রায় ডুবুডুবু,—পালোয়ান পতিতাদের মুগুর ঘোরাতে শেখাচ্ছেন, মানুষ নিয়ে লুফ্‌ছেন।

সাজাহান পাগল হয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে—দিই লাফ? দিই লাফ? অম্‌নি বিপুল হাতগুলি।

কলিযুগের নব অবতার কেরাণীর দল এক পয়সা গর্‌চা দিয়ে সাহিত্য-সমালোচনার পার্ট মুখস্থ কর্‌ছেন।..........

বিরাগ ও নয়, অনুরাগ ও নয়,—খালি রাগ, রাগ। লাঠি নিয়ে আসে বীণা বাজাতে। বাঁশীর সুরকে বাঁধ্‌তে চায় জ্যামিতির বৃত্তে,—কল্পনাকে ইতিবৃত্তে।

আথ্‌খুটে,—ছিঁচ্‌কাদুনেরা। মনোমত হয় না কিছুতেই। কোন্ রঙের খেল্‌না পছন্দ হয়, তাই স্পষ্ট ক'রে তৈরি কর না বাপু?

তখন দেখবে, যে লাঠি নিয়ে তুমি তেড়ে এসেছিলে, সেই লাঠি নিয়েই আবার কারা তেড়ে এসেছে।

তোমরা যে বাঁশ থেকে বানাও লাঠি, আমরা সেই বাঁশ থেকেই বাঁশী বানাই। তোমরা যে কাদা মুখে মাখ, সেই কাদা দিয়ে আমরা বানাই বিশ্বের প্রতিমা। তোমরা পোকার মত যেই দীপশিখায় পুড়ে মর, আমরা সেই দীপশিখা উর্দ্ধায়িত করে' দিয়েছি আকাশের তারার লালসায়।

পুঁইশাক খেয়েই যারা জীবন খোয়াচ্ছে, তাদের পায়েস সম্বন্ধে রুচি-জ্ঞান ঘটতে দেরি লাগে বৈ কি! পায়েসেও যে নুন্ লাগে,—এ কথা বিশ্বাস কর্‌তে তাদের মাথা ঘুরে যাবে।...........

যে সব পাঠক না পারে সৃষ্টি কর্‌তে, না পারে বা রসাস্বাদ কর্‌তে,—তারাই হয় সমালোচক। চ'টে সমালোচক। নিজে নাচ্‌তে না পার্‌লে যেমন উঠোন বাঁকা।

না আছে লোচন, না আছে আলোক—তবু সমালোচক!

এক লাইন পড়েই অভ্রান্ত রায় দিয়ে খালাস সবজান্তা,—সব বুঝ্‌। "ভালো হয় নি", তাই ভালো হয় নি।

সব জিনিষই ত' সে হল্‌দে দেখ্‌বে, যে ন্যাবায় ভোগে।

ঘরে বউ এলে প্রথম প্রথম লক্ষ্মী বউ। বিধবা হ'লে—পোড়ারমুখি, ডাইনি।

শিবারা চেঁচায়, শিব ধ্যান করেন।............

উপেনকে স্বীকার করি না কিরণময়ী ছাড়া। উপেন শুধু মূর্ত্তি,—কিরণময়ীতে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। কিরণময়ীকে চিনি বলেই' উপেনকে চিন্‌লাম।

তাই কিরণময়ীর থাকাটাই বড় সত্য।

তাই কিরণময়ীকে আগে প্রণাম না কর্‌লে উপেনের কাছে প্রণাম পৌছুবে না।

Printed by Sj. S. N. Bhattacharyya from the
Venus Printing Press, 66, Manicktola St. Calcutta.

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল।

প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য [illegible] টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সহ-সম্পাদক—শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য।

গ্রেট বেঙ্গল কেমিকেলস্ এণ্ড পারফিমারি ওয়ার্কস্

১২১নং গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা, টেলিগ্রাম 'কিন্নরী' কলিঃ।

বিরাট বিতরণ! বিরাট বিতরণ!!

যৌবন ও সৌন্দর্য্যকে অটুট রাখ্‌তে



রূপগুণ ও গৌরবে বাজারে একমাত্র পরীক্ষিত শ্রেষ্ঠ স্নো, (রেজেষ্টারীকৃত) কিন্নরী কালকে ফর্সা, শ্যামবর্ণকে সুন্দরী, সুন্দরীকে ৭ দিনে পদ্মিনী করে। মূল্য বার আনা। একটা কিন্‌লেই খাঁটী কিন্নরী স্নো বাজারের বাজে স্নো অপেক্ষা যে কত ভাল বুঝতে পারবেন। একত্র ৬টী স্নো নিলে ১টী বি-টাইম-পিস্ ঘড়ী উপহার পাই-বেন। মাঃ পৃথক

নূতন আবিষ্কার, (রেজিষ্টার্ড) সত্বফলপ্রদ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য শক্তি

খ্যাতনামা ডাক্তারগণের বহুপরীক্ষিত এবং বড় বড় সংবাদপত্র ও সমালোচনীতে উচ্চ প্রশংসিত—

ঘোড়া মার্কা, অকৃত্রিম (রেজিষ্টার্ড)



বাল্য-চাপল্য বা অন্য কারণে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হেতু অবসাদ, অনিদ্রা, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য, ধারণাশক্তির অভাব, মনের চাঞ্চল্য, অকাল বার্দ্ধক্য, বাত, পক্ষাঘাত, অর্শ, অজীর্ণ জনিত অবসাদ, হিষ্টিরিয়া, মৃগী, বহুমূত্র, শুক্রমেহ ও তারল্য, স্বপ্নদোষ যৌবনোচিত উদ্যম ও পুরুষত্বহীনতায় অমোঘশক্তিশালী অতি পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক। মূল্য ১৸৹ মাঃ পৃথক।



(মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল

সম্পাদক

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য।

ধূপছায়া কার্য্যালয়

৭৯।২৩ লোয়ার সার্‌কুলার রোড, কলিকাতা।

বিষয় সূচী।

শ্রাবণ—১৩৩৪ সাল।



রুদ্রের আহ্বান

—৺বিজয় সেনগুপ্ত

আজি রুদ্রের রথ থেমেছে তোদেরি অঙ্গনে,
ওরে পুরবাসী, তোরা সবে তার সঙ্গ নে'।
　ওই দুর্ম্মদ, এসেছে নিঠুর,
　মোহ নিদ্রায় করি' দিতে দূর ;—
শোন্ তোরা আজি তাহারি ধনুর টঙ্কনে !—
　　রথ থেমেছেরে অঙ্গনে !

এতকাল তোরা শুয়ে ছিলি সুখ শয়নে,—
কেটে গেছে কাল স্বপনের জাল বয়নে !
　সে দিনের আজ হ'ল অবসান,—
　ওই শোন্ কাণে ভৈরব তান ;—
তা' হলে তোদের নিদ টুটে যাবে নয়নে !—
　　এতকাল ছিলি শয়নে !

ভেবেছিলি বুঝি কেটে যাবে কাল আলসে !—
চাঁদিমা বুঝিরে চিরদিন দেবে আলো সে !
ফুল মধু আর মলয় বাতাস,
প্রেম বিরহের বৃথা হাহুতাশ ;
ভেবে কিবা হবে, যাবে দিন হেন লালসে !—
কেটে যাবে কাল আলসে !

সে সুখ স্বপন বুঝি আজি সবি টুটিল !
নভ-অঙ্গনে রক্তিম আভা ফুটিল !
রুদ্রের সেই আলোক ছটায়,
সুখ নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটায় ;—
মনে হয় বুঝি, একি দুর্গ্রহ জুটিল !—
সুখের স্বপন টুটিল !

কত বরষের শত অবিচার বন্ধনে,
আত্মা তোদের বদ্ধ তাহার ক্রন্দনে !
এসেছে সে আজ করিবারে দূর,
ধ্বনিয়া তুলিতে কী আশার সুর !—
আসিয়াছে সে যে জাগাতে নবীন স্পন্দনে,
দূরিতে সকল বন্ধনে !

নিদ্ পরিহরি দেখ্‌রে সকলে চাহিয়া,
নহিলে এখনি সময় যাইবে বহিয়া !
রুদ্রের ওই শঙ্খের রবে,
সবারি যে আজ সায় দিতে হবে !
উচ্চকণ্ঠে তাহারি বিজয় গাহিয়া,
দেখরে সকলে চাহিয়া !

ওরে সবে উঠে আয় এই শুভ লগনে,
মাথার উপরে দেখ্‌রে সূর্য্য গগনে,
শোন্‌ শঙ্খের ঘোর গর্জ্জন!
আয় সব কাজ করি বর্জ্জন!
এখনো কি হায় রবি তোরা নিদ্‌ মগনে,—
আয় এই শুভ লগনে!—

রুদ্র আজিকে এসেছে দীপ্ত বরণে,
ভয় নাহি কিছু লওরে উহার শরণে!
কর্ম্মের পথে অলস ঘুচায়ে,
রুদ্রের ডাকে শিরটী উঁচায়ে,
বাহিরিবি যবে তখনি জিনিবি মরণে!—
এসেছে দীপ্ত বরণে!

:০:——

রাতের শেফালি

শ্রীমঞ্জরী দেবী

— ১ —

রাস্তার ওপারে হরমোহন বাবুর বাড়ী।

দেশ-বিশ্রুত বক্তা তিনি। খ্যাতির অন্ত নেই। নিপীড়িত নিগৃহিত দেশ-মায়ের দুঃখ কষ্টে তাঁর চোখ ছাপিয়ে কথায় কথায় অশ্রু ঝরে। তাঁর শুভ্র অকলঙ্ক চরিত্র ও উদার-প্রাণতার জন্যে দেশের লোকের শ্রদ্ধার আসনে তিনি ঠাঁই পেয়েছেন।

তাঁর বড় ছেলে অজিতের সঙ্গে একই কলেজে 'বি, এ' ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েচি। এক পাড়ায় থাকার দরুণ আমাদের বন্ধুত্বটাও নিবিড় হ'য়ে উঠেচে। তারপর অবস্থার ফেরে আমি পরীক্ষা দিতে পার্‌লুম না, আর অজিত ক্রমান্বয়ে এম্, এ-বি. এল্, পাস ক'রে ওকালতিতে পশার জমিয়ে ফেল্‌ল। সংসারের ভার ঘাড়ে চাপায় আমি অগত্যা মাস কয়েক ধরে 'ভেকেন্সির' চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে শেষে একটা 'ফার্মে' পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরানীগিরিতে ঢুকে পড়লুম।

দেশে থাকেন মা, আর ছোট ভাই বোন দুটী। আমি কল্‌কাতায় একটা মেসে থেকে তাঁদের মাসিক খরচ পাঠাই। চাক্‌রী হবার পর দেশ থেকে মা এইবার একটী 'রাঙা বউ' আন্‌বার তাগিদ দিয়েছিলেন বটে! কিন্তু, পঞ্চাশ টাকার কেরানী আমি—এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে চট্ ক'রে অত বড় দুঃসাহস আমার হয়নি।

কিন্তু অজিতের ক'নে দেখা হচ্চে, তা' শুনেছিলুম। আজকালকার বিয়ের বাজারে এম্, এ,-বি, এল্ পাস করা বর ঠিক একরাশ চুনো-পুঁটীর মধ্যে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া রুই-কাৎলার মতই দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য।

সুতরাং ক'নের বাজারে বেশ হুলস্থূল পড়ে গেল। কন্যাদায়-গ্রস্তদের মধ্যে যেন রেষারেষি চল্‌তে লাগ্‌ল—এই 'এম্, এ, বি, এল্' কাৎলাটীর জন্যে কে কত উঁচু দর হাঁক্‌তে পারে।

কিন্তু দেশ-হিতৈষী, উদার চেতা হরমোহন বাবু জোর গলায় প্রচার ক'রে দিলেন, যে দর হাঁকা বৃথা! পণ-প্রথাকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করেন।......... গরীবের ঘর থেকে কেবল মাত্র শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে তিনি পুত্রবধূ আন্‌বেন।

সে দিন লোকের শ্রদ্ধার চোখে তিনি আর এক ধাপ উঁচুতে উঠে গেলেন............

হোলও তাই। শেষ-বসন্তের এক সন্ধ্যায় আলোর মালা সাজিয়ে, হাসি উৎসবের মাঝে বর-বেশী অজিত বিয়ে করতে চল্‌ল। সঙ্গে আমরা বর-যাত্রী গেলুম।

শুনেছিলুম, ক'নে নাকি বাপ-মা-হারা। নিঃসন্তান মামাই তার পালক ও অভিভাবক। রমানাথ বাবু ধনী লোক। লোহা লক্কড়ের ব্যবসা ক'রে তিনি তাঁর লোহার সিন্ধুক সোণায় ভরিয়ে ফেলেচেন।

কিন্তু হরমোহন বাবু তাঁর বৈবাহিকের কাছ থেকে একটাও পয়সা নেন্ নি। আজকালকার দিনে এমন আদর্শ-যোগ্য দৃষ্টান্তে লোকে তাঁকে ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌লো।

— ২ —

নতুন বিয়ে কর্‌লে বিবাহিতের মুখে যে পুলকের দীপ্তি ফুটে ওঠে, অজিতের মুখে তা' দেখ্‌তে পাইনি। বরং দেখেছিলুম, একটা কালো ছায়া তার মুখের স্বাভাবিক প্রফুল্লতাকেও ম্লান করে দিয়েছে।............ভাবলুম, এ বিয়েতে অজিত হয়তো সুখী হয় নি!

অজিতের নব-পরিণীতা বঁউ তমালকে বউ-ভাতের দিন দেখেছিলুম।.......রংটা কালোই বল্‌তে হবে অজিতের সুগৌর রংয়ের তুলনায়। তবু তার লজ্জা-নম্র মুখ খানি বড় সুন্দর লেগেছিল। প্রথম বর্ষার ধারায় দুর্ব্বাদলের গায়ে যে শ্যামল শ্রী ফুটে ওঠে, তেমনি অপরিস্ফুট যৌবনা এই কিশোরীর মুখে এমন একটী অপরূপ লালিত্য ও লাবণ্য মাখানো ছিল, যা' সচরাচর দেখা যায়না।

কিন্তু অজিতের মধ্যে যে উদ্ধত ও অহঙ্কারী প্রকৃতি ছিল, তমালের রূপকে সে অবজ্ঞার চোখে দেখেছিল।

কথায় কথায় একদিন অজিত আমাকে বলেছিল—তার বউ নাকি বেজায় 'গুমরে'; কথা কইলে 'হ্যাঁ, না' ছাড়া বড় একটা জবাব দেয় না.........নেহাৎ পাড়া গেঁয়ে জংলী আর কি!

আমি কিন্তু বুঝেছিলুম, নারী-জীবনের রঙীন বসন্ত প্রভাতেই অবজ্ঞার আঘাত পেয়ে সেই কুণ্ঠিতা কিশোরীটী তার অস্ফুট হৃদয়-মুকুলটী ভালো করে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে নি।

— ৩ —

পাড়ায় একটা গুজব রটেছিল! এবং কানাকানি হ'তে হ'তে শেষে আমারও কানে এসে পৌছল।

হরমোহন বাবু যে ছেলের বিয়েতে পণ নেন্ নি, তার নাকি একটা গূঢ় কারণ আছে।............কারণটী হচ্ছে এই—রমানাথ বাবু নিঃসন্তান; তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার ষোলআনা সম্ভাবনা

একমাত্র অজিতেরি আছে। অতএব, ছেলের বিয়েতে পণ না নিলেও হরমোহন বাবুর বাস্তবিক কোনো লোক্সান হয় নি, যেহেতু, ভবিষ্যতে রমানাথ বাবুর সমস্ত সম্পত্তি তাঁরই হাতে আস্চে।............

কিন্তু সম্প্রতি প্রৌঢ় বয়সে রমানাথ বাবুর এক ছেলে হওয়ায় তাঁর বাড়াভাতে যেন ছাই পড়েচে।............

কথাটা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হোলনা। ঋষি-কল্প হরমোহন বাবুর পক্ষে এ কখনই সম্ভব নয়। নিশ্চয় পাড়ার হিংসুকে নিন্দুকের দল তাঁর নামে এই মিথ্যা গুজব রটিয়েচে!

কিন্তু একদিন সকালে পাড়া কাঁপিয়ে একটা তীব্র কাঁসা-গলার ঝঙ্কার শোনা গেল—".........বলি, তুমিও কোন নবাব-নন্দিনী যে উনুন ধরাতে পার্বে না?.........রূপের তো ওই ছিরি, তার ওপর মামাও একটী পয়সা উপুড়-হস্ত করলেন না.........এমন হা ঘরের মেয়ে এনেছি, যে সুখের মুখ দেখ্তে পেলুম না..........."

কথাগুলো যার উদ্দেশে বর্ষণ করা হোল, তার ফুলের মত পেলব অন্তরে সেগুলি বুঝি বিষাক্ত হুলের মতই বিঁধ্লো!

স্তব্ধ হোয়ে আমি ভাবতে লাগ্লুম, নিরীহ বউটীর ওপর এ নিষ্ঠুর আক্রোশের কারণ কি?

কিন্তু আশ্চর্য্য হলুম এই ভেবে, যে সেদিন এক বক্তৃতা-সভায় হরমোহন বাবু 'নারী-নিগ্রহের' বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে দু'চোখে বর্ষার প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন...........

— ৪ —

তমালের কপাল পুড়্ল।

এ জগতে এমন এক একটা হেলা-ফেলা-ভরা জীবন আছে, যে মনে হয়, বিধাতা যেন বিশ্বের লাঞ্ছনা কুড়োবার জন্যেই এদের পৃথিবীর পথে পাঠিয়েচেন। তমালের জীবনটাও ঠিক এই দলের।

একদিনের তরেও সে স্বামীর মুখে আদর-মাখা মিষ্টি কথা শোনে নি। তবু শ্বাশুড়ীর সান্ত্বনা-ভরা স্নেহ তার একটা সম্বল ছিল এতদিন; কিন্তু অভাগী তাও

হারালো। শ্বাশুড়ীর বুক থেকে সমস্ত স্নেহ যেন মরীচিকার মত মিলিয়ে গিয়ে রইল শুধু অন্তর-দাহী জ্বালা।

আমাদের ঘরের জানলা দিয়ে হরমোহন বাবুর অন্দরের খানিকটা দেখা যায়। দেখি, লাঞ্ছিতা, অবগুণ্ঠিতা কিশোরী বউটী নীরবে নত মুখে উনুন ধরানো থেকে বাসন-মাজা পর্য্যন্ত সংসারের সকল কাজই করে যায়।

তবু মন পায় না।

শ্বাশুড়ীর বাক্যবাণ দু'বেলা বর্ষিত হয় তার ওপর.........এমন বউকে নিয়ে তিনি নাকি দিনরাত জ্বলে পুড়ে মরচেন! তাঁর অমন সোণার টুকরো ছেলের কি না এই কাল-প্যাঁচার মত বউ! আর, তাও যদি মামা বিয়েতে দু'পয়সা দিতো থুতো, তা হ'লে না হয় সওয়া যেত।.........ইত্যাদি ইত্যাদি...... ...

তমালকে বসুমতীর মত নীরব ধৈর্য্যের সহিত সব সহ্য করতে দেখি। কিন্তু যেদিন তার শ্বাশুড়ি তার স্বর্গীয় বাপ মায়ের নামে একটা জঘন্য অপমান করলেন, সেদিন তমালের অনেক দিনের সঞ্চিত ব্যথা অঝোর ধারায় নেবে এল দুই চোখের পথে............

কিন্তু কান্নাও নাকি তার পক্ষে অন্যায়। শ্বাশুড়ির তীক্ষ্ণ গলা বেজে উঠ্‌ল—"..........বলি, আবার ঢং করে কান্না হচ্চে কেন? পান্‌সে চোখের জল অম্‌নি ঝর্‌তেই আছে.........."

তমাল ত্রস্ত হাতে আঁচল দিয়ে অশ্রু মুছে ফেল্‌ল।

বড় অসহ্য হওয়ায় একদিন অজিতকে ডেকে জিগ্যেস করেছিলুম—অনর্থক একটা নির্দ্দোষী প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে তাদের কি লাভটা হয়?

অজিতের মেজাজটা বোধ হয় আগেই চড়া ছিল, তাই সেদিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলে, যে তার বউকে নিয়ে পাড়ার লোকে মাথা ঘামাবে, সে তা' মোটেই পছন্দ করে না।

আমি শুধু জবাব দিলুম, যে মাথা থাক্‌লেই লোকে ঘামিয়ে থাকে।

আমাদের বন্ধুত্বের মাঝখানে সেইদিন একটা আড়াল পড়ল।.........

শনিবার। দেড়টার সময় ছুটী পেয়ে মেসে ফিরে এসেচি। আষাঢ়ের নব-মেঘ-স্নিগ্ধ দুপুর বেলাটী ভারি ভালো লাগ্‌ছিল। জান্‌লার ধারে বসেছিলুম আনমনে।

হঠাৎ হরমোহন বাবুর বাড়ীর দিকে নজর যেতেই বিস্ময়ে ব্যথায় স্তব্ধ হ'য়ে গেলুম।.........জান্‌লার ধারে একলাটী দাঁড়িয়ে আছে তমাল! অযত্ন শিথিল চুলের রাশ বুকে কাঁধে পিঠে ছড়ানো, খ'সে-পড়া আঁচলখানি ধূলোয় লুটোচ্চে, আর—মেঘ-ঘন আষাঢ়-আকাশের দুটী টুক্‌রোর মত তার কালো চোখের দুটী তারায় ভাষাহীন বেদনার বাণী!...........অত করুণ চাউনি আমি জীবনে আর দেখি নি।

এই নির্জ্জন দুপুরে সে যেন তার ব্যর্থ পরিণীত জীবনের সমস্ত বেদনাকে প্রাণ দিয়ে অনুভব করছিল।

হঠাৎ কোত্থেকে অজিত ঝড়ের মত এসে আমার দিকে একটা রুক্ষ কঠিন দৃষ্টি ফেলে, তমালের হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিয়ে সশব্দে জান্‌লাটা বন্ধ করে দিল।

কি ঘৃণিত সন্দেহ-সঙ্কুল মন ওর! আজ এই ব্যাপার নিয়ে সেই নিষ্পাপ কিশোরীর ওপর দিয়ে কি ভীষণ অত্যাচারের ঝড় ব'য়ে যাবে, তা ভাব্‌তেও চোখ দুটো নিস্ফল আক্রোশে জ্বালা করে উঠ্‌ল.........

— ৫ —

আঘাতের পর আঘাত পেয়ে তমালের ধৈর্য্যের বাঁধনও আল্‌গা হ'য়ে পড়েছিল।

তাই একদিন নীরব নির্জ্জন সন্ধ্যায় হরমোহন বাবুর বাড়ীর ছাতে যখন দেখ্‌লুম, লেলিহান আগুনের শিখা সন্ধ্যার আকাশকে টক্‌টকে রাঙা করে তুলেচে, তখন আমি বিস্মিত হইনি।.........একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বলেছিলুম—যাক্‌, এতদিনে সব শেষ! প্রতি পলে জ্বলে মরার চাইতে একেবারে আগুনের শিখায় আত্ম-সমর্পণ করা ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়।

.........সে যেন রাতের শেফালি—ভোর না হ'তেই ঝ'রে পড়্‌ল।

তমালের বিদগ্ধ দেহখানা যখন 'এ্যাম্বুলেন্সে' করে মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হোল, তখন হরমোহন বাবুর বাড়ীর একজনেরও চোখ সজল হ'য়ে উঠ্‌তে দেখিনি।.........এতদিনে তাঁদের হাড় জুড়োলো.........এইবার দেখে শুনে অজিতের আর একটী বিয়ে দিয়ে রূপের সঙ্গে প্রচুর রূপোও ঘরে আন্‌বার ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু তমালের এম্‌নি দুর্ভাগ্য যে, মরেও সে কাউকে খুসী করতে পারল না। ·········কেরোসিনে পুড়ে মরাটা নাকি আজকালকার মেয়েদের একটা ফ্যাসান হ'য়ে দাঁড়িয়েচে! কিন্তু কি দুঃসহ বেদনায় যে সে মরণকে জীবনের অবেলায় বরণ কর্‌লে, সে কথা কেউ ভাব্‌লে না!

* * * * *

মাস তিনেক পরে তেম্‌নি এক আলোকোজ্জ্বল সন্ধ্যায়, আনন্দ উৎসবের কলহাসির মাঝে বর-বেশী অজিত চল্‌ল তার মনোমত সুন্দরী ক'নেকে বিয়ে করতে।

নিমন্ত্রণ পত্র অবিশ্যি আমিও একখানা পেয়েছিলুম। কিন্তু এবার আর বর-যাত্রী হ'য়ে যাই নি।

অন্ধকার ঘরে বসেছিলুম চুপ করে·········কি জানি কেন, বার বার মনে পড়ছিল, শরৎ-ভোরের ঝ'রে-পড়া শেফালির মত ব্যথা-ম্লান, কালো একখানি মুখ; আর বেদনা আঁকা সজল-করুণ দুটী আঁখি···········

—:*:—

নীলকণ্ঠ

উপন্যাস

চার

ফাল্গুন মাস, অপরাহ্ণ। বসন্ত তাহার ফুল পাখী ও গান লইয়া আর যাহাকেই উন্মত্ত করুক, গোপালের মনের নৈরাশ্য ও হাহাকার দূর করিতে পারে নাই।

কলিকাতায় জনবিরল এক পথের ধারে যে ছোট বাড়ীটীতে সে থাকিত সেখানে কোকিলের পঞ্চম স্বর অথবা বকুলের সুরভি একেবারেই দুষ্প্রাপ্য ছিল। দুই চারিজন ব্যতীত বন্ধু বান্ধবও তাহার কেহ ছিল না। সে কাহারও সহিত মিশিতে ভাল বাসিত না। মাঝে মাঝে কেবল সুরথ ও নীরজার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাহাদের বাড়ী সে বেড়াইতে যাইত। তা'ছাড়া বেশীর ভাগ দিনই, অবসর সময়টা সে একাকী ঘরে বসিয়া নভেল পড়িয়া অথবা মাসিক পত্রিকার জন্য গল্প লিখিয়া কোনও রকমে কাটাইয়া দিত। কলেজে পড়াশোনাও আর

তার বিশেষ ভাল লাগে না। কচিৎ কোনও দিন মন হইলে কলেজ ঘুরিয়া আসে ; সতীর্থেরা তাহাকে দেখিয়া তাহার বৈরাগ্য আসিয়াছে, কিম্বা সে প্রেমে পড়িয়াছে এই লইয়া পরিহাস করে, তাহাতে সে উত্তর না দিয়া বরং অপ্রতিভ হইয়াই, তাহাদের লক্ষ্যপথ হইতে লুকাইয়া পালাইয়া আসিবার জন্ত ব্যস্ত হয়।

মালতীর উপর প্রতিশোধ লইবে সঙ্কল্প করিয়া গোপাল যে সকল মতলব ঠিক করিয়াছিল—কোন উপায়েই তাহাতে মালতীকে কাতর করা সহজ নয় বুঝিয়া সে নিজেই হার মানিয়াছে। তাহার ঘৃণা ও বিরক্তি সম্ভবতঃ মালতীর মনে বিন্দুমাত্র ছায়াপাত করে নাই। তাহাকে কাঁদাইবার কোন উপায়ই ত গোপাল ঠিক করিতে পারিল না। মালতীর চিঠির উত্তরে সে জবাব দেয় না। কচিৎ মাসের মধ্যে একদিন কি দু'দিন যখন বাড়ী যায় মালতীর সহিত কথা কয় না। ইহাতে তাহার কি যায় আসে?

মালতীর কথা মনে হইলেই গোপাল আত্মগ্লানি করিতে থাকে। তাহাকে বিবাহ করিয়া গোপাল ভাবে' সে নিজের উপরই মস্ত একটা অবিচার করিয়াছে। তাহার আপনার সুখ শান্তি সমস্তই হারাইয়াছে। মালতীর জন্ত, পিতার সহিত পর্য্যন্ত দেখা করিতে পারে না। অথচ মালতীর সে কতটুকু অনিষ্ট করিতে পারিল?

সুরথের বাড়ী গিয়া সে যতক্ষণ থাকে মনের ব্যথা ভুলিয়া যায়। সুরথ তাহার যথার্থ বন্ধু। দুজনে প্রবেশিকা পাশ করিয়া যখন প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি হয় সেই সময় হইতেই তাহারা পরস্পরকে ভাল বাসিয়াছে। সুরথের মত সরল অন্তঃকরণ খুব কম দেখা যায়। তাহার সাহচর্য্য পাইয়া গোপাল অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। সুরথের বাপ ছিলেন সিভিল সার্জ্জেন। নীরজার বাপ অনেকদিন আগে একটী ছেলে ও একটী মেয়ে রাখিয়া মারা যান। সুরথের বাপের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। নীরজা ও সুভাষকে পিতৃবন্ধু নিজের কাছে আনিয়া নিজের সন্তানের মত পালন করিয়াছিলেন। শেষকালে তিনি দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময় আসন্ন হইলে মৃত্যুর পূর্ব্বে সুরথের সঙ্গে নীরজার বিবাহ দেন। সুরথ বি, এ, পরীক্ষা দেবার জন্ত যখন প্রস্তুত হইতেছিল তখন একদিন তিনি খুব খানিকটা রক্ত বমন করিয়া মারা গেলেন। সুরথেরও আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। সে এক সরকারী আফিসে একটা চাকরী যোগাড় করিয়া লইয়াছিল।

নীরজার বিবাহের আগে হইতে গোপাল তাহার সহিত পরিচিত হইয়াছিল। এখন সেই পরিচয় ক্রমশঃ অধিকতর নিবিড় হইয়াছে। নীরজা গোপালকে আপন ভাইএর মত ভালবাসে। ইদানীং কয়েকদিন হইতে গোপাল তাহাদের বাড়ী যায় নাই। নীরজা তাহার সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া ভৃত্যের হাতে এক চিঠি লিখিয়া পাঠাইল।

"কল্যাণীয়েষু,

ঠাকুরপো! দশ পনের দিন হইল তুমি আস নাই, এজন্য তোমার বন্ধু অনুযোগ করছিলেন। আজ আমাদের বাড়ীতে সন্ধ্যার পর তোমার নিমন্ত্রণ রহিল। তুমি সকাল সকাল আসিও। আস্‌তে আপত্তি থাক্‌লে এই পত্র-বাহকের হাতে চিঠি পাঠিয়ে খবর দিতে ভুল' না।

ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ইতি

১৭ নং বিশ্বনাথ দত্তের গলি
২৩শে ফাল্গুন ১৩২০। } তোমার 'বৌদিদি।'

চিঠি পড়িয়া গোপাল নীরজার ভৃত্যকে বলিল "বৌদিদিকে বল' যে আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যাচ্ছি!"

গোপাল অতঃপর ভাবিতে লাগিল, সত্যই পনের দিনের মধ্যে সুরথদের বাড়ী না গিয়া অন্যায় করিয়াছে। সুরথেরা তাহার অদর্শনে ব্যথিত হয়।—তাহার সংবাদ না পাইয়া তারা কতই না ব্যাকুল হইয়াছে! জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া জগৎ ভুলিয়া সে আপনার ঘরের কোনটীতে বসিয়া দিন কাটাইতেছিল, কিন্তু তাহার দুঃখ ও কষ্টে সহানুভূতি জানাইবার জন্য বন্ধুর ব্যাকুল চিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে সে কি বোঝে নাই? গোপাল ভাবিল, সে মালতীকে ভুলিবে, সে আপনার অপমানের ব্যথাও ভুলিবে, মালতী পরাজয় মানুক আর না মানুক চাহিয়া দেখিবে না। সুরথ ও নীরজার ভালবাসা পাইয়া সে আপনার ব্যর্থ জীবনের বেদনা দূর করিবে।

গোপাল সে দিন নীরজার কাছে গিয়া বলিল "আমার কদিন থেকে বিশেষ কাজ পড়ায় আসতে পারিনি। এবার থেকে নিয়মিত হাজির হব অন্ততঃ যতদিন না তোমরা আপনারাই বিরক্ত হয়ে চা এবং পানের খরচ কমিয়ে ফেল!"

নীরজা বলিল "আমাদের খরচের ভয়ে তুমি আস না? তা'ত জানতুম না—! আমি মনে করেছিলুম—।"

"না বৌদি! ও একটা কথার কথা বলে ফেলেছি, তুমি রাগ কর'না। আসতে পারিনি কাজ ছিল।"

স্মরথ বলিল "সে কথা সত্যি। গোপাল আজকাল আর যে সে লোক নয় তা জেনো! তার কত কাজ আমি হিসাব নিয়েছি। শুনবে সমস্ত? বলছি! যতীশের সঙ্গে দৈবাৎ সেদিন দেখা হয়েছিল, তার কাছে শুনে আশ্চর্য্য হলুম উনি আর ক্লাসে পর্য্যন্ত উপস্থিত হবার সময় অথবা সুবিধা পান না। সে বলছিল, কোন এক তরুণী ষোড়শীর প্রেমে আত্মহারা হয়ে তোমার ঠাকুরপো হাবুডুবু খাচ্ছেন। ভাবলুম ব্যাপার তাহলে গুরুতর নিশ্চয়! বেড়াতে বেড়াতে আফিসের ফেরতা এই বুধবার ওর বাসায় গিয়েছিলুম। বাবু বাড়ী ছিলেন না! কোথায় গেছেন শিক্ষিত বেয়ারা কিছুতেই প্রকাশ করল না। প্রায় একঘণ্টা আমি সেখানে বসেছিলুম। ইত্যবসরে পিওন এক রঙীন খামে করা চিঠি দিয়ে গেল, কৌতুহল দমন করতে না পেরে ঠিকানার লেখাটা দেখলুম।—পরিস্কার ঠিক ছাপার মত সুন্দর, রমণীর হাতে লেখা, "শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু প্রিয়তমেষু!" যতীশের অভিযোগের অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ পেলুম। মহাত্মার দেখা না পাওয়ায় সবিশদ বিবরণটা অগোচর রইল।"

নীরজা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল "তাই অনেক কাজ?—তাহলে তোমার অপরাধ ক্ষমা করা যেতে পারে। কিন্তু আসল সময়ে খবর যদি না পাই, চির-জীবনের জন্য মুখ দেখাদেখি বন্ধ করব তা বলে রাখছি। আপাততঃ বলতে বাধা আছে কি, সুন্দরীটী কে?"

গোপাল সলজ্জ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল তুমিও যেমন বৌদি! এ সব যতীশদের বানানো। কলেজে কয়েকদিন যাইনি তাই ওরা প্রকাশ্যেই আমাকে কয়েকটা কথা বলেছিল। আমি মজা দেখবার জন্য ভান করে সন্দেহজনক উত্তর দিয়ে-ছিলুম। তারপর থেকেই সকলে এই সব গল্প রটাচ্ছে। সুরথ যে চিঠি দেখেছিল, সেটা ঐ সব ছেলেরাই গোপনে, আমার খরচে মজা লোটবার এক ফন্দী করে, প্রেমপত্র পাঠিয়েছিল। ওরা চায়, এমনি চিঠি আমার কাছে এবং অবশেষে আমি এখানে না থাকলে রি-ডাইরেক্ট করে বাবার কাছে পাঠিয়ে তাঁকে জানাবে—আমার নামের এই সব মিথ্যা কাহিনী!"

নীরজা বলিল "কিন্তু মিথ্যাই বা থাকে কেন? ব্যাপারটাকে সত্যি করেই ফেল না। তোমার বাবা দেশে একলা রয়েছেন ত? তাঁর কত কষ্টই না

হচ্ছে। তোমার যে ভাই বাড়ীতে থাকতেন, ভগবান তাঁকেও কেড়ে নিলেন! তাঁর বিয়ে হয়েছিল বলেছিলে! সে বৌদিও ত' তাঁর বাপের সঙ্গে দেশছাড়া হয়েছেন! তোমার বাবার মনোকষ্ট বুঝতে পার না কি? তোমার উচিত—"

গোপাল বলিল "ও সব উচিত অনুচিতের কথা এখন রাখ বৌদি! পড়া শেষ না করে আমি ও সব হাঙ্গামার ভেতর যাচ্ছি না।"

সুভাষ আপন ঘরে বসিয়া নিজের পড়া তৈরী করিতেছিল। পড়া শেষ হলে সেও আসিয়া গোপালদের কথোপকথনে যোগ দিল। সুভাষ গোপালের সম্বন্ধে নীরজাকে আর একটা নূতন খবর দিল। সে বলিল "দিদি! তুমি শোননি বুঝি, ছোটদা বিলেত যাবার যোগাড় করছেন।"

নীরজা সবিস্ময়ে বলিল "না! শুনিনিত! সত্যি ঠাকুরপো? প্রেম এবং বিলাত যাওয়া—দুটাই কি তোমার মতে গল্প? কিম্বা—এর ভেতর সত্য আছে?"

সুরথ বলিল "গোপাল! আমাদের গোপন করে তুই ভেতর ভেতর এতদূর অগ্রসর হতে চাস—এটা ভাল লক্ষণ নয়। এতদিনের বন্ধুত্বের দাবীটাও কি আমাদের মিথ্যে? তোর নিজের মতলবের কোন অংশই কি আমরা আগে হতে জানতে পাব না?"

নীরজা সুভাষকে জিজ্ঞাসা করিল "তুই জানলি কি করে?"

সুভাষ বলিল "অমরের দাদা ব্যারিষ্টার। অমরের কাছে সেদিন জ্যামিতির একটা অনুশীলন জেনে নিতে গিয়েছিলুম। ছোটদাও গিয়েছিলেন। অমরের দাদার কাছে ছোটদা সমস্ত খবরাখবর জেনে নিচ্ছিলেন, কত টাকা খরচ, কেমন দেশ, কতদিন পড়তে লাগে এই সব!"

নীরজা বলিল "ঠাকুরপো! আমাদের কি এতই পর মনে কর? একদিনও নিজে একথা জানাও নি!"

গোপাল অপরাধীর মত সসঙ্কোচে বলিল "এর জন্য তোমরা আমায় সত্যি দোষ দিতে পার।—আমি ইচ্ছা করেই বলিনি। সুভাষ জানতে পেরে গেছে—আমার কিন্তু ইচ্ছা ছিল না—যাবার আগের দিন পর্য্যন্ত কেউ খবর পায়!"

নীরজা জিজ্ঞাসা করিল "কারণ?"

গোপাল উত্তর করিল "প্রথমতঃ—আমার যাবার সম্বন্ধে আমি নিজেই এখনো কোন ঠিক সঙ্কল্প করি নি।"

সুরথ জিজ্ঞাসা করিল "আর—দ্বিতীয়তঃ ?"

গোপাল বলিল "জানালেই, তুমি না কর, বৌদি বাধা দেবেন, সন্দেহ নেই।"

নীরজা বলিল "বাধা দেব ? কেন ? তোমার নিজের ভবিষ্যতের উন্নতি করতে যাচ্ছ—এতে বাধা দেবার ত' কিছু নেই। তবে........অনেকদিন দেখতে পাব না, এই যা দুঃখ !"

নীরজার ঠোঁট কাঁপিতে ছিল। বাধা দেবে না বলিলেও তার অন্তর সে কথায় নিরপেক্ষ থাকিতে পারিতেছিল না। খানিক চুপ করিয়া সে বলিল "নাই বা গেলে ?"

"ওই জন্যই বলছিলুম—!"

"বেশ !......যেও !......"

"রাগ করলে বৌদি ?"

"না—রাগ করব কেন ? যেও ! ভগবান তোমায় দেখবেন। আর যাই কর আমাদের একেবারে ভুলে যেও না। মাঝে মাঝে এক আধখানা চিঠি দিও। কি আর বলব ?........আর এক কথা ! বাপের সম্পূর্ণ মত না পেলে যেও না। আমার মাথার দিব্বি রইল।"

"নিশ্চয় ! তাকি যেতে পারি ? তবে এখনই জানাব না। সব ঠিক করে তারপর বলব—।"

সুরথ জিজ্ঞাসা করিল "কি পড়বে সেখানে ?"

গোপাল বলিল "আই সি এসের জন্য চেষ্টা করব।"

সুরথ বলিল "তোমার বাপ যে রকম গোঁড়া শুনেছি, মত দেবেন ?"

"পায়ে হাতে ধরে দুদিন কাঁদলেই মত দিতে হবে। আর কদিনের মামলা বলনা ! আড়াইটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে !"

নীরজা বলিল "যাই দেখি গে ঠাকুর এতক্ষণে কি করলে !"

সুরথ বুঝিল সে আপনাকে সামলাইতে পারিতেছিল না। তার চোখ দিয়া ব্যথার অশ্রু বিন্দু বিন্দু দেখা দিতেছিল। সে খানিক নির্জ্জনে কাঁদিয়া প্রাণটাকে হাল্কা করিতে গেল।

গোপাল বিদেশ যাইবে শুনিয়া তাহার নিজেরও কষ্ট হইতেছিল। তবে, নীরজার দিকে চাহিয়া তার ব্যথা বুঝিয়া সে আরও কাতর হইয়াছিল। এতদিনের পরিচয়ে নীরজা গোপালকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়াছিল, ইহা সে জানিত।

গোপাল সুরথকে বলিল "এই জন্যই মেয়েদের সামনে এসব কথা জানাতে নেই। আমি বুঝতে পারছি বৌদি আমার যাবার কথাতে বিচলিত হয়েছেন।"

সুরথ বলিল "তা সম্ভব। ও আপন বলতে আমাদের কজনকেই শুধু জানে বৈত নয়।"

নীরজা অল্পক্ষণ পরেই তাহাদের পাতা করিয়া দিয়া লুচি তরকারী প্রভৃতি পরিবেশন করিতে আসিল। তাহাকে প্রকৃতিস্থ বলিয়াই মনে হইল। সুরথ গোপালকে জনান্তিকে বলিল "যতটা ভয় করেছিলুম তা নয়। ভাববার আর কিছু নেই।"

গোপাল সে রাত্রে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে ছিল নীরজার আর কোন কথাতে চঞ্চলতা প্রকাশ পায় নাই।.........

পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া সে যখন বাড়ী ফিরিল, অদূরে গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া তখন এগারটা বাজিতেছিল।—

পাঁচ

বৃন্দাবনের শরীর ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতেছিল।

মালতীর শুশ্রূষায় তাঁর কোন কষ্ট সহিতে হয় না। কিন্তু মনের আগুন ত' নিভিবে না। তিনি কেবল ভাবেন, মৃত্যু আসিয়া কবে তাঁহার সকল যন্ত্রণা ভুলাইয়া দিবে!

মালতী স্বামীকে চিঠি লিখিয়াও জবাব পায় না। বৃন্দাবন ডাক্তার কবিরাজ কিছুই ডাকিতে চান না। বলেন, "সময় হয়ে আসছে, আর কতকগুলো ছাই-ভস্ম খেয়ে কি হবে? এখন শুধু মায়ের নামই সকল অসুখের ওষুধ।"

মালতী একাকী কি যে করিবে বুঝিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে।

সুলতাকে আসিবার জন্য কাশীতে চিঠি দিয়াছিল। মালতীর পিতাও বড় মেয়েটীকে সঙ্গে লইয়া প্রিয়নাথের আশ্রয়ে কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনি মালতীকে লিখিলেন, "সুলতার মা মুমূর্ষু, এ সময় কাহারও দেশে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা সকলেই ব্যস্ত রয়েছি।"

মাসখানেক পরে শ্রীনাথ মালতীকে আর একখানা পত্র লিখিলেন "সুলতার মা মারা গিয়েছেন। সুলতাও প্রিয় উপর্য্যুপরি শোকে পাগলের মত হয়েছে। কি করে তাদের সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারছিনা।"

আরও কিছুদিন পরে চিঠি আসিল "প্রিয় ও সুলতা কাশী ছাড়িয়া হঠাৎ একদিন কোথায় চলে গেল আমাদের কিছুমাত্র জানালে না! তাদের বাড়ী ঘর আগলাবার জন্যই হয়ত আমাদের রেখে গেছে! তাদের বিহনে আমার এখানে থাকা দুঃসহ বোধ হচ্ছে। ভাবছিলুম তোদের কাছে ফিরে যাই সমস্ত চাবিবন্ধ রেখে। কিন্তু তারা যদি ফিরে আসে সে আশাও ছাড়তে পারছিনা। তাদের প্রতীক্ষায় বসে রইলুম।"

ইহার পর আরও দু তিনখানা চিঠি শ্রীনাথ মালতীকে লিখিয়াছিলেন। শেষে হঠাৎ তাঁর চিঠি আসাও বন্ধ হইল। ক্রমাগতঃ চিঠি লিখিয়াও দু' তিনমাসের মধ্যে মালতী কোন জবাব পাইল না। সুলতা অথবা পিতা, কাহারও কোন খবর না পাইয়া সে অস্থির হইয়াছিল। বাড়ীতে শ্বশুরের অসুখ—এসময় কাশীতে গিয়া সঠিক সংবাদ জানাও ত' সম্ভব হয় না!

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর বৃন্দাবন সে দিন একটু সুস্থ হইয়াছিলেন।

মনটাও ভাল ছিল। অনেকদিনের পর লাঠি ধরিয়া হাঁটিয়া ঠাকুরবাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পথের মধ্যে পরিচিত যাহাদের সঙ্গে দেখা হইল কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রামের লোকেরাও তাঁহাকে পুনশ্চ সুস্থ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

বেলা ন'টা দশ'টার সময় ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলে মালতী গাড়ু, গামছা আনিয়া দিল। হাত পা ধুইয়া তিনি উপরে উঠিলেন। মালতী একটী রেকাবে কয়েকরকম ফল ছাড়াইয়া সামনে ধরিল। সেগুলি আহার শেষ হইলে বিশ্রামের জন্য তিনি পুনরায় খাটে গিয়া বসিলেন।

খানিকপরে মালতী ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল "বাবা! ভাত বাড়া হয়েছে।"

বৃন্দাবন সহস্র রকম চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন। মালতীর কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "যাচ্ছি মা। চল।"

পরক্ষণেই কিন্তু আর একটী মানুষকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁর বিস্ময়ের সীমা রহিলনা। আনন্দের আতিশয্যে বলিলেন "একি গোপাল? এসেছিস্?"

গোপাল তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিয়া অপরাধীর মত একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃন্দাবন বলিলেন "ওরকম কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? এতদিন পরে এলে, হাসিমুখে কথা কও। ভাবছিস্ আমি তোর ওপর রাগ করে বসে আছি? তা নয় রে।

ছেলেরা যত অবহেলাই করুক বাপের রাগ থাকেনা, যখন শেষকালে তারা অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসে মাপ চায়। যাও মালতী! গোপালেরও আমার সঙ্গে খাবার বন্দোবস্ত করে এস। ততক্ষণ আমরা এখানে বসে গল্প করি।"

মালতী বলিল "তোমার রোগা শরীর, বাবা! তুমি আগে খেয়ে এস। আমি সমস্তই তাড়াতাড়ি ঠিক করে রাখছি!"

বৃন্দাবন হঠাৎ রাগিয়া বলিলেন "ঐত' তোর দোষ মা। যা বলি, কখনো বিনা ওজরে শুনবি নি!"

মালতী চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন বলিলেন "কেমন আছিস্ তুই? পড়ে' পড়ে' একেবারে শরীরটা মাটী করে ফেলেছিস্ দেখছি। আমাদের একখানা চিঠিরও কি জবাব দিতে নেই? একটুখানি মাত্র,—এই, তুই ভাল আছিস, এমনি দুচারটে কথা—লিখে পাঠালেও বুঝতুম্। তোদের ত আর মায়া দয়া নেই। আমরা ভেবে হাঁফিয়ে মরি!"

গোপাল বলিল "ভাল আছি আমি। অসুখ কিছু নেই। আর এই দুটো বছরের জন্যে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে বাবা। তার পর তোমার কাছে সমস্ত দিন এসে বসে থাক্‌ব। সারাটী দিন তোমার সঙ্গে গল্প করে কাটাব। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে——!............তবে, তুমি যদি রাগ কর.........."

বৃন্দাবন বলিলেন "না, না, আমি বারণ করছিনা। তোর যা ইচ্ছা করিস্। আমি মোটেই বাধা দেবনা। শুধু এইটুকু আমি বলি—যে আমাকে এত ভাবাসনি। মাঝে মাঝে চিঠি দিস্,—আর পারিস্ ত' একবার করে দেখে যাস্। না দেখতে পেলে প্রাণটা বড্ডই ব্যাকুল হয় রে!"

"আস্‌ব বাবা। সময় পেলেই আস্‌বো। তুমি মনে ক'রনা যে আমি তোমাদের মায়া কাটিয়েছি। তোমাদের জন্য আমার খুবই মন কেমন করে। আর দুবছর পরেই একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে আসব।"

মালতী আসিয়া ডাকিল "বাবা! তোমরা এস!"

গোপাল ও বৃন্দাবন আহারে বসিলেন। বৃন্দাবন যতটুকু সময় গোপালকে কাছে পাইলেন নানারকম প্রশ্নে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। আজিকার এই সময়টুকু তিনি কতদিনের প্রতীক্ষার পর পাইয়াছেন! এই দিনটা তাঁর যেন কিছুতেই না ফুরায়!

গোপাল সে দিন আর কলিকাতায় ফিরিলনা।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিতার সহিত গল্পগুজব করিয়া সে আপনার কক্ষে শয়ন করিতে গেল।

মালতী তাহার পাশের ঘরে শুইত। আজও সেইখানে যাইতেছিল, গোপাল তাহাকে ডাকিল। সে যারপর নাই বিস্মিত হইয়া স্বামীর কাছে আসিল। বিবাহের পর হইতে এ পর্য্যন্ত গোপাল কখনও তাহাকে এরকম আদর করিয়া ডাকে নাই। সে নিজের কাণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

"মালতী ?"

"ডাকছ আমাকে ? কেন ?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার ? হাঁ, তোমাকেই ডাকছি। বস আমার কাছে। তোমাকে কয়েকটী কথা আমার বলবার আছে। অত দূরে নয়—কাছে এস।"

মালতী বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহাকে বলিবার মত এমন কি কথা স্বামীর থাকিতে পারে সে জানিত না।

গোপাল বলিল "তুমি আমায় ঘৃণা করতে পার কিন্তু তোমার উপর আমার একটুও অধিকার আছে এটা স্বীকার করতেই হবে। তোমার ভালবাসা আমি চাই না—তা বলা বাহুল্য। কিন্তু আমার দাবী যেটুকু তা আদায় করে নেব, তুমি আপত্তি কর না।"

"কি চাও তুমি ?"

"আমার অধিকারের দাবীতে আমি তোমার কাছে চাচ্ছি পাঁচহাজার টাকা আমার বিশেষ দরকার পড়েছে, তোমায় যোগাড় করে দিতে হবে। কিন্তু বাবা না জানতে পারেন। বাবাকে বললেই তিনি জিজ্ঞাসা করবেন—'কেন', কি দরকার',—অত প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবনা। তোমার কাছেও আমার এই দরকারের কৈফিয়ৎ দেবনা। টাকা আমার চাই! আজ রাত্রের মধ্যেই যোগাড় করে দিতে হবে।"

মালতীর বিস্ময় ভাঙিল। প্রথমে স্বামীর আহ্বানে সে যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিল সেটা পরিহাস ও ছলনা!

মালতী বলিল "টাকা, বাবাকে না বললে আমি কোথায় পাব ? আমার কাছে ত কিছু নেই!"

"তা শুনতে চাই না ! ঠাকুরের দরকার—কিম্বা অন্য কিছু বলে আদায় কর।"

তাঁর কাছে মিথ্যা বলব ?—আমায় মেরে ফেললেও পারবনা।"

"তোমার যে সব গহনা আছে দাও।"

"সে সমস্তই যে বাবার অনুমতি নিয়ে ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করে রেখেছি। তাঁর যখন দরকার পড়বে দেব, তা নইলে আমার বা আর কারও জন্য তা ব্যবহার করব না। তাতে হাত দিলে অধর্ম্ম হবে।"

"ন্যায় হোক অন্যায় হোক ধর্ম্ম হোক অধর্ম্ম হোক আমায় তা সমস্ত দিতেই হবে। অথবা বাবার বাক্স খুলে টাকা নিয়ে এস। বোলো—চুরি গেছে।"

"চুরি করব ?.........ছিঃ !.........."

"আবার ?............আচ্ছা যাও !"

"বাবাকে বলনা কেন ? তিনি তোমার কোন্ কথাটা না শোনেন !"

"বক্তৃতা দিতে হবে না। তুমি যাও !"

মালতী প্রস্থান করিল।

গোপাল ভাবিতে লাগিল। মালতীর দ্বারা কোন সাহায্য হইবে না। তাহাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। বিলাত যাইতে হইলে অন্ততঃ দশহাজার টাকা যোগাড় করা দরকার। কলিকাতার বাড়ীটা বাঁধা দিয়া পাঁচ হাজারের বেশী পায় নাই। এই সব সঙ্কল্পের কথা পিতার কানে উঠিলে তার যাওয়া দুঃসাধ্য হইবে। বিলাত যাবার প্রস্তাব তিনি কিছুতেই অনুমোদন করিবেন না। স্নেহের খাতিরে এযাবৎ যতই তিনি সহ্য করুন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মনে এতটুকুও অবজ্ঞা সহিবেনা একথা গোপাল জানিত। হয়ত এর পর কলিকাতায় থাকারও প্রশ্রয় দেবেন না। কাজেই মতলব গোপন রাখার প্রয়োজন। মনে করিয়াছিল মালতী তাহাকে ভয় করিয়া টাকা আনিয়া দিবে। তাহার কাছে প্রত্যাখ্যাত হইয়া গোপাল যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইল। মালতীকে তাহার অবাধ্যতার শাস্তি কেমন করিয়া দিবে, এবং সেই রাত্রের মধ্যেই আবশ্যক টাকা কেমন করিয়া যোগাড় করিবে, ভাবিতে ভাবিতে একটা মতলব তাহার মাথায় আসিল। দেওয়ালের ঘড়িতে দেখিল তখন রাত সাড়ে বার। নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়া সে ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিয়া রহিল। আরও একঘণ্টা অতীত হইলে সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। গোপালের ঘর হইতে মালতীর ঘরে যাইবার

জন্য মাঝখানে এক দরজা ছিল। সেটা চাবি বন্ধ করা থাকিত। গোপালের কাছে সে চাবি ছিল। সেটা খুলিয়া সে আস্তে আস্তে মালতীর ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঘরে আলো জ্বালা ছিলনা। গোপাল নিজের লণ্ঠন লইয়া আসিল। মালতীর দিকে চাহিয়া দেখিল, সে প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার বিছানার ধারে গিয়া গোপাল তাহার আঁচল হইতে চাবির গুচ্ছ খুলিয়া লইল। সেই চাবি দিয়া মালতীর বাক্স খুলিল। দামী হীরা ও মুক্তার গহনা যে কখানা ছিল, সব জামার পকেটে গোপন করিল। তারপরে সে তাড়াতাড়ি বাহির হইতে যাইবে এমন সময় দেখিল ফাঁদে পড়িয়াছে। সে যে দুয়ার খুলিয়া আসিয়াছিল তাহা বাহির হইতে কে শিকল আঁটিয়া দিয়াছে। অন্য দুয়ারগুলিও বাহির হইতে বন্ধ। বুঝিল চতুরা মালতী ইতিমধ্যে উঠিয়া এই সব করিয়াছে। হয়ত বা সে তাহার পিতাকেও এখনি জাগাইয়া দিবে। গোপাল মুস্কিলে পড়িল। কেমন করিয়া পলাইবে? পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। এসময় যদি মালতীকে কাছে পায় তাহাকে মারিয়া ফেলিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না এমনি তার মনের অবস্থা। মালতী কাছে নাই তাহার কিছু করিতে পারিলনা। অগত্যা ক্ষুব্ধরোষে সে দুয়ার ভাঙিবার জন্য পদাঘাত করিতে লাগিল।

মালতী হাসিয়া বাহির হইতে বলিল, "এরকম নির্ব্বোধের মত চেষ্টা ক'র না। দুয়ার ত ভাঙবেই না—বরং বাবা জেগে পড়বেন। যেটা বেশী ভয় করছ তাই হবে!"

মালতীর হাসি ও বিদ্রূপ অনুভব করিয়া গোপাল ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিল না। পিতা দেখিতে পাইবেন—আর সে ভয় করিলে চলে না। যেমন করিয়া হউক বাহির হইয়া আগে মালতীকে খুন করিবে তারপর অন্য কাজ। সে আরও জোরে পদাঘাত করিতে লাগিল।

কিন্তু দুয়ার ভাঙিল না। সে হতাশ হইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

শ্রী.............................

——(:০:)——

বঞ্চিত

—হুমায়ুন কবির।

আমি যারে ভালবাসি সে আমারে না বাসিলে ভাল
অকস্মাৎ নিভে যায় আঁখিপটে নয়নের আলো,
অকস্মাৎ অন্ধকার হয়ে আসে উজ্জ্বল দিবস,
হর্ষোদ্বেল হিয়া মম অকস্মাৎ নীরব বিবশ।
হাসিগান পরাণের নিভে কেন যায় নাহি জানি,
অবসন্ন হয়ে আসে ছিন্ন বীণা হৃদয়ের বাণী,
কেন এই ব্যথাতুর আঁখি মেলি' অপরের পানে
ভিক্ষা-সকরুণ চোখে চেয়ে থাকা ব্যাকুল পরাণে?
বারে বারে হিয়া ভরি জাগে মম বিদ্রোহের রোল,
সে আগুণ নিভে যায়, নেমে আসে অশ্রুর কল্লোল,
তিক্ত ব্যথা, অভিমান, হিয়াতলে জ্বলে নিশিদিন
সুখের স্বপন শেষে ক্ষুব্ধ মম চিত্ত শান্তিহীন।
হেমন্তের চন্দ্রারাতি, মেঘহীন সুনীল গগন—
হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে কেঁদে ফিরে পথিক-পবন।

——:•:——

ঝড়

—শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভাঙা বেড়ার গায়ে রঙ্‌বেরঙের ফুল ফোটে।

নেপাল বলে, ফুলত' ঝরবে বলেই ফোটে। গেঁথে মালা করনা মামী,—?

মামী বলে, দুর্‌ ড্যাক্‌রা, এই বয়েসে আবার মালা গাঁথব কার জন্যে।

তবু কুড়ি পেরোয় নি,—বলিয়া নেপাল হাসে।

না পেরোক। মামার বয়েস হিসেব করেছিস? কত ঠাওরা দিকি—

দু কুড়ি দশ, কি তিন—

তিরিশ বছরের তফাৎ কখনো হয়! বয়েস আমার ঢের বেশী—

দুষ্টুমি করিয়া নেপাল বলে, মামার বয়েসে তোমার বয়েস! আচ্ছা, কুঞ্জ মামাকে জিগ্‌গেস করব—

গম্ভীর হইয়া রূপসী বলে, খবরদার! মামার নাম করিলেই মামী জ্বলিয়া যায়। বয়সটা পঞ্চাশ হইলে কি হয় কুঞ্জ মাটী কোপায়। কুঁড়ের পাশের জমীটায় ভোর হইতে তার কোদালের কুপকাপ সুরু হয়। সেইখানেই শাক ভাত খায়, আলের বুকে উবু হইয়া বসিয়া হুঁকায় টান মারে।

খানিক পরে বাড়ী ফিরিয়া নেপাল দেখে মামী মালা গাঁথিতে বসিয়াছে। খসিয়া পড়া আঁচলটার উপর একরাশ ফুল লইয়া রূপসী ঘরে ঢুকিবার পথটীতে বসিয়া মালা গাঁথিতেছে।

হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, ইস্‌, এযে সত্যি—

ঝরে যাবে, তার চেয়ে এই ভাল। গাঁথা শেষ হইলে আপন মনেই বলে, কি হবে—নদীর জলে ফেলে দিইগে—

তার চেয়ে আমায় দাওনা, ফেল্‌তে যেতে হ'বেনা, নেপাল বলে।

নে'গে যা'—বলিয়া রূপসী মালাটা নেপালের পায়ে ছুঁড়িয়া দেয়।

বৃন্দাবনের কথা মনে পড়ে·········বলিয়া নেপাল ছুটিয়া পালায়। রূপসী

মুখ রাঙা করিয়া নেপালের উদ্দেশে গাল দেয়, পোড়াকপাল! মামী নইলে ঠাট্টা হ'বে কার সঙ্গে.........

রাত্রে চ্যাটাই পাতিতে পাতিতে কুঞ্জ বলে, বে-সহবৎ সহ্য করব না বউ। চোয়াল বেঁকিয়ে দেবো।

কিসের বে-সহবৎ দেখলে?

ওই ছোঁড়াকে কালই দূর করে দোবো—ছুঁচো!

আমার কথায় ত' আনোনি ও'কে। দাওনা দূর করে, আমিই কি ধরে রেখেচি। মামা ত' নিজে—

কুঞ্জর বেশী কথা বলা অভ্যাস নয়, চ্যাটাই পাতিয়া শুইয়া পড়ে। পরিশ্রান্ত চোখ দুটী অনতি কালের ভিতর ঘুমে মুদিয়া আসে।

জ্যোৎস্না-শিথিল বালুচরটা খড়ো ঘরের জানালা দিয়া দেখা যায়, চন্দন রেখার মত শুক্লানদী তার কোল দিয়া বহিয়া যায়। নেপাল ঘুম ভুলিয়া অনিমিষে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে। নদীর জল, বালুচর, পাশের চষা-মাঠ সব চাঁদের আলোয় মিলনের স্রোতে ভাসিয়া যায়। নিসর্গের এই বাসর-রাত্রে সে আপনার অনাগত বাসর রাত্রির স্বপ্ন দেখে!

পাশের ঘরে, চ্যাটাইয়ের উপর, কুঞ্জর পাশে পড়িয়া আর একটী প্রাণীর চোখে ঘুম আসেনা!

মামী কখন ঘুমায়......কি করে......কে জানে!

ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে জ্যোৎস্না মরিয়া দিনের আলো হইয়া গেছে। রূপসী মাটীর ভাঁড় ভরতি করিয়া উষ্ণ দুধ আনিয়া দেয়; মুড়ীগুড়—পরম পরিতোষের সহিত ভোরের ভোজন শেষ হয়।

দুপহরে মামী সামনে বসিয়া খাওয়ায়। মটর ডালের বড়ী দিয়া কুচা চিংড়ীর অম্বল রাঁধিতে ভুলিয়া গেলে ভয়ে ভয়ে বলে, রাগ করিসনে ভাই—

ভাই বল্‌লে! ভাগ্‌নে হইনা—? দাঁড়াও, মামার কাছে নালিশ করব। মুখে নেপাল এই সব বলে। মনে ভাবে রাগ করিবার সে কে! গলগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। গল্প করিতে করিতে দেড়কুণকে চালের ভাত শেষ হইয়া যায়। মামী হাসিয়া বলে, কাজে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে—

মিথ্যে কথা। আমি ওপারের কলে কাজ খুঁজচি—

আচ্ছা দেখি কতবড় মুরোদ—বলিয়া রূপসী হাসে। হাসিলেও নেপালের

কাজে যাওয়ার সম্ভাবনাটাও সে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না। এমনি করিয়াই নদী-পারের একটী কুঁড়ের ভিতর দ্বিপ্রহর বেলাটী কখনো করুণ, কখনো মধুর হইয়া উঠে।

কুঞ্জ মাঠে বসিয়া কচি কচি শাক-পাতা দেখে আর হাসে। মাঠের অন্তহীন সজীবতা ঐটুকুর মধ্যেই রূপ ধরিয়া ওঠে। সীমার বাঁধনে অসীম—এই উপমাটা দিতে চায়; ভাষার দৈন্যে সম্ভব হয় না। মাঠেই কুঞ্জর আনন্দের খনি লুকানো। নেপাল আসিয়া বলিল, কুঞ্জ মামা, আমি কলে যাবো,- বসে খাওয়া ভাল দেখায় না। তারা আমার ঘর বাড়ীর খোঁজ চায়।

কাঁধের দাদ রগড়াইতে রগড়াইতে কুঞ্জ বলিল, ঘর বাড়ী আবার কোথা! তোর মা আমার কুঁড়ের একটা ঘর নিয়ে থাকত। কলেরায় মাগী মারা যায়! প্রথমপক্ষের পরিবারটা তোকে পুষেছিল। তোর মা আমায় দাদা বলে ডাকত। এইত পরিচয়, এই ঘর, এই বাড়ী—

প্রাণের মধ্যে কোথায় একটা গুরুভার চাপিয়াছিল, সেটা পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গেল।

নেপাল কলে কাজ করে। রূপসী পাঁচটার ভেঁা বাজিবার সঙ্গে উঠিয়া নেপালকে তোলে। কোঁচড়ে মুড়ী ঢেলাগুড় বাঁধিয়া দেয়।

কাজের ভিড়ে বাড়ীর কথা মনে থাকে না। অবিশ্রাম চীৎকার, কল চলার আর্ত্তনাদ শুনিয়া পাগল হইবার অবস্থা হয়। মুড়ী গুড় দেখিলেই একজনকে মনে পড়ে। নদীর ওপারে আর একজনের সময় দীর্ঘ হইতে দীর্ঘ হইতে থাকে। কুঞ্জ খুসীই হয়!

পরব দিনে কল বন্ধ থাকে। রূপসী বলে, এইবার ন্যাপলার একটা বউ আনতে হ'বে। কদ্দিন আর হাঁড়ি ঠেলবো বাপু!

বেশত, আনোনা। দেখো, সে এলে তোমায় খড়টী পর্য্যন্ত কাটতে দেবনা—

দেখা যাবে, বিয়ের আগে সবাই তাই বলে। তারপর হাতে পেলেই হরিনামের মালা—

নেপালের বিবাহের জন্য ব্যস্ততা কিছু নাই। কলের লোকগুলাত বিবাহের নাম শুনিলেই ক্ষেপিয়া উঠে! সে কেন ক্ষেপেনা বুঝিতে পারেনা।.........তবু পুরুষ মানুষ বিবাহ একটা না করিলে নাকি হাতের জলশুদ্ধ হয় না। কুঞ্জ ত' চারবারের বার এইটাকে ধরিয়া আনিয়াছে।

নেপাল একদিন প্রস্তাব করিল, মামী, মাইনে পেলে একদিন বাকৃদেবীতলায় যাব। তুমি যাবে ?

হেঁটে ?

হেঁটে কেন ? ডিঙিতে, আমি বাইব—

না বাবু তোমার মামা শেষে বকবে, কাজ নেই—

লুকিয়ে যাবে ?………

চোখ পাকাইয়া রূপসী বলিল, দুর্………

নেপাল উপায়ের প্রায় সব ক'টা টাকাই মামীর কাছে জমা করে। বউয়ের ভারী মল, ডুরে শাড়ী কিনিবার কথাটা মনেই রাখে। হঠাৎ একদিন মামী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, দু'কুড়ি টাকাত' জমল, দুটো জিনিব গড়িয়ে দে দেখি—?

পরিহাস মনে করিয়াই নেপাল বলিল, বলনা—কি জিনিষ—

পায়ের দুটো চুটকী, আর নাকছাবী একটা—

আচ্ছা দেব,—বলিয়া নেপাল রূপসীর পায়ের আঙুল মাপিতে সুরু করিল।………চাষার ঘরে এমন পা দুর্লভ। যেন আলপনায় আঁকা লক্ষ্মীর চরণ দুটী।…………

সেই রাত্রে পাশের ঘর হইতে নেপাল শোনে মামীর বিরুদ্ধে একটা রুদ্ধ গর্জ্জন।—

মাথা মুড়িয়ে বিদেয় করে দেব শালী, ছোটলোকের বেটী। জানিস তোর আগে তিনটেকে—

আর একটা মৃদুকণ্ঠের প্রশ্ন শোনা যায়, কেন কি করলুম—?

কেন!………দেখে গেচে স্যাপলা তোর পা ধরে—

তারপর একজনের অস্পষ্ট ক্রন্দন ছাড়া কিছু শোনা যায় না।………

মামী মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নেপাল তাহাকে চুটকী নাক্‌ছাবী একদিন দিবেই। এতদিনের স্নেহেরও ত' একটা ঋণ আছে—আর কিছু না থাক্।……সেটা নেপাল অস্বীকার করিবে না।

সেদিন কুঞ্জ নেপালকে ডাকিয়া বলিল, মেয়ে দেখেচি, বিয়ে কর্—। বেশী কিছু দিতে থুতে হ'বে না। দু'খানি কাঁসার গহনা মাত্র!

নেপাল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, মামীকে বলেছো ?

হুঁ.........নাই বা বল্লুম তাকে। মেয়েও সুন্দরী—তোর মামীর গায়ের রং,—টাকার যোগাড় দেখ্—

নেপাল রূপসীকে যখন তখন বলে, এবার মামীর হাতের কাজ ফুরোলো। বউ আনচি, একেবারে তোমার মত—কুঞ্জমামা বলেচে—

আনচিস্ ত' কোন যুগ থেকে! মুখেই কেবল,—

এবার কাজেও, কুঞ্জমামা সম্বন্ধ করেচে।

বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, রূপসী ঘুরাইয়া প্রশ্ন করে, সত্যি না মিচে—?

মামাকে জিজ্ঞেসা করো।

কেন, তাকে আমি জিজ্ঞেস করতে গেলুম কেন! তোর বিয়ে সেত' করবে না। শুনি তোর মুখেই—হঠাৎ সে কথাটা ছাড়িয়ে দিয়া একটা অসংলগ্ন প্রশ্ন করে, আমার চুট্‌কী কবে দিচ্চিস বল্?

আগে বিয়ে হ'ক্—বলিয়া নেপাল হাসে।

না, দুষ্টুমি রাখ্, চুট্‌কী আমার চাইই—

রূপসীর কণ্ঠে এমন সুর আগে কখনো বাজে নাই। নেপাল থতমত খাইয়া যায়—

মামী চাপা গলায় বলে,......নেমকহারাম।......অকারণেই রাগ হয়। রাগ করিতে গিয়া চোখে জল আসিয়া পড়ে!

বিবাহের খরচে প্রায় সব ক'টা টাকাই বাহির করিতে হইল। বউ আসিল। রঙ্‌টা চাষার ঘরের পক্ষে ফরসা বলিলে অপরাধ হয় না; তবে দেহটা যেমন হাড্ডিসার তেমনি অনাবশ্যক দীর্ঘ। চোখের গর্ত্ত দুইটা প্রায় ওপর ঠোঁটের কাছে বরাবর নামিয়া আসিয়াছে—

মামী আর নেপালের কোঁচড়ে মুড়ি গুড় বাঁধিয়া দেয় না। ইচ্ছা করিয়াই বেলা করিয়া ওঠে। বউ আসিয়াছে খাটুক্‌না সে!

অনেক দিনের অভ্যাস! কলে খাটিতে খাটিতে মুড়িগুড়ের জন্য চোখ ফাটিয়া জল আসে! রূপসী কেন এমন কঠোর হইল তাই বসিয়া বসিয়া ভাবে! বিবাহ করিয়াছে—তাই কি? অথচ এ' বিবাহে সব চেয়ে উৎসাহ যে একদিন তারই ছিল!............দুটী মুড়ি মুখে না দিলে যে থাকা যায় না, তাকি সে বোঝে না? রাগ হয়—যদি চিরকাল ব্যবস্থা রাখিবে না তবে অভ্যাস করাইবার কি দরকার ছিল!

পিলি নেপালকে ফুস ফুস করিয়া বলে, মামী মাগী মস্ত হারামজাদা পেট ভরে খেতে দেয়না। চলো তার চেয়ে—আমার বাপের কাছে গিয়ে—

পঁচিশ বৎসরের স্নেহনীড় ছাড়িয়া যাইতে ভালও লাগেনা, ইচ্ছাও হয়না। দু'দিন আসিয়াই সে তাকে রূপসীর পর করিয়া দিতে চায়—বউয়ের উপর রাগ হয়। সংক্ষেপে উত্তর দেয়—না।

কল হইতে ফিরিয়া দুটী ভাত মুখে দিয়া নেপাল সেই যে নিজের কুঠরীতে ঢোকে, সারারাত আর বাহির হয় না। ঘরের ভিতর দিবারাত্র ফিস্ ফিস্ শুনিতে শুনিতে রূপসী অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কালেভদ্রে কেহ যদি পাড়া বেড়াইতে আসে, তাহাকে বলে, এমন বউমুখো ছিঃ। দিনরাত খোপের মধ্যে বসে বসে দুটীতে বক্ বক্ করচে—। হ্যাঁগা, বাড়ীতে আমিত' রয়েচি, লজ্জা করতে কি নেই।

ঘরের ভিতর নেপাল লজ্জায় মরিয়া যায়, বলে. থাম বউ, মামী শুনতে পাচ্চে।

পিলি শুনিবার মেয়ে নয়, কলকল করে—আমাদের গাঁয়ের হরি ছুতোরের বউ.........কথা তার শেষ হয়না মরুভূমির জল গিলিবার তেষ্টা! নেপাল রাগ করিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে চায়। বউ কাপড় ধরিয়া বলে, সোহাগ দেখি ধরে না! তবু যদি সত্যির মামী হ'ত—

নেপাল পিলির মুখ চাপিয়া ধরে,.........ফের বলেচিস কি টাঙি দিয়ে সাফ করে দেবো! ছোটলোকের বেটী—

মানুষের অন্তরের স্বপ্ন, বাসনার ক্রন্দন—মানুষ বোঝেনা। দুটী মনের অন্তরে দূরত্বের তটিনী ঢেউ তুলিয়া বহিয়া যায়—কেউ কাউকে বোঝে না।

বর্ষাকাল, প্রায়ই বাদলা নামে। কুঞ্জকে সে কারণে প্রায়ই ঘরের মধ্যে বন্দী হইয়া থাকিতে হয়।

সেদিন দিনের আলোটুকু তরুশ্রেণীর পশ্চাতে নিভিয়া যাইবার পূর্ব্বেই আকাশ মেঘে মেঘে একাকার হইয়া গেল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষার ধারা নামিয়া আসিল।

হাঁড়ি হইতে ডেলা ভাত বাহির করিয়া কুঞ্জর পাতে দিয়ে রূপসী বলিল, এমন নেমকহারাম দুটী দেখিনি! সর্ব্বনেশে—

কুঞ্জ বাড়ীর ভিতরে একেবারে অনভ্যস্ত। জিজ্ঞাসা করে—কে?

তোমার ভাগ্নে। সাত তাড়াতাড়ি ধরে ভন্দর ঘটালে! ঐটুকু ছেলে—তার গলায় একটা হাতী ঝুলিয়ে দেওয়া। এখন কি ফল হয় দেখো—

বয়স ত' ওর দেড়কুড়ি হয়ে এল, বিয়ে করবে না ?

আমি কি বারণ করেচি, বিয়ে করুক না। তা বলে একি কাণ্ড! যেন গিলে খাবে—এমনি হাঁড়োল দুটো চোখ্! দেশে যেন আর মেয়ে ছিল না—রূপুসী টেনে আনলে।

শূন্য হাঁড়ির প্রতি চাহিয়া কুঞ্জ বলিল. ভাত কই আর। ওরা কি খাবে!

যা হয় এনে খাক, রোজগার করচে ত'। দোকান থেকে কিনে আনুক গে।

হঠাৎ একি খেয়াল!

খেয়াল আবার কি! বউ এসেচেন কাঠের পুতুল, কেবল গল্পই ত' শুনি। সংসারের একটী কাজে নেই। আর ঐ ছোঁড়া বিয়ের আগে বল্‌ত—বিয়ে একবার হ'ক মামী, খাটিয়ে খাটিয়ে মুখে রক্ত তুল্‌ব—

বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলে। কুঞ্জ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করে, কিন্তু তা'র জন্যে কান্না কেন বউ!

ব'কিও না বাপু, চুপ করে থাক। যে কথা বোঝ না, তার সম্বন্ধে কোনো কথা বলতেও যেয়োনা! এ তোমার বেগুণ আবজানো নয়।.........কাঁদব কিসের জন্যে! আপনি মরচি জ্বরে ভুগে, ওর জন্যেই কেঁদে মরি!

দুদিন কাটিয়া গেল, ঝড় জল থামিল না।

কুঞ্জ দাওয়ায় বসিয়া হুঁকা টানিতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া রূপসী বলিল, বাপ্ কি নেমকহারাম! ঘরে পয়সা ছিলনা. একটা টাকা ধার চাইলুম, দিলেনা!......

কুঞ্জ বলিল, আমিত ছিলুম ঘরে, ওর কাছে হঠাৎ চাইতে গেলে কেন!

না, চাইবো না! বসে বসে খাচ্চে না! যাক দূর হয়ে, আমি পারি না। বউ নিয়ে ও বিদেয় হ'য়ে যাক'। উনিই আবার আমায় পায়ে চুট্‌কী, সোণার নাকছাবি গড়িয়ে দেবেন!—হায় রে বাঁচিও নে! আমি সেই পিত্যেশেই বসে আছি।—বলিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিস্ময়-আহত কুঞ্জ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সম্মুখের বালুচরের উপর দিয়া জলভারনত বাতাস ক্লান্ত মন্থর দেহে বহিয়া চলিয়াছিল, তেমনি একটা ক্ষুব্ধ ক্রন্দন রূপসীর অন্তর-পিঞ্জরের দ্বারে রুদ্ধক্ষোভে বার বার আঘাত করিতে লাগিল। সকলের অজ্ঞাতে আর একটা মানুষ ঘরের ভিতর নিতান্ত অপরাধীর মত নির্ব্বাক মুখে বসিয়া রহিল।

——:০:——

অঙ্কশাস্ত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ

—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

উপক্রমণিকা।

লোকে মৃত মানুষেরই শ্রাদ্ধ করে থাকে।

অঙ্কশাস্ত্রটীকে কিন্তু মৃত মনে করবেন না যেন!

—তবে জীবিত এবং অমর ও অক্ষয় হলেও বেচারী আজ জীবন্মৃত হয়ে পড়েছে একথা সত্য!

ইস্কুল কলেজের ছেলেদের ত' অঙ্কর বই দেখলেই স্বয়ং মৃত্যুর সাক্ষাৎ পাবার মতই, মনে বিভীষিকার ছবি জেগে ওঠে। পাটীগণিতের 'সিঁড়ি ভাঙ্গা'—জেলখানায় বসে পাথর ভাঙ্গার অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার। কাবুলিওয়ালাদের তাগাদায়, শুভঙ্করের বিচারমত, 'সুদকষার' সুদের হিসাব দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

জীবন্মৃত অঙ্কশাস্ত্রেরই এই রূপ!—মহাপুরুষটী যদি সত্যি জীবিত হতেন জমা খরচের অঙ্ক কষতে গিয়ে সব জমাই যদি খরচ হয়ে যেত অথবা লোকে ইন্‌কম্ টেক্সর সঠিক পরিমাণ কষতে গিয়ে চোখের সামনে 'জলজ্যান্ত' তাগাদার পেয়াদাকে দেখতে পেতো তাহলে সংসারে বাস করাই চলত না!

এই সব দেখে শুনে অঙ্কশাস্ত্রের জীবন্ত অবস্থাতেই তর্পণ সুরু হয়েছে, যাহাতে তার আত্মা শান্তি লাভ করে' নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে থাকে, এবং কপালের দোষে কখনও বিধাতার লিখিত লিপি খণ্ডন করে কোনও গতিকে একবারটী মরলেও পুনর্ব্বার প্রেতযোনী পেয়ে কোন মানুষের স্কন্ধদেশে চেপে বসবার বাসনা না করে।

অঙ্কশাস্ত্রের একটী বিশিষ্ট অংশের নাম, 'পাটীগণিত'।

পাটীগণিতের মাত্র 'আদ্য' অধ্যায় গুলির শ্রাদ্ধ বিবরণী এখানে আজ লিপিবদ্ধ করেছি। আপনারা অবহিত চিত্তে আসন গ্রহন করুন।

প্রথম অধ্যায়—"সংজ্ঞাপ্রকরণ"

অঙ্কশাস্ত্রের পাঠ্য পুস্তকে এই অধ্যায়টীর নাম 'সংজ্ঞা-প্রকরণ' আছে,—আমার মতে কিন্তু এটা বদ্‌লে 'অজ্ঞান-প্রকরণ' নাম রাখলেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হ'ত।

কারণ শুনবেন?

আমি এখানে পাটীগণিত মতে দু'একটী সংজ্ঞা উদ্ধৃত করছি।

'রাশি' শব্দের ব্যাখ্যা লেখা আছে,—"যে কোনও পদার্থ অংশ সমূহের সমষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে তাহাকে রাশি কহে!"

পাঁচ ছ'বছরের কিশোর বালক 'রাশি' না হয় নাই বুঝ্‌ত এখন 'পদার্থ'……'সমষ্টি'………'পরিগণিত'………ইত্যাদি শব্দ সমুদ্রের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বক্ষে সবেগে নিমজ্জিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে আরম্ভ করিল।

আমি অবশ্য এখানে কিশলয় শিশুদের অঙ্ক শেখাতে আরম্ভ করি নি, সুতরাং তাদের সংজ্ঞা বোঝাবার জন্য রাশি ও অন্যান্য কথা গুলির ব্যাখ্যা কি রকম হওয়া দরকার সে সম্বন্ধে আলোচনা করব না।

যাঁহারা বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করে সংসারের পাঠশালায় পাঠ আরম্ভ করেছেন তাঁহাদের অবগতির জন্য দু'একটী মাত্র সংজ্ঞার সরল ও সহজ ব্যাখ্যা জানাচ্ছি।

রাশি মানে কি?

—অভিধানে লেখা আছে—'সমূহ; জ্যোতিশ্চক্র;………' ইত্যাদি।

সমূহ অথবা সমষ্টি অর্থের টীকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

জ্যোতিশ্চক্র মানে—'মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট,' প্রভৃতি দ্বাদশটী প্রাণীপুঙ্গব-কেই নির্দ্দেশ করছে।

কিন্তু এদের 'রাশি' নাম হল কেন?

পণ্ডিতেরা গবেষণা করে ঠিক করেছেন 'রাশি' হ'চ্ছে রাশিয়া'র অপভ্রংশ। আদিকালে উপরোক্ত প্রাণীগুলি 'রাশিয়া' হতে আমদানী হয়েছিল। বর্ত্তমানে শেষের 'য়া'টী অব্যবহারে লোপ পেয়েছে।

'রাশিয়া'র ঐ 'রাশি'গুলি ভারতে এসে এখানকার তাবৎ হিন্দু অধিবাসীদের জন্ম হতে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্য্যন্ত মহা গণ্ডগোল বাধিয়ে দিয়েছে!…………

একক মানে কি ?

পাটীগণিত মতে—এক জাতীয় রাশি সকলের বৃহত্ত্ব পরিজ্ঞানের নিমিত্ত তাহাদিগকে তজ্জাতীয় যে নির্দ্দিষ্ট রাশির সহিত তুলনা করা যায় তাহাকে "একক-রাশি" বা সংক্ষেপে "একক" কহে।

এই শিশুবোধ্য সংজ্ঞাটী বোধগম্য করতে অনেক বৃদ্ধেরও বুদ্ধি লোপ হবে সন্দেহ নাই।

পাটীগণিতের এই ব্যাখ্যা হ'তে "একক" কথাটীর কতখানি সরলার্থ জানা যায় দেখি !

"এক জাতীয় রাশি সকল"………তাহার মানে ত ঐ মেষ বৃষ-মিথুন কর্কট প্রভৃতি নামধেয় বারটী প্রাণী।

"জাতীয়" কথাটা এই National যুগে কি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে ভেবে দেখলে মনে হয় রাজনীতি সংক্রান্ত কোন মস্ত অভিসন্ধি উহারা ভিতরে ভিতরে গড়ে তুলছে ! হয়ত কোনও দিন সকালবেলা উঠেই Statesmanএর প্রথম পৃষ্ঠায় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা দেখব—'সুকিয়া ষ্ট্রীট' অথবা 'মাণিকতলার' মতই কোনও বিশিষ্ট জায়গার ভূগর্ভস্থ গৃহে উহারা গোপনে বোমা তৈয়ারী করছিল ধরা পড়েছে !—

"এক জাতীয় রাশি সকলের বৃহত্ত্ব পরিজ্ঞানের নিমিত্ত তাহাদিগকে তজ্জাতীয় যে নির্দ্দিষ্ট রাশির সহিত তুলনা করা যায়………"—এটুকু অধিকন্তু ! বারটী রাশিতে মিলে বড় একটা কিছু করতে পারে, সে কথা সকলেই জানেন। এই কথা সপ্রমাণ করতে ঐ জাতীয় একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট রাশির সহিত তুলনা করে দেখার কোনও আবশ্যকতা নেই। তবে যদি কেহ বলেন—"বার জনে" কখনও মিলে থাকবেনা—থাকতে পারে না—তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করবার সময় প্রত্যেকেই আপন আপন প্রাণ রক্ষার পথ খুঁজবে—এবং এরূপ ক্ষেত্রে "বার'র" অপেক্ষা একের বলই সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ—তাহা হলে কথাটা মিথ্যা হয় না।

সত্যই ত, একের শক্তিও অনেক সময় নগণ্য নয় ! যাহারা যুদ্ধের আগেই পলায়ন করবে তাহাদের এই এককের শক্তিই বারজনের তুলনায় বেশী এ ধারণা সর্ব্বক্ষণ থাকা উচিত !

সোজা কথায় একক মানে একাকী। এই সোজা অর্থটুকু বুঝাবার জন্ত গ্রন্থকারদের ঐ বিরাট প্রচেষ্টার কি আবশ্যক ছিল বুঝিনা!............

দ্বিতীয় অধ্যায়—"সংখ্যা লিখন"—

সংখ্যা লিখিতে হলে দরকার—একক......দশক......শতক......সহস্র...... অযুত......লক্ষ ....নিযুত......কোটী......অর্ব্বুদ......বৃন্দ......খর্ব্ব......নিখর্ব্ব ......শঙ্খ......পদ্ম......সাগর......অন্ত্য......মধ্য......পরার্দ্ধ.........!!!

সপ্ত সমুদ্রেরও হয়ত সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে কিন্তু এই সংখ্যা সমুদ্রের শেষ কোথায় কে জানে! মনে জান্‌তাম সাগরের জলবিন্দু গোণা যায় না! কিন্তু এখানে দেখছি—আদি নেই.........অন্ত নেই.........কোথায় যে শেষ কেহ জানে না—! তবু অঙ্কশাস্ত্রের গণ্ডী দিয়ে 'সাগরকে' ত' বেঁধেছেই—'সাগরের' চতুর্দ্দশ পুরুষকেও ছাড়ে নাই!

এইখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়। "শঙ্খ" দেখেছি, "পদ্মও" দেখেছি সাগরও কল্পনা করতে পারি কিন্তু তারপরের ঐ অন্ত্য.........মধ্য...... পরার্দ্ধ.........সংখ্যাগুলির অস্তিত্ব সত্যই আছে ত? অথবা আমরা জানি না— গুণতে পারিনা—বলে যা তা লিখে আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগাবার জন্যই উহাদের সৃষ্টি হয়েছে?

সাগরের ওপারের ঐ রাজ্যটা শুধু ধোঁয়া অথবা আর কিছু?

সংখ্যাশাস্ত্রকে নমস্কার। সাগর যাহারা লাফিয়ে পার হয়েছে—সেই বীরেরাই উহার মীমাংসা করুক!!

তৃতীয় অধ্যায়—"যোগ ও বিয়োগ"—

যোগ মানে—ধ্যান.........সঙ্গতি.........যুক্তি......অপূর্ব্ব অর্থলাভ...... ইত্যাদি। যোগের চিহ্ন "+"।

এ ছাড়া—পাঁজিতে দেখি মাহেন্দ্রযোগ অমৃতযোগ ইত্যাদি। বিবেকানন্দ স্বামীর কর্ম্মযোগ রাজযোগ ভক্তিযোগ ত আছেই। পণ্ডিতমহাশয় বলেন চন্দ্রগ্রহণের যোগে গঙ্গাস্নান করলে 'পুণ্য' লাভ হয়।

যোগের মানে যাই হোক যোগ বলতে কিঞ্চিৎ লাভ বুঝায় ইহা নিঃসন্দেহ।

হাজার বৎসর যোগ-তপস্যা করে দশরথ রাজার পুত্র লাভ হয়েছিল। কিন্তু হাজার হাজার টাকা হাজার বার খাতায় যোগ করলেও অঙ্কশাস্ত্রের গবেষণায় কতটুকু অর্থলাভ হয় তাহা বুঝতে হলে সূক্ষ্মজ্ঞানের দরকার! 'বেহায়ার' দেহের সহিত লেজ 'যোগ' করলে শোভা বৃদ্ধি হয়! তেমনি অনেক অনেক 'কর্ম্মবীর' সরকারের অনুগ্রহে আপন আপন নামের আগে ও পেছনে বিশিষ্ট খেতাব যোগ করে আত্মপ্রসাদ পাচ্ছেন। জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত মহাত্মাদিগের 'সবুট' শ্রীচরণের সহিত ব্যক্তি বিশেষের উদরের যোগ হ'লে প্লীহা নামক যন্ত্রটী এবং তৎ-সঙ্গে তাবৎ মানবদেহের অমরত্ব-লাভও হয়! লাভের আগে অ যোগ করলে কিন্তু 'অলাভ' বুঝায়। বিদ্যাদেবীও 'অ'যোগে অবিদ্যার নৃত্য করেন।

সুতরাং—যোগ বললেই লাভ বুঝায় একথা সত্য হলেও এই লাভটা যে সর্ব্ব সময়ে কতখানি প্রীতিজনক সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

বিয়োগের চিহ্ন "—"

বিয়োগ মানে যোগের অভাব। ইহার ফল অনেক সময় ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে, যেমন,—

মাথার সঙ্গে টিকির বিয়োগ ঘটলে ব্যক্তিবিশেষের ক্রোধের সীমা থাকে না। আবার কাহারও কাহারও চিবুক ও দাড়ির মধ্যে বিয়োগ ঘটলে রক্ত গরম হয়ে যায়।

অনেক সময় কিন্তু বিয়োগটাই হয় গৌরবের।

"অ" বিয়োগে "অসুর" দেবতা হয়ে যায়,—"অকল্যাণ" কল্যাণ হয়,— "অস্থায়ী" "স্থায়ী" হয় ইত্যাদি।

"+" এবং "—" এর মাহাত্ম্যে জগৎ চলছে। অনাদিদেব "ব্রহ্ম' নিজেও এই "+" ও "—" এর বন্ধনে বাঁধা।

কেমন করে তা বলছি।

বেতার বার্ত্তার আশ্চর্য্য কাহিনী আপনারা জানেন। বেতার বিজ্ঞানটাও এই "+" ও "—" এর কৌশলে পরিচালিত। ব্যাপারটা বিশদ রূপেই বর্ণনা করছি।

যে কোনও শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্র বাতাসে অনেকগুলি তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই তরঙ্গগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের পর্দ্দায় যখন আঘাত লাগায় তাহারই অনুভূতি হ'তে

শব্দ জিনিষটা আমাদিগের মস্তিষ্কের বোধগম্য হয়। বাতাসের চেয়ে সূক্ষ্ম ঈথার নামে এক প্রকার পদার্থ আছে। জগতের সর্ব্বত্র ঈথার আছে বলে বিশ্বাস। ঈথার শূন্য পদার্থ নেই। ভগবানের স্বরূপ ধারণা সম্বন্ধে আমরা যেমন বলি "সর্ব্বভূতে বিরাজমান," ঈথারও সেইরূপ জলে স্থলে বাতাসে সর্ব্বত্র আছে। .যে কোনও শব্দ বাতাসে যেমন তরঙ্গ সৃষ্টি করে ঈথারের মধ্যেও তেমনি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদন করায়। ঈথারের মধ্যে "+" ও "—" উভয়বিধ এবং সমান পরিমাণে তাড়িৎই সৃষ্ট হয় বলিয়া আমরা উহাদের কাহারও অস্তিত্ব বুঝিতে পারি না। বেতার বিজ্ঞানে এই "+" ও "—" এর একটীকে পথহারা করে আপনার যন্ত্রমধ্যস্থ আর একটী বিপরীত তরঙ্গের সহিত মিলিয়ে নষ্ট করে দেয়। ইহার পর বাকী যে তাড়িতটী থাকে তাহাই অনায়াসে আমাদের অনুভূতির গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়ে।

উদাহরণ না দিলে সম্ভবত: বিষয়টী বুঝতে কষ্ট হতে পারে।—

মনে করুন ফরাসীদেশের এক মানমন্দিরে বসে কেহ কথা কহিলেন। কথার সঙ্গে সঙ্গে ঈথারের মধ্যে + ৫০০ ও — ৫০০ তাড়িত সৃষ্ট হল। ঐ মানমন্দিরে একটী যন্ত্রের সাহায্যে এই তাড়িতটী যাহাতে ঈথারে প্রবাহিত হবার সময় বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হল। এখন, ঈথারের গতিবিধি জগতের সর্ব্বত্রই আছে। সুতরাং ঐ তাড়িত তরঙ্গ সারা বিশ্বের প্রতি-দিকে এবং সর্ব্বস্থানে সঞ্চালিত হল। ঐ তরঙ্গ কলকাতাতেও আসবে, লণ্ডনেও যাবে কোথাও বাধা মানবে না। মনে করুন কলিকাতায় আপনি একস্থানে ঐ তাড়িত তরঙ্গটীকে বিশেষ কৌশলে আপনার এক বিশেষ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে চেষ্টা করলেন। ঐ যন্ত্রটীর মধ্যে নানা রকমের তাড়িত-তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। "+" ৫০০ ও "—" ৫০০এর মধ্যে মাত্র একটীকে যন্ত্রের ভিতর নিয়ে গিয়ে তাহার বিপরীত চিহ্নযুক্ত অথচ সমান মূল্যের তাড়িতের সহিত মিলিত করে দিলে তাহাদিগের সমন্বয়ে ঐ তাড়িতটীর বিলোপ ঘটবে। এক্ষণে "+" ৫০০ ও "—" ৫০০র মধ্যে অবশিষ্ট যে তরঙ্গটী তাহাই টেলি-ফোনের মত যন্ত্র দিয়ে আপনার শ্রবণেন্দ্রিয়ের পর্দ্দায় আঘাত করলে আপনি অনায়াসেই তাহা বুঝতে পারবেন।

.বেতার বার্ত্তার মত এই "+" ও "—" নিয়ে বিশ্বের সৃষ্টির রহস্য কিছু জানাব।

"+" ৫ ও "−"৫এ মিলে "০" হয়। "+" ১০০ ও "−" ১০০ তে মিলেও "০" হয়। সুতরাং "০"র মধ্যে +১০০ এবং −১০০, অথবা +১০০০ ও −১০০০, অথবা +১০০০০০ ও −১০০০০০ ইত্যাদি তুল্য মূল্যের বিপরীত চিহ্নযুক্ত যে কোনও দুইটী সংখ্যার অস্তিত্ব বোঝা যায়। "০" যেন রত্নগর্ভ ;—উহার মধ্যে যা খুঁজবেন পাবেন। "০"এর মধ্যে লক্ষ হীরা চান তাও আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ঋণ লক্ষ হীরা অর্থাৎ লক্ষ হীরার অভাবটাও আছে এ কথা বলাই বাহুল্য। "০"এর মধ্যে একটা বিশ্বজগৎ লুকিয়ে থাকতে পারে আবার সেই সঙ্গে বিশ্বজগতের অভাবও আছে। "+" বিশ্বজগৎ ও "−" বিশ্বজগতে মিলে "০" হয়।

আমরা সামনে আকাশ দেখছি, তারা নক্ষত্র সূর্য্য চন্দ্র দেখছি,—কিন্তু বেদান্ত বলেন সব "মায়া" অর্থাৎ "মিথ্যা" অর্থাৎ "শূন্য"। জগৎকে "শূন্য" বলে দেখব বললেই শূন্য বোধ হয় না। তবে, এই সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান যদি থাকে তাহা হলে সমস্তই শূন্য বোধ হবে। ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জগৎ "কিছু না" বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও উড়িয়ে দেওয়া সহজ নয়।

ব্রহ্মজ্ঞান + জগৎ = "শূন্য"

—একথা সহজেই স্বীকার করা যায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান অথবা জগৎ কেহ একাকী "০" নহে। ব্রহ্মজ্ঞান ও জগৎ উভয়ের মূল্য সমান কিন্তু চিহ্ন আলাদা। ব্রহ্মজ্ঞান যদি "+" হয় জগৎ সেক্ষেত্রে "−"।

অতএব, আমরা বেদান্তমতে যে ধারণা করি পূর্ব্বে অনন্ত "শূন্য" ছিল সেই শূন্যের মধ্যে ব্রহ্ম উদ্ভূত হলেন—ব্রহ্ম আবার জগৎ সৃষ্টি করলেন—এ কথার ব্যাখ্যা আর কিছুই নহে—"ব্রহ্ম" এবং "জগৎ" একই, একে অন্যের বিপরীত চিহ্নযুক্ত নহিলে পরিমাণে বা মূল্যে সমান, এবং ব্রহ্ম ও জগৎ "০" হতেই জন্মলাভ করেছে—ও সৃষ্টির শেষে "০"র মধ্যে বিলয় পাবে।

"+" এবং "−"এর ব্যাখ্যার মধ্যে এমনি কত সৃষ্টি ও কত ধ্বংস লুকান আছে তাহার ধারণা করা যায় না।

[চতুর্থ অধ্যায়]

—গুণ ও ভাগ—

গুণ মানে সংক্ষিপ্ত যোগ

৫ × ৭ = ৩৫। এ কথার মানে সাতবার পাঁচ যোগ করলে পঁয়ত্রিশ হয়।

"গুণে"র অশেষ গুণ! সংক্ষেপে যোগ করার ফলে সময়ের সংক্ষেপ হয় এবং লাভের সংখ্যা খুব দ্রুত বেড়ে যায়। লক্ষ্মীপূজার সময় দেখেছি ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা সংক্ষেপে প্রতি বাড়ীতে পাঁচ মিনিট অথবা দশ মিনিটের মধ্যে পূজা সেরে বেশ রীতিমত দুপয়সা রোজগার করেন!

ভাগ মানে সংক্ষিপ্ত বিয়োগ

বার বার বিয়োগ করে খুব অল্পই যাহাদিগের হ্রাস করা যায় ভাগের সাহায্যে মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ম্ম সমাধা হয়।

কোনও জাতিকে "কাবু" করতে হলে, নিরন্তর তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করার চেয়ে তাহাদিগের নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ জাগিয়ে দেওয়া শ্রেয়ঃ।

পাহাড়ের স্তূপ হতে এক একটী করে পাথর খণ্ড কেটে আনতে আনতে পাহাড় ধ্বংস করতে বোধ হয় অনন্ত যুগ কেটে যাবে। অত কষ্ট দরকার কি? ডিনামাইটের সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করে দিন—দু'মাসের মধ্যে পাহাড়ের অস্তিত্ব বেমালুম লোপ পাবে।

ভগবানের আশ্চর্য্য সৃষ্টির মধ্যে ইহার বিপরীতটাও অসম্ভব নয়। যেমন "পুরুভুজে"র মত "রক্তবীজের ঝাড়"দিগকে যতই ভাগ করবে তাহাদের সংখ্যা ততই বেড়ে যাবে।

[উপসংহার]

যোগ বিয়োগ গুণ ও ভাগের লীলাতত্ত্ব বুঝালাম। পাটীগণিতে এমন কোনও অঙ্ক থাকতে পারে না যাহা এই চারিটী প্রক্রিয়ার সাহায্য ব্যাতিরেকে সাধিত হয়। এইজন্য পাটীগণিতের অন্যান্য অধ্যায় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রইল।

—:✻:—

সাহিত্যের দান

—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। লোকশিক্ষা, সমাজ উন্নত করা ও সাধু আদর্শে সকলকে অনুপ্রাণিত করা সকল সাহিত্যের উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যেখানে এই উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় সেখানে ফলও বিষময় হইয়া পড়ে, সমাজ ক্রমে উদ্দাম ও উন্মার্গগামী হইয়া উঠে; লোকরুচি বিকৃত হইলে, তাহাকে অসৎ ইন্ধন দিয়া উদ্দীপিত করিলে, শেষে সে আগুণকে নিভান বড় কষ্টকর হয় এবং ক্রমে উহা প্রচণ্ডতেজ হইয়া সংসারকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইবার জন্য ছুটে।

বঙ্গসমাজ নানা কারণে আজ দুর্ব্বল ও হীনশক্তি। একদিনে তাহার এ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় নাই। কেহ ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য, কেহ বা পরপীড়ন ও তৎপ্রসূত দারিদ্র্য ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহার মুলে যে কারণই বিদ্যমান থাকুক না কেন, ইহা কিন্তু বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সাহিত্যের আদর্শ ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

আমরা প্রাচীন সাহিত্যে যে আদর্শ দেখিতে পাই, পরবর্ত্তী সাহিত্যে তাহা আর পাই না। মদীয় পিতৃব্য ও শিক্ষা-গুরু পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন বাঙ্গালা ভাষায় "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নামক প্রথম নাটক লিখেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুশীলকুমার দে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় তাহার ২।৪ বৎসর পূর্ব্বে রচিত ২।১ খানি বাঙ্গালা নাটকের উল্লেখ ও আলোচনা করিয়া দেন। তাহার পরে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তখন যে আদর্শ আমরা দেখি তৎপরবর্ত্তী লেখকগণ সে আদর্শকে মানিয়া চলেন নাই। পূর্ব্বে অবশ্য সংবাদপত্রাদিতে গুপ্ত-ভট্টাচার্য্যের অশ্লীল মসীযুদ্ধাদি চলিত কিন্তু সে কথা ধর্ত্তব্য নহে, উহা তৎকালিক কুরুচিপরিপোষক হইলেও, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার

বিশেষ মূল্য ও আদর আছে। মাইকেল, রঙ্গলাল, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া সংযতভাবে লেখনী সঞ্চালন করিতেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে বিদেশী সাহিত্য হইতে অনেক নূতন ভাব ভঙ্গী রীতি আহরণ করিয়া বঙ্গভাষাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন। বিদেশীয় ভাব জাতীয় ভাবকে বিকৃত করিয়া ফেলে এই যে আশঙ্কার একটা কথা উঠিয়াছে ইহা নূতন নহে, বহু প্রাচীন, কিন্তু এ যাবৎ বঙ্গভাষার তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় নাই, বরং লাভই হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাত্রা তরজা কবির গীত প্রভৃতির দ্বারা লোকশিক্ষা যতটা প্রচুর পরিমাণে হইত, এখন সংবাদপত্র সাহিত্যাদি দ্বারাও ততটা হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রামপ্রসাদ দাশরথী প্রভৃতি স্ব স্ব অপূর্ব্ব রসময় রচনাদ্বারা বঙ্গভাষাকে বিশেষ উপকৃত করিয়া গিয়াছেন। হাফ্ আকড়াই সংকীর্ত্তন বাউলগীতি প্রভৃতির পূর্ব্বে বহুল প্রচলন ছিল, তাহাতে সাহিত্যগঠনের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে তৎসংক্রান্ত যে সব রচনা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার মূল্য আছে। সে সব সাধুচরিত্র মনীষি লেখকবৃন্দের লেখনী-প্রসূত সারগর্ভ সন্দর্ভসমূহ সমাজ ও সাহিত্যের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ব্রহ্ম সঙ্গীত যে কেবল ব্রাহ্মদিগের নিজস্ব সম্পত্তি তাহা নহে; উহা কেবল বঙ্গদেশের কেন, ভারতবর্ষের প্রায় তাবৎ স্থানের আবহাওয়া শুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর করিয়া দিয়াছে।

পূর্ব্বে রামমোহন রায় প্রভৃতি সুধীগণ যে সাহিত্য গঠন করিতেছিলেন, তাহাকে বিদ্যাসাগর অক্ষয় কুমার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সুমার্জ্জিত সুপরিচালিত ও সুপাঠ্য করিয়া তুলিলেন।

পরে থিয়েটারী যুগ আসিল। রাজকৃষ্ণ, গিরীশচন্দ্র, অমৃত লাল প্রভৃতি কবিগণ লোকশিক্ষার গুরুভার লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। এক গিরীশচন্দ্র যত নাটক লিখিয়াছেন, এত কেহই লিখেন নাই। প্রথম প্রতিষ্ঠিত National Theatreএ শরৎ-সরোজিনী প্রভৃতি ২।৪খানি নাটক অভিনীত হইত। পরে ষ্টার থিয়েটার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকারের অনেক নাটক অভিনীত হইতে লাগিল। রাজকৃষ্ণ রায়ের

'প্রহ্লাদ চরিত্রে' তখনকার সমাজে একটা সাড়া পড়িয়াছিল। গিরীশ বাবু কেবল কবি ছিলেন না, একজন সাধকও ছিলেন, সে জন্য তাঁহার সদ্ভাবপূর্ণ রচনাদির বিশেষ ফল হইয়াছিল; সমাজ অনেকটা উন্নীত হইয়াছিল, লোকের সৎপ্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ উদ্রিক্ত হইয়াছিল, ভাষাও নূতন ভাবে সজ্জিত হইতেছিল। তাঁহার "বিল্বমঙ্গল" প্রভৃতিতে লোকের মনে যেমন একদিকে একটা উন্মাদনার ভাব আসিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি "নন্দবিদায়" প্রভৃতির মধুর ঝঙ্কারে উহা মোহিত ও সন্তর্পিত করিয়া দিল। এইরূপে নানাবিধ পৌরাণিক সামাজিক ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মমূলক নাটকে সামাজিকদিগের মানসিক ক্ষুধার অনেকটা পরিতৃপ্তি হইল। অমৃত বাবু "বিবাহ বিভ্রাট" প্রভৃতি শ্লেষ-বিদ্রূপাত্মক বহু প্রহসনাদি দ্বারা উন্মার্গগামী ব্যক্তিদিগের পৃষ্ঠে তীব্র কশাঘাত করিতে লাগিলেন, তাহাতে সামাজিক রুচি ও আচার অনেকটা মার্জ্জিত ও সংযত হইয়াছিল। এই দেশে সাধু আদর্শে সমাজকে উন্নত করিতে সকলেই বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অমৃত বাবুর লেখনী আজও সমভাবেই সমাজকে শাসিত করিতেছে, ইহা সুখের বিষয়, এবং এই সুখ যেন আমরা আরো অধিকদিন উপভোগ করিতে পারি এই প্রার্থনা করি।

রঙ্গালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা তেমন আশাপ্রদ নহে। অবশ্য ভাল বই যে বাহির হইতেছে না তাহা নহে কিন্তু অভিনয়ের ধারা বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের আদর্শ আর নাই। নৃত্যগীত বহুল পরিমাণে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। স্থল বিশেষে হিন্দুর গৌরবোজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত আদর্শও ক্ষুন্ন হইতেছে। ইহার ফল কিরূপ ভাবে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা ভবিতব্যতা-দেবতাই কেবল বলিতে পারেন।

রঙ্গালয়ের অভিনয়াদির আদর্শ যেমন বদলাইয়াছে, সাহিত্যের আদর্শও তেমন অনেক পরিমাণে বদলাইয়া গিয়াছে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম বাবুর অভ্যুদয় হইতেই এই আদর্শ-পরিবর্ত্তনের আরম্ভ হয়। তাঁহার অমানুষিক প্রতিভা অমর লেখনী হইতে বিকশিত হইয়া লোকের চক্ষে ইন্দ্রজাল রচনা করিতে লাগিল ও লোকের মনকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। যে পাপ সমাজ কন্দরে গুপ্ত ছিল, তাহাকে তিনি বাহিরের প্রখরালোকে টানিয়া আনিলেন এবং নানারূপ সুন্দরবর্ণে প্রতিফলিত করিয়া ও নানাবিধ সুন্দর সাজে সাজাইয়া সেই

সব গুপ্ত চিত্র সমুজ্জ্বল করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিলেন। সখ্য, প্রেম, হিংসা, দ্বেষ, বৈরাগ্য, স্বদেশ প্রীতি প্রভৃতি অসংখ্য মানবের অন্তর্নিহিত গূঢ় ভাবগুলি এমন নিপুণতার সহিত চিত্রিত করিতে লাগিলেন যে লোকে অবাক্ হইয়া গেল এবং লৌহ যেমন চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, লোকগণও সেইরূপ আপনা আপনি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহার ভাল ও মন্দ দুই রকমই ফল হইল। যে পাপ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সমাজকে জর্জ্জরিত করিতেছিল তাহা প্রকট হইয়া আদর্শ স্থান লাভ করতঃ বীর্য্যবান হইয়া লোক সকলকে অসংযত ও পাগল করিয়া তুলিল এবং নূতন ভাবে উৎসাহিত হইয়া উত্তেজিত লেখকগণ নানাবিধ অবৈধ-প্রণয়-চিত্রের বন্যায় সমাজকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। সুফলও অনেক হইল। আত্মসম্মানজ্ঞান, লোকহিতৈষণা, সমাজ ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি ভাবগুলি লোকের মনে জাগরিত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিল; বিধবা বিবাহ, প্রাচীন রীতিনীতির উপযোগিতা বা তদ্বৈপরীত্য, শ্রীকৃষ্ণ-চরিত মহিমা, হিন্দু ধর্ম্মের সারবত্তা প্রভৃতি বিষয় গুলির দিকে লোকের নজর পড়িল। যে ভাষা এতদিন নিগড়বদ্ধ ছিল, তাহা এখন বন্ধনমুক্ত হইয়া সাগরগামিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় নানা ভঙ্গিতে নানা গতিতে নানা তালে বা কলনাদে তর তর বেগে ছুটিতে লাগিল। নূতন উৎসাহ নূতন উদ্যম নূতন উদ্দীপনা ও নূতন প্রেরণা চারিদিকে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল; বঙ্গভাষা ধন্য হইল।

এতদিন আমরা কেবল বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব লইয়া কারবার করিতে ছিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদেশী ভাবের যে একটু আধটু ছায়াপাত পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম তাহাতে আমরা বিচলিত হই নাই, উহা নগণ্য ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়াই আসিতেছিলাম। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে আমরা যেমন এক-দিকে একেবারে চমৎকৃত, বিস্মিত, আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলাম, তেমনি অন্য দিকে বিপর্য্যস্ত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। তাঁহার অলৌকিক শক্তি আমাদের মনের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিল। যখন তাঁহার সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, বাহির হইল তখন তাহার মধুময় মূর্চ্ছনায় শিক্ষিত সমাজ মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহার "মানসী-মাধুরী"তে বিভোর হইয়া গেল। ক্রমে তাঁহার নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা আমাদের মনপ্রাণ কাড়িয়া লইতে লাগিল, আমরা যেন তন্ময় হইয়া গেলাম।

কেহ কেহ বলেন, রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ভাব অতি অল্প, অধিকাংশই পরকীয়, বিদেশী ভাব আহরণ করিয়া এমন সুন্দর ও কঠিন আবরণ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে কেহ তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াও বুঝিতে পারে না; তাঁহার গদ্য ও পদ্য উভয়ই কঠিন। ইহা কথঞ্চিৎ সত্য হইলেও এই কাঠিন্য কাব্যের দূষণ নহে, বরং ভূষণ। কঠিন বলিয়া উহা পরিহেয় নহে, বরং কাঠিন্য-ভেদের জন্য আমাদের আগ্রহ বাড়িয়া উঠে। যতই পড়ি, ততই কাঠিন্য দূর হইয়া যায়, ও সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব রসাস্বাদ হইতে থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যে কবি ভারবিরও এইরূপ অখ্যাতি আছে। মল্লিনাথ বলিতেছেন যে নারিকেল-ফল-তুল্য ভারবির কাব্য। প্রথমটা ভারি কষ্ট, কিন্তু ছোবড়া, মালা ছাড়াইয়া যদি ভিতরে প্রবেশ করা যায় তবে অমৃত রসে প্রাণ শীতল হইয়া উঠে,—তৃষ্ণা পিপাসা দূর হইয়া যায়, হর্ষে শান্তিতে মন ভরপুর হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথেরও কোন কোন গ্রন্থ ভারবির তুল্য। বিদেশীভাব বঙ্গভাষায় আসিয়া যদি তাহাকে সমৃদ্ধ করে, তাহাকে সভ্য ভব্য করে, তাহাকে কুপথ হইতে টানিয়া সুপথে চালিত করে, পূত উজ্জ্বল করে, তাহাতে আক্ষেপের বিষয় এমন কি থাকিতে পারে? এক রবীন্দ্রনাথের ছাড়া এমন গ্রন্থ কমই আছে, যাহা পড়িলে বুঝা যায় না; সেজন্য কাঠিন্য তাঁহার পুস্তকের গুণই হইয়াছে, দোষ নহে। Bacon, Emersonএর গ্রন্থ কয়জন পড়িলেই বুঝিতে পারে? তাহাতে ত তাঁহারা নিন্দনীয় বা অনাদরের পাত্র হন নাই। বরং তাহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে। বঙ্গভাষা তাঁহার দ্বারা গৌরবান্বিত হইয়াছে। সেই জন্য আমরা মনে করি যে বঙ্গভাষায় অন্ততঃ একজনের এমন গ্রন্থ আছে যাহা অবহেলার সামগ্রী নহে, যাহা মনে করিলেই যে কেহ পড়িয়া বুঝিয়া ফেলিবে ও সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা করিতে থাকিবে; তাহা বুঝিতে হইলে একটু বুদ্ধি ও বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন হয়। ইহা ভাষার পক্ষে গৌরবের বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী যে বিপুল বৈষ্ণব সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল, তাহাও যে সহজ-বোধ্য ছিল তাহা নহে। নানা যাবনিক ভাব ও ভাষা তাহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেজন্য বঙ্গভাষার কোন ক্ষতি হয় নাই; বরং উহা আরও পুষ্টিলাভ করিয়াছে। যদি বিদেশীয় ভাব আসিয়া কোন ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তাহাতে আশঙ্কার কোন কারণ থাকিতে পারে না। মূল ভাষার জাতীয়তা নষ্ট করিতে পারে এরূপ প্রভাব ও শক্তি কোন আগন্তুক ভাবই ধারণ করিতে সমর্থ নহে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ধ্বনি-কাব্য। সংস্কৃতে ধ্বনি-কাব্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। উহার এক একটি কবিতা পড়িলে মনে কত ভাবের উদয় হয় তাহা বলা যায় না। ইহা সামান্য শক্তির পরিচায়ক নহে। এ প্রসঙ্গে "হিমালয়" দ্রষ্টব্য।

মেঘদূত অনেক ভাষায় অনুদিত হইয়াছে, কিন্তু কবি দক্ষতার সহিত অল্প কথায় গ্রন্থের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনন্য-সাধারণ। সকল পুস্তকের সমালোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে। কিন্তু ইহা স্থির যে এক "গীতাঞ্জলীই" তাঁহাকে জগতে অমর করিয়া রাখিবে।

কবি যে সমাজে পালিত বর্দ্ধিত তদ্‌ব্যতিরিক্ত সমাজের দোষ ক্রটীতে তিনি যে কটাক্ষ করিবেন, ইহা স্বাভাবিক; ইহাতে অসহিষ্ণু হইলে চলিবে কেন? "চিরকুমার সভা" প্রভৃতি কয়েকখানি অনুপম গ্রন্থে যেরূপ আমরা আনন্দ উপভোগ করি "রক্ত করবী" প্রভৃতি দু'চারখানি গ্রন্থ পাঠে আমরা সেইরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। ইহার ভিতর সাধু উদ্দেশ্য নিহিত আছে সত্য কিন্তু তাহা সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। ভবভূতির ভাষায় ইহার উত্তর দেওয়া যায় যে—"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমান ধর্ম্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।" বস্তুতঃ বঙ্গভাষাকে জগতের অন্যান্য ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী যে এক রবীন্দ্র নাথই করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। ইহাতে আমাদের গৌরবানুভব করাই সঙ্গত। তাঁহার সকল আদর্শই যে সকলের মনঃপূত হইবে তাহা সম্ভবপর নহে, ইহা হইতেও পারে না; কিন্তু তাঁহার রচনায় ভক্তিভাবের সরল প্রার্থনার ও ঈশ্বরানুভূতির এত ইঙ্গিত ও উপাদান বিদ্যমান আছে যাহা অন্য কোন বাংলা রচনায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকে সিদ্ধহস্ত; হাস্যরসকে তিনি প্রকট মূর্ত্তিমান করিয়া গিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথও অসামান্য প্রতিভা কবিতায় প্রস্ফুট করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গভাষা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

শরচ্চন্দ্র এখন উদীয়মান লেখকদিগের মধ্যে প্রধান, সুতরাং বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অনেক গ্রন্থকারের নামোল্লেখ হইল না, বিশেষ নবীন লেখকদিগের; স্থান অল্প, বিষয় গুরু, আর ইহা ঠিক সমালোচনা নহে। তাহা করিতে হইলে প্রতি পুস্তকের বিষয় কিছু না কিছু না বলিলে চলে না। কি ভাবে বাংলা সাহিত্য চলিয়াছে তাহার একটু সামান্য নমুনা মাত্র ইহাতে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে সাধারণ

ভাবে ; বিশেষভাবে বলিতে গেলে অনেক বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়।

সমালোচকের দায়িত্ব বড় গুরুতর। না বুঝিয়া না পড়িয়া আজকাল সহজেই লোকে সমালোচক হইতে চাহেন। আমার ভাল না লাগিলেই যে জিনিষটা মন্দ হইবে ইহার কোন অর্থ নাই। অনেক ভাল না লাগা জিনিষও জগতে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার কারণ অনুসন্ধান করাটা সমালোচকের প্রধান কর্ত্তব্য। নবীন লেখকদিগের সমালোচনা করাটা আরও কঠিনতর ব্যাপার। কারণ তাহাদের লেখার ফল এখনও ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত; কালই তাহার বিচারক, মানুষ নহে। তবে ভাল মন্দের একটা পার্থক্য আছে বৈকি। পবিত্র আনন্দ উপভোগ করানই সাহিত্যের মুখ্য কার্য্য হওয়া উচিত। সমাজের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের স্বভাবটাও বদলাইয়া যায় ও তাহার তারতম্য ঘটে ; বিকৃত বিষময় পাপের ছবি যদি আদর্শ স্থানীয় হয়, তবে তাহা দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষু এত অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তাহা আর না দেখিলে যেন রস উপলব্ধি হয় না ; রোগ বিশেষে আক্রান্ত হইলে শশিশুভ্র শঙ্খকেও লোকে পীতবর্ণ মনে করে ; এই ব্যাধি যাহাতে না আসে, তাহার উপায় করা কি সকলের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে ?

এ কথা সত্য বটে যে ভাবের প্রেরণা লইয়াই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কবিরা সমালোচকের ধার ধারেন না, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে সৎকবিরা সেই প্রেরণাকে সাধুদিকে চালনা করিয়া থাকেন। মনে যে ভাব উদিত হইবে তাহার ভাল মন্দ বিচার না করিয়াই যে তাহা অঙ্কিত করিতে হইবে ইহার ত কোন অর্থ নাই। তাহা হইলে অনেক নগণ্য অবাঞ্ছনীয় জিনিষ সাহিত্যে স্থান লাভ করে। কবিরা সমালোচককে ভয় করেন না, তাঁহারা নিরঙ্কুশ, উদ্দাম প্রকৃতিক, ব্যাকরণের ভাষার বা রীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহেন। কিন্তু ইহা আশ্চর্য্য যে তাঁহারা স্বাধীন হইয়াও পরতন্ত্র, উদ্দাম হইয়াও সংযত, কঠোর হইয়াও কোমল, কর্কশ হইয়াও বিনয়ী, অসাধু-চরিত্র হইয়াও শিষ্টাচারের ও নীতির সীমালঙ্ঘনে ভীরু; তাহারা কুৎসিৎকে সুন্দর করেন, পঙ্কিলকে নির্ম্মল করেন, কখনও সুন্দরকে কুৎসিত বা নির্ম্মলকে পঙ্কিল করেন না, তাঁহারা গঠনে সুনিপুণ, কোন কিছু ভাঙ্গিলে, তাহা সুন্দর নূতন উপাদানে পূরণ করিয়া দেন। এইটুকু বিশিষ্টতা সকলের লক্ষ করিবার বিষয়।

———:০:———

দরদী

—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ।

আজি এ ফাগুন্‌রাতে, পূর্ণিমাতে, আসিল কে দরদী,
ওলো তুই দেখ্‌লো চেয়ে, আঙিনাতে বংশী হাতে, ও ননদী।
বুল্‌বুলেরি বুল্‌ তানেতে কয় সে কথা, মাখা মধুর স্বরে,
গুলাবের গুল লালিয়া, রাঙাল তার রঙীন্‌ বসন পরে।
ডালা মোর উজাড় করে, ভরে দে তার সাজিখানি,
বাগিচার কুঞ্জবনে, দখিন্‌ কোণে পেতে দে তার আসনখানি।

আজি ঐ সাঁঝ-গগনে হোলির সনে কে ছড়াল অভ্র, আবীর ;
বুঝি সে পূরবী বাজায় ঐ শোনা যায় মিঠে ঐ সুরলহরীর।
যত সব আ-ফোটা ফুল উঠ্‌ল ফুটে, পেয়ে তার পরশখানি
আমিই সখি বিন্‌ পরশে মাগ্‌ব শেষে, ও রাতুল চরণখানি।
তার আসার 'পরে আশা করে গাই রাগিণী আশাবরী,
দরদীর পরশ পেয়ে উঠ্‌ব ফুটে ফুরালে কাল বিভাবরী।

—:•:—

একটী চিঠি

সম্পাদক মহাশয়,

লোকমুখে অবগত হয়েছি যে আপনি ডাক্তার। ডাক্তারী বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও আমি ডাক্তারদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। কেননা বর্ত্তমান সমাজে একমাত্র আপনাদের সজ্যই এক হ'য়ে কাজ কোরতে পারে, একমাত্র আপনারাই পরস্পরকে সুখ্যাতি কোরে থাকেন, এবং দু'একজন ব্যতীত বোধ হয় বাকী সকলেই ভাব প্রবণতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। আপনাদের নিজেদের এবং নিজের দলের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আছে। এই সকল সদ্‌গুণ থাকার জন্যই আপনাদের নিকট আমি অনেক প্রত্যাশা করি। দোষের মধ্যে, এতদিন আপনাদের ভাষা মার্জ্জিত ছিল না, অবশ্য ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর এবং বনবিহারী বাবু ছাড়া। ভাষা পক্ষী, অসভ্য জাতি, গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীরও থাকে, কিন্তু যে ভাষা সাধারণে বুঝিতে পারে তার পিছনে মন থাকা চাই, এবং সে মন কোন একটি ব্যক্তির সম্পত্তি হওয়া চাই। আমাদের দেশে গিরীন্দ্রশেখরের মনের মতন মন ক'জনার আছে? তাঁর ভাষার মতন ভাষাই বা ক'জনার আছে? সেই জন্যই আপনি এবং আপনার সহপাঠীরা সাহিত্যিক হ'য়েছেন শুনে আনন্দিত হয়েছি। আমার আনন্দ হলে আমি বড় জিজ্ঞাসু হ'য়ে পড়ি। সেই জন্য আপনাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করছি। আপনি ফী না নিয়ে উত্তর দেবেন কি?

আপনার পত্রিকা সাহিত্য বিষয়ক হলেও আমার অ-সাহিত্যিক প্রশ্ন করবার অধিকার আছে। কারণ বর্ত্তমান সাহিত্যের সঙ্গে ডাক্তারী বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। সাহিত্যের প্রধান কার্য্য সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করাই বোলে বিবেচিত হচ্ছে! প্রমাণ সকলেই জানেন—অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ সিংহ থেকে মজঃফরপুরের সাহিত্য সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পর্য্যন্ত। আবার অনেক মহিলা এবং অনেক নারীময় পুরুষ লিখে এই মত পোষণ করেছেন যে নিতান্ত আধুনিক সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের সকলেই বায়ুগ্রস্ত, এবং তাঁদের স্নায়ুবিকারের জন্য যৌবন সুলভ চিত্ত চাঞ্চল্যই দায়ী। যদিও সামাজিক রীতি

নীতিকে বাদ দিয়ে কেবল যৌবনকে কি করে দোষ দেওয়া যায় বুঝিতে পারি না। সে যাই হোক, যখন সাহিত্যের এবং সমাজের স্বাস্থ্য রয়েছে, এবং সাহিত্যিকদের স্নায়ু যখন অত্যন্ত বিকৃত, তখন স্বীকার করতেই হবে যে সাহিত্যের মধ্যে অনেক ডাক্তারী করবার সুযোগ রয়েছে। অতএব আপনি অতি সহজেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন এবং উত্তরদানে আপনার সাহিত্যিক মর্য্যাদার কোন ক্ষতি হবে না, বরং সাহিত্যের এবং সমাজের উপকারই হবে।

(১) মানুষের সমস্ত ব্যবহারকে কামপ্রবৃত্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার নাম যেমন Freudian Complex বলা যেতে পারে, তেমনি ঐরূপ ব্যাখ্যাকে একেবারে ভুল এবং অন্যায় বিবেচনা করা কি Iustinct of fear এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন নয়? যদি না হয়, তা হলে ফ্রয়েডীয়ান ব্যাখ্যা শুনে লুকিয়ে আনন্দিত হওয়া অথচ মুখে কিম্বা কাগজ-কলমে রাগ প্রকাশ করাকে যৌবনের প্রতি বার্দ্ধক্যসুলভ হিংসা এবং সেই হিংসার কপটাচরণ অর্থাৎ Rationalisation বলা যায় কি না?

(২) পিতার প্রতি কন্যার এবং মাতার প্রতি পুত্রের ভালবাসাকে যেমন এক একটি Complex বলা হয়, তেমনি পিতামহের প্রতি ভক্তি একটি Complex কি না? যদি হয়, তা হলে সেটি কোনো প্রকার স্নায়ুরোগের চিহ্ন কি না?

(৩) পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারী প্রশ্ন দুটি ছাড়া আমার আরো সাহিত্যিক প্রশ্ন আছে। আপনি যেকালে বাংলা ভাষায় পত্রিকা বাহির করেছেন, তখন আপনাকে সাহিত্যিক বোলতে বাধ্য। সাহিত্যিক হতে গেলে আমার বিশ্বাস এখনও সংস্কৃত পড়া দরকার—অন্ততঃ সংস্কৃত কাব্য এবং পুরাণের বাংলা তর্জ্জমা। আপনি নিশ্চয় পড়েছেন—আমি পড়িনি, সেই জন্য আমি সাহিত্যিক হতে কখনও পারব না। আমার একজন সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু বোলেছেন, "সংস্কৃত সাহিত্যে যেখানে হাত দেবেন সেখানেই স্ত্রীলোকের কোন না কোন অঙ্গ পাবেন,—পুরাণে রাজা রাজোয়াড়া এবং মুনিঋষিদের কাণ্ড আজকালের রাজোয়াড়াদেরও স্বপ্নের অগোচর তাঁদের দৃষ্টি সদাই কামপূর্ণ, কোন সুন্দরী স্ত্রীলোক তাঁদের দৃষ্টি এড়াতে পারে না।" এ সব কথা কি সত্য? যদি হয়, তা হলে সংস্কৃত

সাহিত্য এবং পুরাণ পড়লে তরুণদলের কি উপকার হতে পারে? যদি না হয়, তা হলে কোন্ কোন্ সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণ পড়া উচিত,—একটি তালিকা কোরে দিবেন কি? সংস্কৃত সাহিত্যে যদি আপনার ব্যুৎপত্তি না থাকে, তা হলে বৈষ্ণব সাহিত্যে নিশ্চয়ই আছে। বৈষ্ণব কবিতার শতকরা কয়টি পদ্য শ্লীল এবং ভগ্নী কিম্বা ভাবী স্ত্রীকে দেওয়া যায়? আপনি কিছু তরুণদের পঞ্চদশী কিম্বা জীবগোঁসাই পড়তে অনুরোধ করেন না? যদি করেন, তা হলে তাহা পাঠ করে সাহিত্যের কি প্রকার উপকার হবে?

(৪) আপনি অনুরূপা দেবীর অভিভাষণ পড়ে অত রাগ কোরেছেন কেন? রাগ পুরুষের লক্ষণ এবং একমাত্র স্ত্রীজাতিরই প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করবার সুবিধা বাঙ্গালীর আছে তাও জানি। রাগের অবশ্য কোন সঙ্গত কারণ থাকে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি তরুণ সম্প্রদায়কে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করেন নি। আমাদের বয়সী অনেক আত্মীয় আত্মীয়া তাঁর আছে, যাঁরা নিতান্ত আধুনিক সাহিত্য পড়েন, কেউ কেউ বা সৃষ্টি করেন জানি। তাঁরা সকলেই সচ্চরিত্র তিনি জানেন। ছোট গল্প ও নভেল নাটকে, যে সব নায়ক-নায়িকা চিত্রিত হয়েছেন তিনি তাঁদেরই গালাগালি দিয়েছেন। কে না জানে যে তাঁরা জীবন্ত মানুষ নয়? কে না জানে যে সাহিত্যিক প্রাণী জীবন্ত কিম্বা মৃত ব্যক্তির ফটোগ্রাফ হলে তার ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে কিন্তু সাহিত্যিক মূল্য থাকে না? অতএব আপনার ক্ষুব্ধ হবার কারণ নেই। আপনি জোর এই কথা বোলতে পারেন যে অভিভাষণটি সাহিত্যসভার উপযুক্ত হয় নি। হিন্দুসভার উপযুক্ত নিশ্চয়ই হয়েছিল। আমিও যে কালে এ সব কথা বুঝতে পারি, তখন আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন। তা হলে আপনি কি সভানেত্রীর আদর্শে বিশ্বাস করেন না? আপনি কি ভাবেন জীবনী শক্তি প্রবহমান না হলে সংযমের কোন মূল্য নেই? আপনি কি মনে করেন যে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের একান্ত অভাব এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ একই সময় দেহ, মন, আত্মার (খুড়ী! ডাক্তারবাবুরা আত্মায় বিশ্বাস করেন না!) ভিতর দিয়েই হতে বাধ্য? তাই যদি হয়, দেহকে কি আপনি সম্পূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করবেন?

(৪) আপনি বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে স্বদেশী সাহিত্যের কি পার্থক্য আছে মনে করেন যার জন্য জোলা, ফ্রান্স, মারগুইরাইট, মিজলার, গর্কি পড়া যায়

অথচ রবিবাবু, শরৎচন্দ্র পড়া যায় না, 'ঘরে বাইরে' 'শ্রীকান্ত' অপাঠ্য হয়ে ওঠে ?

আমার শেষ অনুরোধ এই যে আপনি আপনার পত্রিকায় শ্রীকৃষ্ণের 'পূতনা বধ' লীলাটি ব্যাখ্যা করুন। পূতনা কৃষ্ণকে বধ কোরতে গিয়ে ঠিক কি কোরে মারা গিয়েছিলেন আমার জানা নেই। যে বই খানিতে ঐ গল্পটি বর্ণিত আছে সেটি আমার গৃহকর্ত্তা আমাকে শিশুকাল হতে তাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনও পড়তে দেন নি। তিনি পারিবারিক নীতি রক্ষা সম্বন্ধে পরমারাধ্য ৺ভূদেব বাবুর মতনই সচেতন ছিলেন। তিনি এখন স্বর্গে, কিন্তু এখনও তাঁর অন্তরালে এমন কি শ্বশুর বাড়ী গিয়েও কৃষ্ণলীলা লুকিয়ে পাঠ করবার সাহস আমার নেই। সেজন্য মনে হয় যে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই গোপিকা বর্জ্জিত নিরীহ লীলাটি পড়তে পেলে আমার গুরুভক্তি এবং কৃষ্ণভক্তি অটুট থাকবে, আমার চরিত্রও নষ্ট হবে না। আপনি কি আমার প্রতি কৃপা করবেন না ? ইতি

লক্ষ্ণৌ

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

—:*:—

সওদা

অনাথ সাহিত্যিকেরা এতদিন রবীন্দ্রনাথী চালেই যত কিছু চাল্ মেরেছেন। কবিতায় গল্পে উপন্যাসে। এমন কি হাতের লেখায়। এরই মধ্যে আজ কালকার যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের শক্ত মুঠিটা থেকে নিজেকে একটু আল্‌গা করে' নিজেদের পথে বল্‌গাটা ছেড়ে দেয়, তা হলে গতানুগতিক অভিজাত রবীন্দ্রভক্তরা অভিযোগ করে উঠ্‌বে। কিন্তু—

সজ্‌নের কাঠি হয়ে আসে এই সব জোয়ানদের ঘাল কর্‌তে ?

দাঁত খুঁচাবার খড়্‌কে যত সব। পুঁচ্‌কে দু' আনি।

বাসি প্রবাসী, আর মেকী বিচিত্রা, রবীন্দ্রনাথকে দাও বাদ,—অমনি সব বরবাদ।

'নটরাজ' বাদ দিলেই আসে 'ঘরের কথা'। যেমন বাড়ীর দেউড়ি পেরলেই মিউনিসিপ্যালিটীর নর্দ্দমাটা।

'বিচিত্রার' পাল্লায় পড়ে নরেশচন্দ্র এতদিনে "সতী" হয়েছেন যা হোক্।

সাহিত্যে যারা বি-জাত,—তারাই নিজেদের নাম দেয় অভিজাত।

চীনেদের চেয়ারে বসে'—হয়ত সে চেয়ারে ছারপোকা নেই—হুইস্কি খাওয়ার গল্পই হচ্ছে অভিজাত সাহিত্য।

তাই নিয়েই যত হোম্‌রামি!

চূণকামের সাহিত্যই অভিজাত সাহিত্য!—চূণকালির সাহিত্য!

আর রাস্তায় যারা বস্তা টানে, নোংরা বস্তিতে যারা কলহ করে, ছেঁড়া কাপড় পরে', উপোস করে' থাকে,—পাপে লিপ্ত, দারিদ্র্যে নিপীড়িত, রোগে কলুষিত; অজ্ঞানতায় অন্ধ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন,—তাদের নিয়ে যা কিছু সাহিত্য তাই সস্তা, অপকৃষ্ট?

অভিজাত সাহিত্য মানে গরদের পাঞ্জাবীর সাহিত্য! মোটরকারের সাহিত্য। কিন্তু পাঞ্জাবী ছিঁড়ে গেলে, বা টায়ার ফাট্‌লেই তা বেমালুম অপকৃষ্ট সাহিত্য হয়ে যাবে।

কাণাকে পদ্মলোচন বলে ডাকলেই সে অভিজাত!

'নওরোজ' কাজীকে খুব কাজে লাগিয়েছে।

কাজে লাগিয়েছে বটে, কিন্তু একেবারে বাজে করে' ছেড়েছে।

রোজ রোজ এরকম কর্‌লে 'নওরোজ'কে রোজা করতে হবে।

চারু বাঁড়ুয্যের পরেই সুরেশ বাঁড়ুয্যে।

কলমের কালি জিভের ডগায় এসে উঠেছে। 'বালি' আর 'মলম' নিয়ে অরসিক কোথায়? অরসিক না হলে কি আর 'আত্মশক্তি'তে এমন কবিতা বেরোয়?

কবিতা দুটী মোহিতলাল পকেটে পকেটে নিয়েই বেড়াতেন, কখন সত্যেন্দ্রনাথ দয়া করে' হঠাৎ কবিতা শুনতে চান। তা রাস্তায় গ্যাসের তলায়ই হোক্ বা চায়ের দোকানেই হোক্।

ভাগ্যিস ঝোঁকের মাথায় সত্যেন্দ্রনাথ 'কবর-ই-নূরজাহান' ছিঁড়ে ফেলেন নি। তাহলে ভবিষ্যতের পাঠকেরা মোহিতলালের কবিতার চেয়ে সত্যেন্দ্রনাথের 'কবর-ই নূরজাহানের' অধিকতর সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হত।

ভ্যাগিস সত্যেন্দ্রনাথ মোহিতলালের এ হিতটুকু করেন নি।

বাংলাদেশে এক কবি আছেন তাঁর নাম খালি-ঘাস-খায়।'

তিনি আবার কবিরাজ।

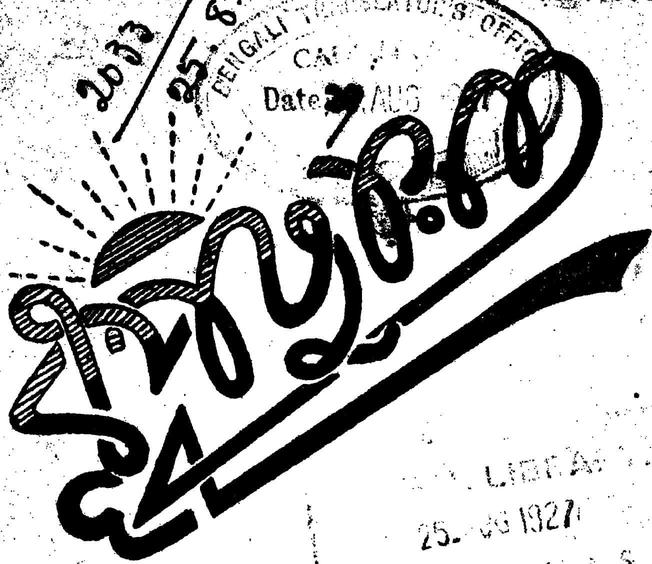
——:০:——

সাহিত্য সংবাদ

জ্যৈষ্ঠের উত্তরায় কাব্যদীপালি সম্বন্ধে এক বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। যথা—"এই "কাব্যদীপালী" যে সব কবির কবিতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে তার মাত্র কয়েকজনের নাম এখানে দিলাম—মাইকেল, নবীন সেন, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী" ? ? ? ?

Printed at the Bela Printing Works,
14, Ramanath Mazumdar Street, & Published from
79/23, Lower Circular Road, Calcutta,
by Sj. Suren Bhattacharyya.

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা। ভাদ্র ১৩৩৪ সাল।



প্রতি সংখ্যা ৴৹ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৷৹ টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সহ-সম্পাদক—শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য।

—:০:—



(মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৩৪ সাল

সম্পাদক

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য।

ধূপছায়া কার্য্যালয়

৭৯।২৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বিষয় সূচী।

ভাদ্র—১৩৩৪ সাল।





সমুদ্রের প্রতি

—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন

হে জলধি ! তব রূপ, উন্মাদন গম্ভীর চঞ্চল,
করেছে কবিকে কত মন্ত্রমুগ্ধ পাগল বিহ্বল ;
কি রহস্য প্রহেলিকা গুপ্ত আছে তব নীল জলে,
সুপ্ত হৃদয়ের যত আশা তৃষা পিয়াসা উথলে।

বিশ্ব যবে লুপ্ত ছিল, ছিল শুধু মহাশূন্য ব্যোম
সূচিভেদ্য তমোলিপ্ত, নাহি তারা, নাহি সূর্য্য সোম ;
ব্রহ্মের সমাধিঘন ভাবরাশি গলিয়া প্রথম
প্রকাশিলা তোমা', কিবা অবিজ্ঞেয় অপূর্ব্ব জনম !

তখন উল্লাসগর্ব্বে যে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভিলা,
সমভাবে চলেছে সে, অন্তহীন তব রুদ্রলীলা ;
রবিপ্রভ স্বর্ণ-অণ্ড ভাতি' সেই কারণ-সলিল,
প্রসবিলা পিতামহে, ক্রমে বিশ্ব শোভিল নিখিল।

প্রলয়হুঙ্কারে বিশ্ব গ্রাসিবারে নাচিতেছ যেন,
বিনাশে বিধ্বংসে তব সাধ কেন, মতি ঘৃণ্য হেন ?
ইহাতে কি সুখ লভ, ব্যথা কিছু হয় না তোমার ?
বৃথা নিন্দি', ক্রীড়ণক হস্তে তুমি অদৃষ্ট-ধাতার !

মন্থক্ষত হইয়াও কর দেবে অমৃতে অমর,
বিপন্ন মহীধ্রে রক্ষি' কীর্ত্তি-শৈল স্থাপিলা অক্ষর,
হর্ষ-সান্দ্র মন্দ্ররবে, মধুশ্চ্যুত শিশির সমীরে,
সেবাসত্রে দীক্ষিত হে, ক্ষুব্ধে কর লুব্ধ শান্ত ধীরে।

সদাপূর্ণ, রিক্ত নহ কভু, সৌম্য সোমের জনক !
বিষে নীল, বহ্নিদগ্ধ অঙ্গ, তবু আশ্রিত-পালক ;
লবণাক্ত বারি বটে, কিন্তু যদি রিক্ত হতে, তবে
বীভৎস দুর্লক্ষরূপ কলঙ্ক রটিত তব ভবে।

প্রলয়-সলিলে তব পুন যবে বিশ্ব লীন হবে,
তুমি মরিবে না, একা ধ্বংসস্তূপ বক্ষে লয়ে রবে
স্কন্ধে-সতী শিব যথা ; ঊর্ম্মিবাহু তুলি' রাত্রি দিন
ব্যাকুল বিলাপ-গীতি গর্জ্জিবে, উদ্বেল শ্রান্তিহীন।

আকাশ একক সাক্ষী, শুনিয়া সে করুণ ক্রন্দন
দুই চারি অশ্রুবিন্দু হয়ত বা করিবে বর্ষণ ;
ক্ষুব্ধ বুঝি বিশ্বম্ভর আসি শেষে শেষ-শয্যা পাতি'
নিদ্রিবেন, বক্ষ তব শান্ত করি, করজালে ভাতি'।

ক্রমে আকাশের সখ্য তব সনে হবে বদ্ধমূল,
সঙ্গগুণে উভয়ের বর্ণ দেহ প্রায় সমতুল ;

ফেনপুঞ্জ তারা হয়, কুণ্ডলিত শেষ শশী, আর
মুরারি কলঙ্কচিহ্ন, তুল্যরূপ নীলিমা বিস্তার।

আকাশ-সখাকে বাঁধি বাহুডোরে মহা আলিঙ্গনে,
সুদূর অনন্তপানে ছুটিতেছ, নিভৃত নির্জ্জনে
মরমের যত ব্যথা গূঢ় কথা জানায়ে, নিভাও
তাপ-জ্বালা, শান্তি-হিম-ফল্গু-পুরে কোথা ডুবে যাও ?

মর্য্যাদাপালক ! কভু নাহি লঙ্ঘ বেলা বননীল,
বিশেষ বিক্ষোভে তবু অমলিন রূপ অপঙ্কিল ;
চিরস্বচ্ছ হে নির্ম্মল তপোবৃদ্ধ পাপের অতীত,
সামধ্বনি মুখে নিত্য অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত।

কভু হরিতাভ নীল হিমশুভ্র বাড়ব-রঞ্জিত,
কভু শান্ত, ক্ষুব্ধ কভু, মেঘস্তম্ভ-আবর্ত্ত-মণ্ডিত ;
অনন্ত অবর্ণনীয় পরিণাহ স্বরূপ তোমার
কোথা শেষ সীমারেখা ? তুমি মহী-রত্নচন্দ্রহার।

"অধৃষ্য ও অভিগম্য যাদোরত্নৈ" উক্তি মিথ্যা আজি,
তরিছে, করিছে তোমা' সারশূন্য, কোথা রত্ন-রাজি ?
যে রত্ন ধর গো বক্ষে তার কাছে অন্য রত্ন ছার,
অধৃষ্য অজ্ঞেয় রুদ্র রবে চির, তোমা' নমস্কার।



ভোরের আলো

—শ্রীপ্রণবকুমার রায়

মূর্চ্ছিত দু'পহরের অলস অবকাশটী শোভনকে অতিষ্ঠ করে তুল্‌ল। দিন পোনেরো হোল, সে কলেজের পরীক্ষার পর তার ক্লান্ত দেহমনকে বিশ্রাম দেবার আশায় গিরিডিতে এসেচে। তার কাকা এখানকার ছেলে-দের স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শোভনের ইচ্ছে পূজোর ছুটীটা সে কাকার কাছেই কাটিয়ে যাবে।

বিছানায় চুপ্‌টী করে শুয়ে জান্‌লার ফাঁক দিয়ে সে দেখ্‌ছিল—খানিকটা তৃণহারা প্রান্তর আর এক টুক্‌রো আকাশ······স্বচ্ছ নীলিমার মাঝে শরতের শুক্তি-শুভ্র জল-হারা মেঘের ভেলা মন্থর গতিতে ভেসে যাচ্চে······

পাশ থেকে পরিত্যক্ত উপন্যাস খানা তুলে নিয়ে সে তার পাতায় মন বসাতে চেষ্টা করল।······কিন্তু নাঃ, সেই একঘেয়ে মামুলি প্লট, ব্যর্থ-প্রেমের হা-হুতাশ—অরুচি ধরে গ্যাচে।

বিরক্ত ভাবে বইখানা ফেলে রেখে শোভন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ভাবলে, অতীনদের 'ব্রিজের' বৈঠকে গিয়ে আড্ডা জমানো যাক্।······কিন্তু তাও বিশেষ রুচিকর ঠেক্‌ল না। সেই আড্ডাধারীদের 'গি হার্টস', 'টু রয়াল্‌স' প্রভৃতি বেতালা চীৎকার এই স্তব্ধ অবসরের সকল মাধুর্য্যই নষ্ট ক'রে দেবে। কি যেন ভেবে, সে টেবিলের ওপর থেকে বাঁশের বাঁশীটা তুলে নিয়ে, খালি পায়েই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।······রাঙা-কাঁকরের পায়ে চলা পথ—সেই পথ দিয়ে শোভন উদ্দেশ্যহীন ভাবে চল্‌ল······

পাতায় ছাওয়া একটা মহুয়া গাছের ছায়ায়, কোঁচার খুঁট্‌টা পেতে সে বসে পড়ল। চারিদিকে স্তব্ধতা······শুধু বাতাসেব দোলায় পাতার মৃদু-মর্ম্মর যেন কোন গোপন-চারিণীর মৃদু কথার আভাস। সুদূর নীল-দিগন্তের কোলে শ্যামল-ঘন শালবনের রেখা।

শোভন বাঁশীটা মুখে তুলে বাজাতে লাগল—

"—রৌদ্র-মাখানো অলস-বেলায়,
তরু-মর্ম্মরে, ছায়ার খেলায়,
কি মূরতি তব নীলাকাশ-শায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি।
আমি সুদূরের পিয়াসী—"

দু'পহরের নির্জ্জনতা বাঁশীর উদাস সুরে মুখর হ'য়ে উঠল।

(২)

চন্দ্রিমা তার ছোট ভাইটীর সঙ্গে 'লুডো' খেলছিল। এমনি সময়, বাতাসের সঙ্গে বাঁশীর একটী চেনা সুর ভেসে এলো তার কাণে—"আমি সুদূরের পিয়াসী—"

এই স্তব্ধ দু'পহরে কোন্ উদাস পথিক বাঁশী বাজায়?······চন্দ্রিমা রৌদ্রোজ্জ্বল উদার নীলাকাশের পানে একবার চাইলে—তার অন্তরের বন্দী প্রাণ যেন খাঁচার পাখীর মতই ব্যাকুলকরা উদাস সুরে গেয়ে উঠল—"আমি সুদূরের পিয়াসী—"

মন্টু বল্লে—"দিদি, তোমার ঘুঁটি চালো—আর খেলতে ভাল লাগচে না বুঝি?"

চন্দ্রিমা একটু অপ্রতিভ স্বরে বল্লে—"না, না, এই যে ঘুঁটি চাল্‌চি······

দূরে বাঁশী আবার গেয়ে উঠ্‌ল—

"—ওগো সুদূর—বিপুল সুদূর—
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী;
মোর ডানা নাই,
আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাসরি—"

সুদূর-পিয়াসী সেই পথিকের অশ্রু-ব্যাকুল সুর চন্দ্রিমাকে খেলা ভুলিয়ে আবার উন্মনা করে দিল।

আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে বৃদ্ধ প্রসন্নবাবু একখানা বিলাতি ম্যাগাজিন পড়্‌ছিলেন। ঘূর্ণি হাওয়ার মত চঞ্চল চরণে ছুটে গিয়ে চন্দ্রিমা তাঁর

হাতখানা ধরে এক টান দিয়ে বল্‌লে—"চলো না দাদু, একটু বেড়িয়ে আসি!"

স্নেহমধুর নয়নে নাৎনীর পানে চেয়ে প্রসন্নবাবু হেসে বল্‌লেন—"এই দুপুরে আবার কোথায় বেড়াতে যাবি দিদি?"

আব্‌দার-মাখানো সুরে চন্দ্রিমা বল্‌লে—"চলো না দাদু······কি চমৎকার বাঁশী বাজচে, একটু শুনে আসি চল······"

প্রসন্নবাবু অগত্যা চটি জোড়াটা পায়ে দিয়ে বল্‌লেন—"চল্ দিদি—"

চন্দ্রিমা তার শাড়ী-খানার ত্রুটী সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল।······ রাঙা-কাঁকরের আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে বাঁশীর সুর লক্ষ্য ক'রে চল্‌তে চল্‌তে চন্দ্রিমা সন্ধানী চোখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ তার নজর পড়্‌ল······কিছু দূরে মহুয়া গাছের ছায়ায় বসে একটী তরুণ বাঁশী বাজাচ্চে। কমলা-লেবু রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবী তার গায়ে, বেশ সুস্থ, সুগঠিত চেহারা।

প্রসন্নবাবুর সঙ্গে চন্দ্রিমা এগিয়ে চল্‌ল। শোভন তখন মশগুল হোয়ে একটা হিন্দি গজল্ বাজাচ্চে। গজলের প্রাণ-মাতানো মিঠে সুর বৃদ্ধ প্রসন্ন বাবুরও মরচে পড়া পুরাণো প্রাণ-বীণার তারে তারে কি এক ভুলে যাওয়া নব ঝঙ্কার জাগিয়ে তুল্‌ল······আর—চন্দ্রিমা তন্ময় হোয়ে শুন্‌ছিল।

খানিকক্ষণ পরে বাঁশী থামতেই প্রসন্নবাবু আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন—"বাঃ, অতি চমৎকার!"

শোভন চকিত হোয়ে পেছনে ফিরে চাইতেই বিস্ময়ে অবাক্ হোয়ে গেল।······একটী অচেনা শ্বেতকেশ বৃদ্ধের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে একটী বছর সতেরো-আঠারোর প্রস্ফুট-যৌবনা তরুণী। তাঁরা যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বাঁশী শুন্‌ছিলেন, শোভন তা' লক্ষ্যই করেনি।

একটু স্মিতহাসি হেসে প্রসন্নবাবু বললেন—"ভারি মিষ্টি তোমার হাত, বাবা—এমন চমৎকার বাঁশী আমি খুব কমই শুনেছি—"

শোভন লজ্জিত কণ্ঠে কি যেন বলতে গিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেল্‌লে—দেখ্‌লে, তরুণীর চোখের কোনে প্রশংসার দীপ্তি!

প্রসন্নবাবু শুধোলেন—"তুমি কোন বাড়ীতে থাক বাবা?—"

শোভন বল্‌লে—“বারগণ্ডায় সতীশ বাবুর বাড়ীতে, তিনি আমার কাকা হন,—ছুটীতে এসেছি বেড়াতে………”

প্রসন্নবাবু বল্‌লেন—“আমরাও এখানে অল্পদিন হোল বেড়াতে এসেছি—ওই লাল-বাংলাটায় আমরা থাকি……নোতুন জায়গায় এসে তোমার সঙ্গে আলাপ ক’রে ভারি খুসী হলুম বাবা! মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে যেও—কেমন?”

তারপর চন্দ্রিমার পানে ফিরে বল্‌লেন—“আমার এই দিদিটী গান-বাজনা বড় ভালবাসে……”

শোভন দেখ্‌লে, তরুণীর মল্লিকা ফুলের মত শুভ্র গালে লালের-আভা চমক দিয়ে গেল।

প্রসন্নবাবুর বাড়ীতে সে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলে পর, তাঁরা ফির্‌লেন।

শোভন চুপ ক’রে ব’সে রইল—বাঁশী বাজাতে আর মন লাগ্‌ল না……নীল আকাশে যেন কার সন্ধ্যা-তারার মত স্নিগ্ধ দুটী আঁখির প্রতিবিম্ব ফুটে উঠ্‌ল………

(৩)

দিন শেষে রক্ত-রাঙা অস্ত-সূর্য্য আহত পাখীর মত সন্ধ্যার নীড়ে ঢ’লে পড়েচে……তার বিদায়-বেলার ম্লান হাসিটুকু উশ্রী-নদীর স্বচ্ছ বুকে পড়ে, হীরের গুঁড়োর মত ঝিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌চে………

বালির পাড়ের ওপর বসে শোভন সূর্য্যাস্ত দেখ্‌ছিল। হঠাৎ পাশে কল-হাসি শুনে চেয়ে দেখ্‌লে, পরশুদিনের-দেখা সেই তরুণীটী একটী ফুট্‌-ফুটে সুন্দর খোকার হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে এই দিকেই আস্‌চে। অতসী রঙের শাড়ীতে তাকে ঠিক গোধূলির মত স্নিগ্ধ লাগ্‌ছিল। তার মেঘ-বরণ এলো-খোঁপায় একটী শ্যামল ধান-মঞ্জরী গোঁজা।

চোখে চোখ পড়তেই শোভন উঠে দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট নমস্কার করে বল্‌লে—“বেড়াতে গিয়েছিলেন বুঝি?”

চন্দ্রিমা যুক্তকর ললাটে ঠেকিয়ে বল্‌লে—“হ্যাঁ, বেড়িয়ে বাড়ী ফিরচি…”

মণ্টুর গালে তর্জ্জনী দিয়ে মৃদু আঘাত করে শোভন শুধোলে—“এটী বুঝি আপনার ছোট ভাই?……কি নাম তোমার খোকাবাবু?”

কিন্তু এই অচেনা যুবকটীর সঙ্গে ভাব করতে মণ্টুর তেমন আগ্রহ দেখা গেল না। দিদির কাছে আরো স'রে গিয়ে সে আস্তে আস্তে বল্‌লে —"প্রসূনকুমার—"

শোভন মৃদু হেসে বল্‌লে—"বাঃ, বেশ নাম তো!"

চন্দ্রিমা তার রক্ত-পলাশের পাপড়ির মত টুকটুকে অধরে জ্যোৎস্নার মত মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বল্‌লে—"কই, আপনি তো আমাদের বাড়ীতে গেলেন না?......চলুন না এখন—"

তেইশ বছরের তরুণের সাধ্য ছিল না, সে আহ্বানকে উপেক্ষা করে।

শোভন চন্দ্রিমা আর মণ্টুর সঙ্গে তাদের বাড়ীতে চল্‌ল।

শোভনকে দেখে প্রসন্নবাবু পুলকিত-স্বরে অভ্যর্থনা কর্‌লেন—"এসো বাবা, এসো—আমি রোজই ভাবি, তুমি আসবে—"

শোভন তাঁকে নমস্কার করে একটা চেয়ারে বসে বল্‌লে—"আপনি আজ বেড়াতে যান নি?"

"সব দিন আমি বেড়াতে যেতে পারি না—ওদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বেরোই বটে কিন্তু বেশী দূর চল্‌তে গেলে হাঁপিয়ে পড়ি—"

"এখানে এসে কি আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয় নি?"

—"মাত্র সপ্তাহ খানেক হোল এখানে এসেচি কিনা, তাই তেমন উন্নতি টের পাই নি। তবে জায়গাটা বেশ স্বাস্থ্যকর...... কোলকাতার সেই চিমনির ধোঁয়ায় কালো আকাশ আর ধূলো-ভরা বাতাস ছেড়ে প্রকৃতির এই লীলা-নিকেতনে এসে প্রাণটা যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে......"

তারপর নানা-কথা এসে পড়ল। খানিক পরে চন্দ্রিমা—"তোমাদের চা আনিগে যাই দাদু—" বলে অন্দরে চলে গেল।

তার যাওয়ার পথের পানে একবার তাকিয়ে প্রসন্নবাবু স্নেহ-বিগলিত-স্বরে বল্‌লেন—"ওইটী আমার নাৎনী চন্দ্রিমা......বাপ মা হারা দুটী কচি ভাই বোন মিলে এই বুড়োকে মায়ার বাঁধনে ঘিরে রেখেচে! কিন্তু চন্দ্রার মুখের পানে চাইলে বুকটা ফেটে যায় বাবা......এই কচি বয়সেই অভাগী স্বামীকে হারিয়েচে......কিন্তু যে ক'টা দিন বেঁচে আছি, সে ক'টা দিন তো ওকে বিধবার বেশে দেখতে পারব না বাবা, তাই ওকে কুমারীর বেশে সাজিয়ে রেখেচি......"

বল্‌তে বল্‌তে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর অশ্রু-করুণ হোয়ে উঠ্‌ল।

……চন্দ্রিমা বিধবা! কথাটা শোভনের বুকে একটা ব্যাথার কাঁটা হোয়ে বিঁধ্‌ল।

এম্‌নি সময় চন্দ্রিমা চা আর খাবারের ডিস্ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

শোভনের অন্তর সহসা বিদ্রোহী হোয়ে উঠ্‌ল তার পানে চেয়ে—এই শুভ্র-অমল ফুলটীর ফোটার আনন্দ অকালে ব্যর্থ হোয়ে গ্যাচে কোন্ অপরাধে?……চন্দ্রিমা নারী হোয়ে জন্মেচে বলেই কি জগতের সুখের ওপর তার কোনো দাবী দাওয়া নেই? এ-কি অন্যায় অবিচার স্বার্থপর সমাজের!……

এক কাপ চা' আর খাবারের ডিস্‌টা শোভনের দিকে এগিয়ে দিয়ে চন্দ্রিমা মৃদু হেসে শুধোলে—"আজকে আপনি বাঁশী আনেন নি?"

শোভন হেসে বল্‌লে—"বাঁশীটা আজ বাড়ীতে রেখে এসেছি…… আরেকদিন আনা যাবে'খন—"

প্রসন্নবাবু চন্দ্রিমাকে বল্‌লেন—"শোভনবাবুর বাঁশীর বদলে তুই-ই এক খানা গান শুনিয়ে দেনা দিদি—"

চন্দ্রিমা লজ্জা পেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—"না, না, দাদু—আমার গান শোনাবার মত নয়—"

শোভন অনুযোগের স্বরে বলে উঠ্‌ল—বাঃ, এ আপনার ভারি অন্যায় কিন্তু—আমারও তা হোলে আর কোনো দিন বাঁশী আনা চল্‌বে না……"

চন্দ্রিমার আর আপত্তি করা চল্‌ল না। হার্মোনিয়ামের সুরের সঙ্গে তার লজ্জা-মধুর কণ্ঠ মিলিয়ে সে গাইলে—

"পথ চেয়ে যে কেটে গেল
কত দিনে রাতে;
আজ ধূলার আসন ধন্য করে
বস্‌বে কি মোর সাথে?"

গান শেষ হোলে শোভন বিদায় চাইলে।

প্রসন্নবাবু বল্‌লেন—"মাঝে মাঝে এসো বাবা—"

শোভনকে দুয়ার অবধি এগিয়ে দিয়ে, একটুখানি মুখ বাড়িয়ে চন্দ্রিমা বলে দিলে—"কাল বাঁশীটা আন্‌তে ভুল্‌বেন না কিন্তু—"

"আচ্ছা, আন্‌ব"—বলে শোভন আর একবার পেছন ফিরে তাকাল—কিন্তু চন্দ্রিমার মুখখানি সেখানে তখন ছিল না।

······ম্লান জ্যোৎস্নালোকিত পথ দিয়ে বাড়ী ফির্‌তে ফির্‌তে শোভন ভাব্‌ছিল—যে ফুলে এক দেবতার পূজা হোয়েচে, সে ফুল কি অন্য দেবতার পূজায় নিবেদন করা চলে না?······

(৪)

চন্দ্রিমা শুধোলে—"আচ্ছা শোভনবাবু, উশ্রী ফল্‌স্ এখান থেকে কত দূরে?"

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে শোভন বল্‌লে—"প্রায় সাত আট মাইল হবে—"

এ ক'দিন মেলামেশার ফলে চন্দ্রিমার সঙ্গে শোভনের আলাপ নিবিড় হোয়ে উঠেচে। আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় সে চন্দ্রিমাদের চা'য়ের বৈঠকে হাজিরা দেয়। অল্প কয়েক দিনের পরিচয়েই চন্দ্রিমার মুখের হাসি, আঁখির স্নিগ্ধতা, মধুর স্বর—চন্দ্রিমার সব কিছু কেন যে তার এত প্রিয় হোয়ে উঠ্‌ল, তা সে নিজেই জানে না। কিন্তু চন্দ্রিমাকে সে আজও চিন্‌তে পারে নি—কখনো সে গিরি-ঝর্ণার মতই হাস্য-চঞ্চলা, কখনো সন্ধ্যাকাশের মত স্তব্ধ-গম্ভীর।

চন্দ্রিমা উৎসাহিতা হোয়ে বল্‌লে—"চলুন না একদিন সেখানে গিয়ে পিক্‌নিক্ ক'রে আসা যাক্······তুমি কিন্তু অমত কর্‌তে পার্‌বে না দাদু···"

প্রসন্নবাবু সস্নেহ হাসি হেসে বল্‌লেন—"অমত কর্‌তে দিস্ কই, দিদি?"

চন্দ্রিমা বল্‌লে—"তা' বোলে তোমায় কিন্তু ছাড়ব না দাদু—তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে—"

তারপর শোভনের সঙ্গে সে 'পিক্‌নিকে'র সম্বন্ধে পরামর্শ করতে বস্‌ল। শেষে ঠিক হোল, পরদিন সকালে শোভন গাড়ী নিয়ে আস্‌বে, চন্দ্রিমা-রা যাবার ব্যবস্থা করে প্রস্তুত হয়ে থাক্‌বে।

পরদিন শোভন যথাসময়ে গাড়ী নিয়ে এসে হাজির হোল। চন্দ্রিমারা দরকারী জিনিষ পত্তর নিয়ে সকলে মিলে উশ্রী-প্রপাত দেখ্‌তে যাত্রা কর্‌ল।

গাড়ী এসে থাম্‌ল যেখানে, সেখানেই পথ শেষ হোয়েচে। শুধু একটা পায়ে-চলা পথের অস্পষ্ট রেখা সাম্‌নের ছায়া নিবিড় ঘন-বনের মাঝে দেখা যাচ্ছিল। একজন সাঁওতাল কুলির হাতে জিনিষ-পত্তর গুলো দিয়ে সকলে সেই পথ-রেখা ধরে চল্‌লেন। শোভন কখনো লতা ছিঁড়ে, কখনো পল্লব-ঘন গাছের শাখা সরিয়ে পথ ক'রে অগ্রসর হচ্ছিল।

বনের মাঝ থেকেই উশ্রী-প্রপাতের উচ্ছল ঝর্ ঝর্ শব্দ শোনা গেল। ক্রমেই সেই শব্দ স্পষ্ট গম্ভীর হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল·········

হঠাৎ সাম্‌নে এক অপরূপ দৃশ্য দেখে সকলে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।··· সাম্‌নে কঠিন পাষাণের বুক বেয়ে শরতের জ্যোৎস্নার মত শুভ্র উচ্ছ্বসিত জলরাশি দুরন্ত শিশুর মত কল্লোলে উল্লাসে নিতল গভীরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে প্রসন্নবাবুর মুখ দিয়ে শুধু বেরুল—"চমৎকার"—

আর চন্দ্রিমা বাক্‌হারা বিস্ময়ে চেয়ে রইল—সামনের ওই বন্ধনহারা পাগল নির্ঝরের দিকে।

খানিকক্ষণ পরে চন্দ্রিমা একটা বড় পাথর-খণ্ডের ওপর প্রসন্নবাবুকে বসিয়ে বল্‌লে—"তুমি মণ্টুকে নিয়ে বিশ্রাম করো দাদু, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি—সাঁওতালি চাকরটা রইল, দরকার হোলে আমাদের ডাক্‌তে পাঠিও—"

তারপর শোভনকে বল্‌লে—"চলুন শোভন বাবু, এই নোতুন জায়গায় খানিকটা ঘুরে আসি—"

নিভৃত বন-পথটী ধরে তারা দু'জনে পাশাপাশি চল্‌ল—গল্প করতে কর্‌তে।

কিছুদূর যাবার পর পথের পাশে একরাশি শুক্‌নো পাতার মধ্যে খড়্ খড়্ আওয়াজ হোল—সঙ্গে সঙ্গে ভয়-বিহ্বলা চন্দ্রিমা জ্ঞানহারা হোয়ে শোভনকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠল—"সাপ"—"সাপ"—

আচম্‌কা চন্দ্রিমা তাকে জড়িয়ে ধরাতে শোভন হতবুদ্ধি হোয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় সাপটা তাদের দিকে না এসে ঘন লতা-গুল্মের মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে গেল। চন্দ্রিমা তখন নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে স'রে দাঁড়াল……লজ্জার অরুণিমায় তার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছে।

বিকশিত-যৌবনা চন্দ্রিমার পুষ্প-পেলব অঙ্গ পরশে শোভনের রক্ত-চঞ্চল বুকখানা কি এক মাদকতায় তখনো শিউরে উঠ্‌ছিল।………

দু'জনেই নীরব, মূক! খানিকক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভেঙ্গে চন্দ্রিমা বল্‌লে—"চলুন, ফেরা যাক্—"

প্রসন্নবাবুর কাছে ফিরে এসে চন্দ্রিমা জল-খাবারের ব্যবস্থা কর্‌ল। খাওয়া দাওয়া শেষ হোলে, প্রসন্নবাবু বল্‌লেন—"চল এই বার বাড়ী ফেরা যাক্—সন্ধ্যার আগে গিয়ে পৌঁছ'তে হবে—"

বাড়ী ফের্‌বার সময় শোভন আর চন্দ্রিমার হাসি গল্পের উৎস-মুখে কেমন একটা সঙ্কোচের পাথর চাপা রইলো।

(৫)

শোভন প্রসন্নবাবুর সঙ্গে রুষ-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌ছিলো।

প্রসন্নবাবুর অনেক পড়া শোনা আছে, শোভন তার পরিচয় পেয়েছিল। দেহটা তার বার্দ্ধক্যের ঘাটে গিয়ে পৌঁছলেও, মনটা তাঁর আজো নব-কিশলয়ের মতই তরুণ রয়েচে। পড়ার আগ্রহ তাঁর একটুও কমেনি, বরং সে অভ্যাসটা যেন নেশার মত তাঁকে পেয়ে বসেচে। দেশবিদেশের সাহিত্যের অনেক খবর রাখেন তিনি—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে ন্যুট্‌-হামসুন্ গোর্কি পর্য্যন্ত।

প্রসন্নবাবু বল্‌ছিলেন, "উৎপীড়িত মানবের চিরন্তন ব্যথা-বেদনাকে আশ্রয় করেই বর্ত্তমান রুষ-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। টলষ্টয় লিখে গ্যাচেন জীবনের নিত্যকার সুখ-দুঃখের কাহিনী; আর গোর্কি রূপ দিয়েচেন শুধু নিপীড়িত জীবনের তিক্ত বেদনাকে।"

এমনি সময় চন্দ্রিমা এসে বল্‌লে, "তোমাদের আলোচনা থামাও দাদু—কি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে, উশ্রীর ধারে খানিক বেড়িয়ে আসি চলো—"

প্রসন্নবাবু আপত্তি করে বল্‌লেন—"বেতো রুগী আমি, আমার অত

কবিত্ব সহ্য হবে না দিদি—তার চেয়ে শোভনের সঙ্গে তুই বেড়িয়ে আয়—কিন্তু বেশী রাত করিস্ নি যেন—"

একলা চন্দ্রিমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবার প্রস্তাবে শোভন একটু দ্বিধা বোধ করল। চন্দ্রিমা কিন্তু অসঙ্কোচ স্বরে তাকে বল্‌লে—"চলুন শোভন-বাবু—"

স্বচ্ছ নীলাকাশ থেকে শারদ পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্না রূপালি ঝর্ণার মতই অফুরন্ত ধারায় ঝরে পড়্‌চে।

স্বল্প-সলিলা উশ্রী একটী ক্ষীণ রজত-ধারার মত বালির ওপর দিয়ে শান্ত গতিতে বইচে।

চন্দ্রিমা মৃদু স্বরে গাইতে লাগ্‌ল—

"নীল-আকাশের অসীম ছেয়ে
ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো—"

শোভন তার সুরে সুর মিলিয়ে বাঁশীতে ফুঁ দিল। মৌনরাত্রির নীরবতা গানের সুরে মুখর হোয়ে উঠ্‌ল। শরৎ-চাঁদের এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল—চন্দ্রিমার শ্বেত-পদ্মের মত সুন্দর মুখখানির পরে। বাতাসের ঝাপ্‌টায় ফুরফুরে চূর্ণ-কুন্তলগুলি বার বার তার মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

শোভনের মুগ্ধ চোখে আর পলক পড়ল না।......এই নির্জ্জন রাত্রি, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, যৌবনময়ী সঙ্গিনী,—শোভনের তরুণ হিয়া এক অজানা নেশায় মাতাল হোয়ে উঠ্‌ল। আজ তার মনে হোল, চন্দ্রিমাকে সে ভালবাসে।

অজান্‌তে তার বাঁশী কখন যে থেমে গিয়েছিল, সে দিকে তার খেয়াল ছিল না।

চন্দ্রিমা একটু আশ্চর্য্য হোয়ে বল্‌লে—"ওকি শোভনবাবু, বাঁশী থামালেন কেন?"

শোভন সহসা চন্দ্রিমার একখানি নিটোল-কোমল কর-পল্লব নিজের দু'হাতের মধ্যে তুলে নিজে আবেগ-কম্পিত স্বরে ডাক্‌লে—"চন্দ্রা—"

শোভনের সেই তৃষিত চাউনি দেখে চন্দ্রিকা শিউরে উঠ্‌ল।.........ছিঃ সে যে বিধবা!

শোভন মাতালের মত বিহ্বল স্বরে বল্‌তে লাগল—"চন্দ্রা, তোমায় আমি—"

এক ঝট্‌কায় নিজের হাতখানা মুক্ত করে নিয়ে, নীরস-কঠিন স্বরে বলে উঠল—"বড় মাথা ধরেচে শোভনবাবু, বাড়ী চল্লুম—"

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে এগিয়ে চল্‌ল।

(৬)

কনক-প্রভাতের শুভ্র ললাটে ঊষা তখন নব-অরুণ তিলক এঁকে দিচ্ছিল।

বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে বসে শোভন ভাবছিল—গত রাত্রের ঘটনাটা। তার কাল্‌কের আচরণের জন্য সে মনে মনে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হ'য়েছিল......কেন সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নিজেকে সে সংযত কর্‌তে পার্‌লে না?......এতটা শিথিল চরিত্র সে!

এম্‌নি সময় সে দেখ্‌লে বাগানের ফটক পার হোয়ে মণ্টু এ দিকেই আস্‌চে। শোভনকে দেখে সে বল্‌লে—"দিদি আপনাকে একবার ডাক্‌চে শোভনবাবু—'

শোভন বিস্ময়ে স্তব্ধ হোয়ে গেল।......জগতে সব চেয়ে দুর্ব্বোধ্য নারীর অন্তরের রহস্য! সে ভাব্‌লে গত রাতের সেই আচরণের পর আবার চন্দ্রিমাদের বাড়ী যাওয়া উচিত কি না।

কিন্তু কি যেন ভেবে সে মণ্টুকে বল্‌লে—"চল ভাই যাচ্চি—"

বাড়ীর সাম্‌নে ছোট্ট ফুল বাগানে প্রসন্নবাবু পায়চারি কর্‌ছিলেন।

শোভনকে দেখে তিনি প্রফুল্ল মনে হেসে বল্‌লেন—"সকাল বেলার এই স্নিগ্ধ আলো-বাতাসে একটু বেড়াচ্চি—এতে শরীর-মন বেশ প্রফুল্ল হোয়ে ওঠে। তুমি ঘরে গিয়ে বোসো গে যাও বাবা—আমি আর একটু বেড়িয়ে যাচ্চি......"

বাগান পার হোয়ে মণ্টু শোভনকে বল্‌লে—"দিদি ওই ঘরে আছে—"

দুয়ারের সাম্‌নে যেতেই যে দৃশ্যটা তার চোখে পড়ল, তা' দেখে শোভন থম্‌কে দাঁড়াল।......দেখ্‌লে, একটী তরুণ যুবকের ফোটোর তলায় চন্দ্রিমা গলায় আঁচল দিয়ে প্রণতা হোয়ে লুটিয়ে পড়েচে—পূজায় অর্ঘ্য দেওয়া এক অঞ্জলি শেফালির মতই।

শোভন বুঝ্‌লে ফটোখানা চন্দ্রিমার স্বর্গগত স্বামীর ছবি। সঙ্গে সঙ্গে এই তরুণীটীর প্রতি শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে তার মন ভরে উঠ্‌ল।

চন্দ্রিমা প্রণাম শেষ করে উঠ্‌তেই শোভন দেখ্‌লে—তার আয়ত আঁখির কুলে দু'ফোঁটা অশ্রুশিশির জ্বল্‌চে।

শোভনকে দেখে চন্দ্রিমা হাঁটু গেড়ে বসে, তার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বল্‌লে—"বড় ভায়ের স্নেহ কেমন তা জানি না, আজ থেকে তুমি আমার দাদা হোলে শোভন দা"

দীপ্তা মহিমাময়ী তাপসীর মত এই শুচি-স্নিগ্ধা তরুণীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে শোভনেরও অন্তর পবিত্র ভাবে পূর্ণ হোয়ে উঠ্‌ল!

ধীরে চন্দ্রিমার মাথায় হাতখানি রেখে সে স্নেহ-কোমল স্বরে বল্‌লে—"তাই হোক্ বোন্—ভোরের আলো সাক্ষী করে এই যে নোতুন সম্পর্ক আমাদের মধ্যে আজ গড়ে উঠ্‌লো, একে চিরদিন এম্‌নি পবিত্র রাখ্‌তে চেষ্টা করবো—"

—:০:—

নীলকণ্ঠ

উপন্যাস

—ছয়—

বৃন্দাবন সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

দুয়ারে সজোরে পদাঘাত করিবার শব্দ তাঁহার ঘুম ভাঙাইয়া দিল। প্রথমে কারণ বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন হয়ত ডাকাত পড়িয়াছে। শঙ্কিত হইয়া তিনি আলো হাতে লইয়া শব্দ অনুসরণ করিলেন। মালতীর ঘরের কাছে আসিয়া দেখিলেন, মালতী বাহিরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে আর গোপাল ভিতর হইতে দুয়ার ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে রে তোদের? ব্যাপার কি? এতদিন পরে বাড়ী এল,—এসেই ঝগড়া?"

মালতী শ্বশুরকে দেখিয়া লজ্জিত হইল। সে দুয়ার খুলিয়া দিল।

গোপাল মুক্ত হইয়াই মালতীকে আক্রমণ করিতে ছুটিতেছিল, কিন্তু পিতার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

"গোপাল!"

গোপাল কথা কহিতে গিয়া পারিল না। পিতার এ রকম উগ্রমূর্ত্তি সে আগে কখনো দেখে নাই।

তাহার পকেটে গহনাগুলা উঁচু হইয়া দেখা যাইতেছিল। সেদিকে দৃষ্টি পড়ায় বৃন্দাবন বুঝিতে পারিলেন কিসের জন্য এই গোলমাল।

বলিলেন, "চুরি করছিলে তুমি?"

লজ্জায় গোপাল মাথা নত করিল। ক্ষীণস্বরে বলিল "আমাকে মাপ কর বাবা।"

"কতদূর অন্যায় তুমি করেছ বুঝতে পারছ কি? টাকার দরকার তোমার যদি হয়ে থাকে আমায় বললে না কেন? আমি কি এপর্য্যন্ত কখনো তোমার কোন আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিয়েছি?..................যাও! সমস্ত রেখে এস!"

গোপাল তাঁর আদেশ প্রতিপালন করিল।

মালতী বাক্সে চাবি বন্ধ করিল।

বৃন্দাবন বলিলেন "বুঝতে পারছ কি তুমি কতদূর অধঃপাতে গিয়েছো? আজ নিজের ঘরে চুরি করতে এসেছ, কাল পরের ঘরে ডাকাতি করবে! অভাব জিনিষটা এমনি করেই মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। যাক্, কেন তোমার টাকা দরকার পড়েছে বলতে বাধা আছে কি? সত্য কথা বলবে! সত্য বল্তে না পার আমি বানানো ওজর শুনতে চাই না। বল তুমি! ভয় পাচ্ছ কেন?"

গোপাল ইতঃস্তত করিয়া শেষে বলিল "বিলাত যাব।"

বৃন্দাবন স্তম্ভিত হইলেন। বলিলেন "বিলাত যাবে? তাই তখন দুবছর ছেড়ে থাকার কথা বলছিলে?.........ওঃ!.........তা' একথা আমার কাছে স্পষ্ট জানালে না কেন? সত্য কথা বলে টাকা চাইলে এই চুরির অপবাদ নিতে হত না!"

গোপাল চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বৃন্দাবন আবার বলিলেন "কত টাকা চাই ?"

"দশ হাজার।——পাঁচ হাজার আমি যোগাড় করেছি।"

"যোগাড় করেছ ?······কোথা থেকে ?······বাড়ীটী বাঁধা দাও নি ত ? ······চুপ করে রইলে যে ?······বুঝেছি ! ছিঃ ছিঃ। আমাকে না বলে — এটীও যে চুরি তা বোধ হয় বুঝতে পারবে না। কলিকাতায় থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছ। বিলাত গিয়ে আরও শিক্ষা পেয়ে হয়ত বুড়ো বাপের গলায় ছুরি বসাবে।·········কবে যাবে ?"

"আসছে বৃহস্পতিবার।"

"বেশ যেও ! টাকা আমি দেব'খন ! তার জন্য ভেব না। আর········· বাড়ী কার কাছে বাঁধা রেখেছ নামটা আমায় জানিও, আমি শোধ করে দেব। আর·········আর········· ! না, আর কিছু আমার বলবার নেই !············ মালতী ! চ'মা ! আমার পা দুটো কাঁপছে, দাঁড়াতে পারছি না। আমায় আমার ঘরটী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিবি চ' ! যাও, গোপাল। নিশ্চিন্ত হয়ে শোওগে ! টাকার ভাবনা ভেব না ! শুধু অনুরোধ—বাপ হয়ে তোমাকে অনুরোধ করছি, মানুষ হয়ে জন্মেছ——মানুষ ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে বড় জাত—— মানুষের যা করা উচিত নয় এমন হীন কাজ কখনো ক'র না। আমায় ভুলে যেতে চাও, যেও ! তবু বলি মনুষ্যত্ব হারিও না। ওটা বড় ঠুনকো জিনিষ। একবার ভাঙলে আর জোড়া লাগে না !"

বৃন্দাবন মালতীর হাত ধরিয়া আপনার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। মালতীকে বলিলেন "রাখতে পারব না মা। ও একেবারেই বিগ্‌ড়েছে। বারণ করলে আরও বেশী বাড়াবাড়ি করবে। তার চেয়ে অনুমতি দেওয়াই ভাল। ভগবান ভাল রাখুন—আর কিছু চাই না। তোর দুঃখের বরাত। ভেবে আর কি করবি ?"

মালতী বলিল "অকৃতজ্ঞ ছেলের কথা মনে না রেখে ঠাকুরের সেবায় সব ভুলে আত্মনিবেশ কর বাবা ! আর এ কষ্ট বুকে বাজবে না। ছেলের চেয়ে ঠাকুর বড় বলে' ভাবতে চেষ্টা কর !"

"তাই ভাল মা ! যে আমাদের মুখ চায় না আমরাও তার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলব। ও যা খুসী করুক। কিন্তু······ভুলব মনে করতেও ভয় হয়। ······না, পারব না।······মালতী, ওকে বারণ করে দে,—যেতে বারণ করে

দে! সে যে কত দূরের পথ। কলিকাতায় ছিল, খবর না পেলেও তবু জানতুম কাছে আছে।......আমি যেতে দেব না। বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে থাকব। যেতে হলে আমার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে, আমায় মেরে ফেলে দিয়ে, যাক্......"

"বাবা! অস্থির হোয়ো না! চুপ কর তুমি। ঘুমোও।"

"তাকে ডেকে দে মালতী!—যাবার আগে আমায় মেরে যাক্! আমি তার পথ আগ্‌লিয়ে থাকব! যেতে দেব না!......কেন সে যাবে? কিসের অভাব তার? জাত-ধর্ম্ম সব খোয়াতে যাবে কিসের জন্য?......ঠিক বল্‌ছিস মা! ছেলের চেয়ে ধর্ম্ম বড়। ভগবানকে ভুলে আমরা ছেলে ছেলে করে ভেবে মরি তাই কষ্ট পাই। সে যায় যাক্। আমরা তাকে ভুলে যাব। নিখিল চলে গেছে—তাকে ভুলে থাক্‌তে পেরেছি,—গোপাল ছেড়ে যাচ্ছে তাকেও ভুলে থাক্‌ব! মাগো! অন্তিমে তোর নাম যেন না ভুলি!......ঘুমুতে বলছিস্। ওরে মালতী! বুক জ্বলে যাচ্ছে! কেমন করে ঘুমুব?......বলছে অনেক দিনের ইচ্ছে! তাই! ভাবতে পারি না; যাক্ গে, দুবছরের জন্যে ত! যেখানে খুসী—যাক্ গে! তাকে বাঁচিয়ে রেখ মা দুর্গে! দুর্গতিনাশিনী!...... অভিশাপ দিস্‌নি মা! মালতী! চোখের জল ফেলিস্ নি। দীর্ঘনিশ্বাস না পড়ে! যে যেতে চাচ্ছে, হাসিমুখে অনুমতি দিস্; তার অমঙ্গল না হয়!......"

বাকী রাতটুকু এমনি করিয়া ভোরের দিকে বৃন্দাবন ঘুমাইয়া পড়িলেন। মালতী সমস্তক্ষণ পাশে বসিয়া জাগিয়া রহিল। শ্বশুরের জন্য তাহার ভাবনার অন্ত ছিল না। এইরূপ উত্তেজিত হইয়া বকিতে বকিতে যদি জ্বর হয় তবে সারান শক্ত হইবে। সবে অসুখ হইতে উঠিয়াছেন। মনে মনে সে কেবলি দুর্গানাম স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছিল তাঁর যেন কিছু না হয়।

সকালবেলা বৃন্দাবনের ঘুম ভাঙ্গিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। গোপাল আসিয়া দেখা করিল। তিনি তখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। বলিলেন, 'যাবার সময় মুখ ভার ক'র না। মায়ের আশীর্ব্বাদে, ভাল থেক' এই প্রার্থনা করছি। যখন যা দরকার হবে লিখে পাঠিও। তোমার কাছে যে টাকা আছে তার মধ্যে আপাততঃ যা দরকার তাই শুধু কাছে রাখ, বাকী আমাকে দাও। আরও পাঁচ হাজার দিয়ে আমি লণ্ডনের এক ব্যাঙ্কে জমা রাখবার বন্দোবস্ত করে দেব।''

গোপাল বাকী রাতটায় বিছানায় শুইয়া ভাবিয়াছিল বিলাত যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে। পিতার পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিবে ও আর কখনও কলিকাতায় ফিরিবে না। পিতার কাতরোক্তি স্বকর্ণে না শুনিয়াও সে সমস্তই অনুভব করিয়াছিল। বিলাত যাইবার জন্য তার এত জেদ হইবার কারণ যা কিছু ছিল, তাদের কোনটাই বিশেষ গুরুতর নয়। মালতীর প্রতি বিতৃষ্ণায় মন তার যখন পূর্ণ ছিল, মালতীকে বিবাহ করার মত মস্ত ভুলের ফলে নিজের জীবনকে সব দিকে বিফল করিয়াছে, এই কথাটাই যখন মনের মধ্যে কেবলি খোঁচা মারিত, এমন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তার মনে হইয়াছিল, কিছুদিন বিদেশে ঘুরিয়া আসিলে নিজেকে আবার নূতন উৎসাহ ও উদ্যমের মাঝে নূতন দিকে চালাইতে পারিবে। নূতন দেশ দেখা হইবে, তাছাড়া হয়ত— মালতীকে একেবারে ভুলিয়া, তার দেওয়া অপমানের ছাপ মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিবার সুযোগ হইবে। তাহার এইরূপ সঙ্কল্প মনের আনাচে কানাচে উঁকি মারিত, এতদিন স্পষ্ট করিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করে নাই। নীরজার কাছে সুভাষ কথাটা প্রকাশ করার পর, বিশেষতঃ নীরজা যখন প্রথমে সামান্য চঞ্চল হইলেও শেষে প্রকাশ্যে তাহাকে উৎসাহ দিয়াছিল, গোপাল দিন কতকের মধ্যেই নিজেকে দৃঢ় করিল। ভাবিল, দু' এক বছর বেড়াইয়া আসিবে, তাহাতে ক্ষতি কি? তার উপর যদি আই, সি, এস, টা পাশ করিয়া একটা জর্জীয়তী জয় করিতে পারে, তা'হলেও আর কিছু না হক, মালতীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে পারিবে, সে একজন নগণ্য কেহ নয়। মালতীর মত দশটা রূপবতী নারী তাহার পায়ের তলায় বসিবার অধিকার পাইলে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিবে। আজ কিন্তু পিতার কষ্টের কথা মনে হওয়ায় সে সব সম্পদ ত্যাগ করিবে ভাবিতেছিল। গত রাত্রে পিতার কাছে তিরস্কৃত হইলে দুর্ম্মতিকে জয় করিয়া সুমতি ধীরে ধীরে উঁকি মারিতেছিল।

আবার, এখন পিতার কথা শুনিয়া ও তাঁর সহজ ভাব লক্ষ্য করিয়া গোপাল মনে করিল, তিনি প্রশান্ত মনেই অনুমতি দিতেছেন। স্নেহের বশে দীর্ঘকাল অদর্শনের কথা ভাবিয়াই যা একটু কাতর হইয়াছেন তা সেটুকু দু'দিনেই ভুলিয়া যাইবেন। পিতার অনুমতি পাইয়া তাহার যাইবার ইচ্ছাটা ফের নূতন করিয়া মনে জাগিল। সে হাসি মুখে পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিয়া লইল।

—সাত

গোপালের সঙ্গে নীরজা সুরথ ও সুভাষ হাওড়া ষ্টেশনে গিয়াছিল। পনের মিনিট মাত্র ট্রেণ ছাড়িতে বাকী। তারপর কত সুদীর্ঘ দিন আর দেখা হইবে না। এই মিনিট ক'টা কাটিয়া গেলে আর যে জীবনে কখনও গোপালের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তা কে বলিতে পারে? ক্ষণস্থায়ী মানুষের এই দুটা বছরের ভিতর কতই না বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে! এইরূপ অনেক রকম ভয় ভাবনা মনে জাগিয়া সকলকে ব্যথিত করিতেছিল। নীরজা কথা কহিতেছিল না। তাহার জলভরা চোখ দুইটী স্থির হইয়া গোপালের দিকে চাহিয়া ছিল। সে চাহনিতে ব্যাকুল বেদনা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া গোপালকে কাছে রাখিতে চাহিতেছিল। গোপালও চঞ্চল হইল। নীরজার স্নেহের আকর্ষণ হইতে দূরে যাইতে মন সরিতেছিল না। এতদিন নীরজা যে তাহাকে সহাস্য বদনে উৎসাহ দিয়াছে, সত্যই কি সেটা ভ্রম? নীরজা তাহাকে এতদিনের পরিচয়ে, পর এবং নিঃসম্পর্কীয় বন্ধু মাত্র বলিয়া ভাবে না—!—আপনার ভাইএরও অধিক ভালবাসে! গোপাল এই কথাটা আজ প্রাণ দিয়া বুঝিল। এই ভালবাসা কত নিবিড়, এতদিন সে সম্বন্ধে তাহার কখনও কৌতুহল জাগে নাই। আজ সহসা যেন সে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃতের সন্ধান পাইয়াছে! আজ সে বুঝিল এক মালতীর উপর রাগ করিয়া দূরে যাইতে গিয়া কত লোকের বুকে ব্যথা দিয়াছে! পিতার কথাও মনে হইল। সুভাষ এক পাশে দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁদিতেছিল। সুরথও বিহ্বল হইয়াছিল। মালতীর উপেক্ষিত হইয়াও গোপাল যে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য পাইয়াছিল। পিতা, নীরজা, সুরথ, সুভাষ—সবাই তাহাকে চায়। সবার ভালবাসার প্রতিদানে সে আজ শুধু অবহেলা ছাড়া আর কিছুই ত দিল না! মনের মধ্যে দ্বিধা জাগিতেছিল, সে এখনই নামিয়া আসে! পিতা, বোন, বন্ধু ও ভাইএর কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে বিলাইয়া দিয়া এই অমৃত আকণ্ঠ পান করে!

পাঁচ মিনিট আগের ঘণ্টা বাজিল। সুরথ নীরজা ও গোপালের দিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়াছিল। বন্ধুর আসন্ন বিরহে সে যারপর নাই কাতর হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার মনে হইল, নীরজার আজকের এই অস্থিরতা যেন কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতেছে। দু' বছর পরে আসিবে, ইহা ত আর চিরনির্ব্বাসন নয়। মেয়েরা যেন স্বভাবতঃই অল্পেই অধিকতর চঞ্চল হয়। সুরথ ভাবিতেছিল, নীরজার এতটা কাতর হওয়া উচিত হয় নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া উচিত অনুচিতের মাপকাটি দিয়া সব সময়ে মনটাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা ত আর সম্ভব নয়। অন্ততঃ নীরজা তা পারিল না। তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল, গোপালকে বারণ করে। ভাবিতেছিল, সে যদি গোপালের হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইয়া লইয়া আসে, সে কি তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার চলিয়া যাইতে পারে? সত্যই কি এতই সে নিষ্ঠুর? নীরজা তাহার আপনার বোন নয়, তাই বলিয়া কি গোপালের উপর তার এতটুকুও দাবী নাই। সে না হয় পর—তাহার অকপট স্নেহ ভালবাসা গোপাল হতাদর ও উপেক্ষা করিয়া চলিল—কিন্তু তাহার পিতাও ত নিশ্চয় তাহাকে ফিরিয়া ডাকিতেছেন, সে তাহাও ত শুনিল না! গোপাল যদি তার আপন ভাই হইত, হয়ত তাহলেও সে এমনি কাঁদাইয়া যাইত!

গোপাল নীরজার ব্যথিত দৃষ্টি অনুভব করিয়া নামিবে কি না ইতস্ততঃ করিতেছিল। এক একবার মনে হইতেছিল, সে যদি ফিরিয়া আসে, আশে পাশে যতলোক দাঁড়াইয়া তাহাদের দেখিতেছে, দুর্ব্বল ও অস্থিরমতি বলিয়া কতই না অবজ্ঞা করিবে। আর শুধু তাই নয়, মালতী পর্য্যন্ত তাহাকে ভ্রূকুটী করিয়া বলিবে, "এই ত তোমার সাহস! এরই অহঙ্কার করিতে লজ্জা হয় না?" না—সে চিন্তা অসহ্য। এতদূর আসিয়া আর ফেরা যায় না!

শেষ ঘণ্টা বাজিয়া গেল। তাহার আর নামা হইল না! গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। নীরজা আর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া রুদ্ধস্বরে ডাকিল "ঠাকুরপো! যেও না! নেবে এস! ফিরে এস! এখনও সময় আছে—লাফিয়ে পড়!"

গোপাল সে কথা শুনিয়াছিল কি না বোঝা গেল না। গাড়ীখানার শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বাতাসে মিলাইয়া গেল।

সুরথ ডাকিল "নীরজা"!

নীরজা চমকিয়া বলিল "হাঁ, যাই চল!"

আপনার অজ্ঞাতে, তাহার অন্তর মধ্যে যে গম্ভীর হাহাকার তোলপাড় করিতেছিল, তার খানিকটা আগুনের হল্কার মতই দীর্ঘনিশ্বাস রূপে বাহির হইয়া আসিল! আত্মগত হইয়া সে বলিল "এত নিষ্ঠুর!"

(ক্রমশঃ)

রাত্রি

—শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়

আকাশের শ্যামাঙ্গী দুহিতা,
নিতি নিতি মহাশূন্য-সোপান বাহিয়া,
অতিক্রমি' কত দিব্যলোক
কা'র লাগি লয়ে যাও তুমি
গন্ধভরা পূর্ণ অর্ঘ্য, আরতি আলোক ?
অয়ি নিবেদিতা !

কোন্ সে পুরুষ ভাগ্যবান্ ?
সে কি ভগবান,
দুর্জ্জেয় বিরাট মহাকাল,
নিমীল নয়ন. উদাসীন, স্তব্ধ চন্দ্র ভাল ?
অণু হতে বুঝি সেই অণীয়ান্,
মহৎ হইতে মহাগরীয়ান্
মুহূর্ত্ত-নিমিষ-মধ্যে রহে যা'র প্রাণ.
পুষ্পমাল্যসম কোটি কল্পযুগ যারে ঘেরি' সদা করে অধিষ্ঠান ?
তা'রই লাগি ল'য়ে যাও তুমি
শুভ্র-অর্ক, বদ্ধ-গন্ধ চম্পকের থালা ?
তা'রই লাগি রজনীগন্ধার দীর্ঘপত্রময় ডালা
প্রসারিত রহে ?
ধূসর শাখার শিরে বিল্বমুকুলিকা তা'রই কথা কহে !
বকুল শেফালি গলাগলি অন্ধধরণীর ধূলি 'পর
তা'রই লাগি ?
ধবল বরণ
ধুতুরা কাতরা কি তাহারই প্রসাদ মাগি ?

সমীরণ
অফুরন্ত প্রাণে ব্যাপি' দিগন্ত প্রান্তর,
ঘুরি ঘুরি দেশান্তর,
তা'রই পদে জানায় প্রণতি ?
সেই ত' বিশ্বের এই রাজরাজেশ্বর !
বক্ষে লয়ে অনন্ত ভকতি
তা'রই তরে তবে জ্বেলে দাও, রাতি,
গগনের মন্দির-অঙ্গণে অগণিত তারকার বাতি,
আলোক-মণ্ডিতা
অয়ি দীপান্বিতা !

শুধু উপাসিকা,
ভক্তি-শ্রদ্ধা-পরিপ্লুতা, বিনীতা সেবিকা ?
অন্তহীন-ব্রতরতা শুধু তাপসিনী ?
হে যামিনী,
নহ প্রেম-পিপাসিনী ?
আরাধ্য দেবতা শ্রেষ্ঠে বাস' না কি ভাল ?
তবে কেন ভাসে গণ্ডে লজ্জার রক্তিম আলো
দিন শেষে,
নীল চক্ষে ফুটে সরমের দ্যুতি, শিহরণ বহে কৃষ্ণ কেশে ?
কম্পমানা প্রভাতের আলোক সম্পাতে, অশ্রুধারে নেত্র যায় ভেসে ?

কোন্ যুগে অন্ধকার পাষাণ প্রাসাদে
জন্ম নিলে তুমি ?
কোথাকার ভূমি
শিহরি' উঠিল কোন্ অপূর্ব্ব আহ্লাদে ?
কোন্ লুপ্ত সাহানায় দিব্যধামে জানাইয়া দিল
তব আগমন !

তা'র পর কেমনে আসিল
　　তব প্রথম যৌবন
ঘন বনে অঙ্কুরিত ব্রততীর শ্যাম শোভাপ্রায়,
　　অথবা যেমন
　　মধু পূর্ণিমায়
সমুদ্র উথলি' উঠি ডাকে চন্দ্রমায় !

　　মনে হয়—
দিবাকর-হারা এক জন্মান্ধ দিবসে
　　প্রভাহীন প্রভাত সময়
স্নান করি' আকাশের মানস-সরসে
　　বিত্রস্ত হরষে
অগ্রসর হ'লে তুমি গৃহ-অভিমুখে
　　দুরন্ত পবন ঠেলি',
যেথা স্তরে স্তরে হংসসম পড়ে' আছে সুখে
　　মেঘ তা'র আর্দ্র পক্ষ মেলি',
পবন-তাড়নে শুষ্ক হ'ল তব অঙ্গলিপ্ত বাস,
এলোকেশ ছাইল আকাশ,
　　হেনকালে
মহাকাল রথোপরি তোমা নিল তুলি'
　　বাঁধি বাহুজালে,
তা'রপর চণ্ডবেগে ছুটিল স্যন্দন
　　নিঃশব্দ ঘর্ঘরে,
ধরণীর বক্ষঃ জুড়ি চলে যথা অনল-নর্ত্তন
　　অব্যক্ত বেদনে ধরা কাঁপে থর থরে !
আর্ত্ত ব্যোম রুদ্ধ ওষ্ঠে রহে সেই নির্দ্দয় কর্ষণে ;
　　ধূমকেতুপুচ্ছসম স্যন্দন কেতন
　　সন্তরিল সমীরণ স্রোতে ;
তপ্ত রথনাভি ঘূর্ণ্যমান চক্রনেমি হ'তে

লক্ষ তারা ঠিকরি' পড়িল দ্রুত দুর্জ্জয় ঘর্ষণে
উল্কা-মূর্ত্তি ধরি' ;
সংখ্যাহীন খ-ধূপের ধূম্র-উদ্গিরণে
গেল ঊর্দ্ধলোক ভরি' ;
ধ্বনি প্রতিধ্বনি বদ্ধশ্বাস রহি' ক্ষণকাল
লুকাইল ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত প্রাঙ্গণে ;
সেই হ'তে আকাশ-নন্দিনী,
হয়েছ বন্দিনী
প্রেমের শৃঙ্খলে আর নিয়তির নিবিড় বন্ধনে !

কিংবা এ-মিলন ঘটেছিল গগনের তপোবন-মাঝে—
সপ্ত ঋষি-পত্নী ছিল রত গৃহ-কাজে ;
আকাশ-গঙ্গার নীরে
স্নান সমাপন
করি' ধীরে ধীরে
তরুণ বালক বুধ ফিরিয়া আসিতেছিল আশ্রমে আপন ;
অকুণ্ঠিত মন
ভক্ত ধ্রুব জিজ্ঞাসা করিল তোমা বৈকুণ্ঠের পথ,—
তা'রপর পূর্ণমনোরথ,—
চলিতে লাগিল শিশু নিজ লক্ষ্যপানে ;
তুমি সলিল সেচিতেছিলে আনত বয়ানে
যতনে পালিত তব পুষ্পতরু-মূলে,
লুটায়ে পড়িতেছিল শ্যাম কিসলয় কিশোর পরশে
মাতা মনে করি' তোমা ভুলে—
উরসে তোমার, গণ্ডোপরি কিংবা শিরোদেশে,
বন্ধহীন কেশে,
কভু বৃন্ত ত্যজি' পুষ্পদল চরণে করিল নম,
মুক্ত উৎসসম ;

সবে সঞ্চরি' উঠিতেছিল কণ্ঠ হ'তে তব অসঙ্কোচ গীতি
আনমনে,
সহসা স্পন্দিত হল ঘন বনবীথি—
রুদ্ধ হল গান—কা'র আগমনে?
অগ্রদূত শুষ্কপত্র প্রধাবিত কার পরশনে?
তব সনে সঙ্গিনী ছিল না কেহ—
চমকি উঠিলে তাই—কণ্টকিত দেহ
লজ্জা-ভীতি-ভরে;
হেরিলে তখন মৃগ বিদ্ধ করি' রুদ্র ব্যাধ—ধনুঃশর করে
আবির্ভূত সম্মুখে তোমার!
মুগ্ধনেত্র তা'র পরাইল কণ্ঠে তব চির মহামিলনের হার!

অথবা কোন্ অতীতের বিস্মৃতিমগন
গোধূলি-লগন
হেরেছিল তোমা বধূ বেশে,
বিচ্ছেদ-শঙ্কিত সন্ধ্যা ম্লান হাসি হেসে
অলক্তক-রাগে
রঞ্জিত করিল তব চরণ-পল্লব
প্রশান্ত সীমন্তভাগে
করিল অঙ্কিত রক্তিম সিন্দূর-বিন্দু—
মাঙ্গল্যের চিহ্ন অভিনব;
নীলভালে ভেসে এল স্নিগ্ধ হেম ইন্দু
ত্যজি' তা'র ক্ষীরোদ-বৈভব;
চঞ্চল জলদবালা ললাট ঘেরিয়া তব চিত্রিত করিল
হরি-চন্দনের চারু চিত্রলেখা;
করুণ কৌতুকে ভদ্রা কর্ণে কি কহিল,
ওষ্ঠে তব হাস্য দিল দেখা;
স্বাতি দিল তব কণ্ঠে বিদায়ের অশ্রুজলে গাঁথা
শ্বেত মুক্তাগুলি:
স্কন্ধে দিল তুলি'

মীনচিহ্ন নীলাঞ্চলখানি আলো ঝল্‌মল্‌
যৌনবতী রেবতী আদরে ;
এক হস্তে আঁখি দু'টি মুছি' আপনার—বাষ্প-ছল্‌ছল্‌
বিশাখা অঙ্কিয়া দিল অকম্পিত করে
নেত্রে তব অঞ্জনলেপনী ;
ম্লান মন্দাকিনী
ধীরে ঝুলাইল হীরক-মেখলা ক্ষীণ কটিদেশে ;
কত ভালবেসে
কৃত্তিকা সকলে শ্যামভালে দিল পরাইয়া জ্বল্‌জ্বল্‌ তারার মুকুট ;
তব করপুট
অব্যক্ত সোহাগে বুঝি মণ্ডিত করিল
রোহিণীর পরশ অস্ফুট !

ক্রমে মহামিলনের গ্রন্থি হ'ল সৃষ্টি—
মন্ত্রপাঠ, কন্যা-সম্প্রদান,
শুভক্ষণে শুভদৃষ্টি,—
বিস্ময়-হরষ-দীপ্তি যুগ্ম কম্পমান
কমলের মত উঠিল ফুটিয়া,
তা'রপর বিবাহ বাসর—
যত সখী সহচরী আসিল জুটিয়া,
ক্রমে তা'রা কক্ষমাঝে বাতায়ন-পাশে পড়িল লুটিয়া
নিদ্রায় কাতর,
স্তব্ধ হ'ল কৌতুহল, কৌতুকের স্রোত, হাস্য পরিহাস ;
ক্রমে এল বিদায়ের ক্ষণ—
অঙ্গনে দাঁড়াল আসি' পাণ্ডুগণ্ড স্থবির আকাশ
বিনিদ্র-নয়ন ;
বুঝিরে তখন
সারাদিক্‌ দীর্ঘশ্বাসে শ্বসিতেছে "বিদায়, বিদায় ?"
কহিল আকাশ, 'হে পুত্র, হে পুত্রাধিক প্রিয়, সঁপিনু তোমায়—

আমার হৃদয়মণি,
হে তনয়া, আজ তুমি কন্যা নহ, ঋণ-মুক্তা তুমি যে রমণী,
আসিও আবার—প্রতীক্ষায় রব আমি তব লাগি'
প্রতিপল অনুপল গণি।'



স্মৃতি

শ্রীক্ষেত্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গোধূলির ছায়াবীথিকায় সন্ধ্যার স্বর্ণমঞ্জীর বাজিয়া উঠিয়াছে। নীড়াভিমুখী পাখীদের শ্রান্ত কণ্ঠে চিরন্তন পূরবীতে ব্যর্থতার হাহাকার ফুটিতেছে। নদীটীর জলময়ী কায়ায় বেদনার কদম্ব রোমাঞ্চ।

আমি সেই প্রবাহিনীর ধারটীতে বসিয়া আছি। একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বুকের ভিতর কেবলি ফুঁপিয়া ফুলিয়া কুণ্ডলিত হইয়া উঠিতেছে—বাহির হইতেছেনা। সে চায়, মাথার উপরকার অশ্রুময়ী পূরবীটাকে আশ্রয় করিয়া তালে সমে গমকে মুর্চ্ছনায় হাহাকারে ফাটিয়া পড়িতে।

দূরে একটি তারকা জ্বলিতেছে। জ্বলিতেছে, আবার নিভিয়া যাইতেছে। আবার জ্বলিতেছে।

চাহিয়া আছি। কি যেন মনে পড়িতেছে, অথচ পড়িতেছে না!

সহসা পৃষ্ঠদেশে শত বকুলের গন্ধ-সুরভিত উষ্ণ নিঃশ্বাস পাতে চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখি অপূর্ব্ব দৃশ্য!

ময়ূরকণ্ঠী সাড়ী দিয়া বরতনুখানি ঢাকিয়া চির-যৌবনা এক ষোড়শী। ঠোঁট দুখানির উপর তার বিষাদের হাসি, চক্ষু দুটীতে বৈরাগ্যের স্তম্ভিত ভাব।

একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। সুন্দরী হাসিয়া বলিল, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি স্মৃতি! প্রকৃতির অঙ্গুলি তাড়নে মনোবীণার তারে তারে যখন বেদনার রাগিনী বাজিয়া উঠে, তখনি আমি আসি। ব্যথা আমার প্রাণ, বিষাদ আমার নিঃশ্বাস। এ মর-জগতে যে শান্তি অজর ও অমর হইয়া মানবের অভিশপ্ত জীবনকে অহরহঃ দেবত্বে মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে, আমি তাহার জননী।'

চোখের মুখের কি সুন্দর হাসি! বিষাদের কি ছলছল ভাবের উপরে বৈরাগ্যের মধুর জ্যোৎস্নাপাত!



—"কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা, নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল!"—

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

রাঁধতেও জান না? বাপের বাড়ীতে কি এটাও শেখায় নি কেউ? আলু-গুলো যা কাঁচা, খাওয়াই হ'ল না আজ।

তরুণী স্বামীর তিরস্কার নতমস্তকে শুনিতে শুনিতে নথ খুঁটিতে থাকে,—জবাব দেয় না।

কিন্তু সব ভাতগুলাই গোগ্রাসে গিলিয়া হাঁশ ফাঁস করিতে করিতে স্বামী অফিসে যায়,—অফিসের তাড়াতাড়ি।

ভাঁড়ার ঘর হইতে শাশুড়ী বাহির হইয়া বলিলেন—না বাপু তোমাকে আর পারা গেল না, যত বলি আলুগুনো আগে জলে সেদ্ধ করে নিয়ে তারপর ভেজো, তা আমার কথা গ্রাহ্যই হয় না—আর কত দিন ধরে' হাতে হাতে শেখাবো তোমায় তাও জানি না।

একটা প্রতিবাদ মুখে আসিয়া পড়ে,—মনে হয় বলে—আলুগুনো পচা ছিল মা, তাই সেদ্ধ হয় নি। কিন্তু গুরুজনের সঙ্গে তর্ক করার মত পাপ আর আছে কিছু?

শ্বশুর খাইতে বসিয়া বলেন—দেখো বৌমা ; রান্নাবান্নার সময় গেরস্থ ঘরের বৌয়ের অমন খিষ্টানের মতো সেমিজ জামা জড়িয়ে বাবুয়ানি করা ভালো দেখায় না, হাতের জল শুদ্ধু হয় না ওতে।

শাশুড়ী কর্তাকে পাখার হাওয়া করিতে করিতে সায় না দিয়া থাকিতে পারেন না—সত্যিই ত বাপু, আমরাও ত' এককালে বৌ ছিলুম, কিন্তু ঐ একখানা কাপড় পরতে পেলেই বর্ত্তে যেতুম; সেমিজের নামই জানতুম না—আজ কাল বৌঝিএদের কি যে সব ফ্যাসান হয়েছে।

দরজার আড়ালে তরুণীর চূর্ণীত কুন্তলে ভরা ক্ষুদ্র কপোলটী ঘামে ভিজিয়া উঠে। ভাবে—সেমিজ আর পরিবে না, কিন্তু ছেলেবেলাকার অভ্যাস—লজ্জাও করে।

শীতকালের কনকনে স্যাঁৎসেঁতে উঠানটায় বসিয়া একরাশ বাসন মাজিতে মাজিতে হাত যখন ধরিয়া আসে তখন গুণধর দেবর আসিয়া বলিল—তোমার আঁচল থেকে চাবিটা দেবে বৌদি? বেড়াতে যাচ্ছি, রুমালে একটু এসেন্স ঢেলে নেবো?

আপনার বলিতে সামান্য ক্ষুদ্র ঐ ক্যাসবাক্সটা! বিবাহের পর স্বামীর কয়েকখানি ক্ষুদ্র প্রেমলিপি,—বাপের দেওয়া দুটী টাকা, স্নেহোচ্ছ্বাসে ভরা মায়ের দু'খানি পত্র—ইহাই তাহার একান্ত নিজস্ব গুপ্তধন! আপনার জনকে দেখাইতেও কুণ্ঠা বোধ হয়।

বলে—পাঁচমিনিট দেরী করনা ভাই, এই কড়াখানা মাজা হ'ল বলে, উঠেই হাত ধুয়ে গিয়ে দিচ্ছি।

সদর্পে ঝড়ের মত উপরে উঠিয়া মাকে ডাকিয়া চীৎকার করিয়া দেবর বলিল—দেখলে ত' মা, বৌদির ব্যবহারটা। আমার হাতে চাবি দিয়ে বিশ্বাস হয় না, আমি চোর ওর জিনিষ চুরি করবো। চাই না আমি তোমার এসেন্স, কিনে নিতে জানি।

শাশুড়ী বলেন—মণিকে তুমি দুচক্ষে দেখতে পার না বৌমা,—সাধে কি ও তোমার পেছনে লাগে? এই বয়সেই এত হিংসে, এখনও বয়েস আছে!

বলিয়া পড়ন্ত রোদটুকুতে পিঠ দিয়া পড়িয়া থাকেন।

সামনে একটু খোলা জমি। তাহার উপর দিয়া আলো ও বাতাস অবাধ গতিতে বাতায়ন-পথে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। জানালায় মাথা রাখিয়া মাঝে মাঝে তরুণী ঐ টুকু উপভোগ করে মাত্র। বিকালের দিকে পাড়ার ছেলেরা জিম্‌নাষ্টিক করিতে আসে, তখন জানালার সব পাটা কটাই রুদ্ধ হইয়া যায়!

সে দিন অফিস হইতে ফিরিয়া রাগে গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে স্বামী কতকগুলি বচনবিষ উদ্‌গিরণ করিয়া ফেলিলেন—ভদ্রঘরের বৌ লজ্জা করে না, জানালায় রূপের বাজার খুলে বসতে? ও পাড়ার নরু বল্‌ছিল—

তারপরের কথা কয়টা এতই ঘৃণ্য যে তরুণী কানে হাত চাপা দেয়, সমস্ত দেহ মন হীনতায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে।

সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাত্রে একটু বিশ্রামের জন্য পঞ্চদশ বসন্তের তন্বলতাটি একটু এলাইয়া পড়ে—কিন্তু বৌ মানুষের বিশ্রাম,—বাবুয়ানী? স্বামীর কর্কশ কণ্ঠ বাজিয়া উঠে—পাদুটো একটু টিপে দেবে, তাও খোসামোদ কর্‌তে হবে? স্বামী সেবাটুকুও কি মা শিখিয়ে পাঠান নি?

ক্লান্ত অবসন্ন দেহখানাকে ঠেলিয়া তুলিয়া বিছানার একপার্শ্বে পা মুড়িয়া বসিয়া তন্দ্রা বিজড়িত চক্ষে তরুণী স্বামী-দেবতার পা টিপিতে বসে। বাহিরে রজনীর অন্ধকার গাঢ়তর হয়,—ঝিঁ ঝিঁ পোকার উচ্চরবে চারিদিক ভরিয়া উঠে!

কয়েকদিনের জন্য ননদ বাপের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিল। বড় লোকের বৌ,—মনটাতেও বড়লোকের ছাপ্‌মারা।

সোহাগের সুরে মাকে বলে—তোমার বৌটা এত জংলী হ'ল কি ক'রে মা? চুলটাও ভাল করে বাঁধতে জানে না।

মা মুখ ঘুরিয়ে বলেন—আর বলিস্‌ নি বাছা, হা-ঘরের মেয়ে এনে জলে' পুড়ে মলুম,—চুল কি কোন কালে বেঁধেছে না ভাল করে' বাঁধতে জানে?

তারপর কি জানি হঠাৎ সত্য কথাটাই কেমন বেফাঁস জিভ হইতে বাহির হইয়া পড়ে—আর কর্ত্তাও ওসব পাতাটাতা কাটা পছন্দ করেন না,—না বাঁধাই ভালো।

মেয়ে ঝঙ্কার দিয়া উঠে—তুমিও যেমন, বাবা আবার পছন্দ করবে কি?

তারপর তরুণীর কাছে গিয়া বলে—শুনছ গা বৌদি, জংলীপনা ছেড়ে একটু সভ্যভব্যতা শেখো আমার কাছে।

বলিয়া নিজের শ্বশুরবাড়ীর কায়দাদুরস্ত হাল ফ্যাসানের অনেক গল্প ফাঁদিয়া বসে।

তরুণী শুনিয়া রুদ্ধ আবেগে ঘাড় নাড়ে,—সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রবল বায়ুতে পৃথিবীর বুকে ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছগুলাও ঘাড় নাড়িয়া উঠে—সমবেদনা প্রকাশ করে হয়ত!

সেদিন শেষরাত্রে তরুণীর কম্প দিয়া জ্বর আসিল। সকালে শুনিয়া শাশুড়ী বলিলেন—হবে না? অত রাত জাগা,—সমস্তরাত শুনি ফিসির ফিসির!

বাহিরের গাছপালার খস্ খস্ শব্দে বৌ'এর ফিসির ফিসির শুনেন হয়ত!

কর্ত্তা বলেন—এক পয়সার মুরোদ নেই,—ডাক্তারের ভিজিটের টাকা দেবে কে? দুদিন উপোস্ দিক্, সেরে যাবে।

জ্বরের উপরে সমস্তদিন অবিশ্রাম খাটুনি চলে। রাত্রে সারিতে সুরিতে বারোটা বাজে। মাথার যন্ত্রণাটা এত অসহ্য হইয়া উঠে যে হাতুড়ী দিয়া ওটা কুচি করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। গায়ের উত্তাপ উনানের আগুনকেও পরাস্ত করে। পা দুটো আর চলে না—যেন একসঙ্গে ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়াছে!

টানিয়া টুনিয়া মূর্চ্ছিত অবসন্ন দেহটাকে ঘরের বিছানায় আনিয়া ফেলিতেই স্বামী বলিয়া উঠিল—আচ্ছা আপদ যা হোক্, সমস্তদিন অফিসের খাটুনির পর কোথায় একটু জিরোবো, না রুগীর সেবা করো;—অন্য ঘরে না হয় শোও গে বাপু আজ রাতটা!

গঙ্গার ঘাটে

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

ভাদ্রের ভরা গঙ্গা…………

দিনের বেলায় রোদের আলোয় বুকে তা'র শানানো ছোরার ঝিলিক্ জ্বলে,—রাতের বেলা চাঁদের বুকে তা'র চাঁদ-মালা দুলে!

বাঁধানো শানের ঘাট।—উপরে তা'র খিলানআঁটা মস্ত চাতাল।

সেই চাতালের একটি কোণে রোজ আসিয়া সে বসে—বাক্স, জল-চৌকী, কোশাকুশী, চন্দনপিঁড়ি, এমনি সব কত কী লইয়া।

আরও অনেকে বসে।

কিন্তু সে ছিল আর সকলের অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট। ছোক্রা, রোগা ছিপ্‌ছিপে একহারা চেহারা, গলায় পৈতা, মাথায় চৈতন,—ঝুঁটিবাঁধা উড়ে।

ভোর না হইতেই ঘাটে স্নানার্থীদের ভিড় জমে। বাবুরা বলেন,—এই গোবিন্দ, জামাটা আর কাপড়টা একটু সাবধানে রাখিস্ বাবা। দেখিস্, পকেটে মণিব্যাগ আর ঘড়ি আছে।

গোবিন্দ পিঁড়ির উপর চন্দন কাঠটি ঘসিতে ঘসিতে সহসা থামে, কোমরের ঘুন্‌সি হইতে চাবির তোড়াটি খুলিয়া দেয়।

বলে,—বাক্সের তালা খুলে ওর ভেতরেই রেখে যান বাবু!—ঠিক থাক্‌বে।

পরিষ্কার বাংলা বলে।

জল-চৌকীর উপর ধূপ-কাঠি জ্বলে। সুগন্ধ-ভরা ধোঁয়ার রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া লতাইয়া উঠে।

তালার চাবি দেখাইয়া দিতে হয় না। অনেক দিনের পুরানো খদ্দের। রোজ আসে। সব জানা শোনা আছে।

গোবিন্দ তেল দেয়, কোশাকুশী দেয়।

বাবুরা স্নান করেন, জপ-আহ্নিক সারেন, যাইবার সময় কিছু বক্‌শিস্ করিয়া

যান। মেয়েরাও আসে।

একঘাটেই স্নান—

যে যার আব্রু নিজের কাছে!

মেয়েরা স্নান করে, চুল ঝাড়ে।—আবার কাপড় ছাড়িয়া আধ-ঘোমটাও টানিয়া দেয়। স্নানের শেষে কপালে চন্দনের ছাপ নেয়। যাইবার সময় কেহ বা এক পয়সা, কেহ বা দুই পয়সাও দিয়া যায়।

গোবিন্দ কিন্তু কাহাকেও কিছু বলে না। যে যা দেয় তাহাতেই সন্তুষ্ট।...... কেমন যেন একটু মুখচোরা!

এমনি রোজই হয়—সেই ভোর চারিটা হইতে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত।

চাতালের ও-ধারে পথের পাশে একজন খোট্টা বসে। মাথায় ময়লা গামছার পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া একটা চ্যাঙারিতে এক রাশ ভিজা ছোলা ও ডাল সিদ্ধর চূড়ার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁচা লঙ্কা পুতিয়া চুপ করিয়া সে বসিয়া থাকে। বিক্রী তাহার মন্দ হয় না। কিন্তু অবসরের ফাঁকে মাঝে মাঝে স্নান-নিরতা মেয়েদের দিকে এক এক বার চাহিয়া লয়। ঐ টুকুই যেন তাহার এই বৈচিত্র্যহীন এক-ঘেয়ে জীবনের একটি বিশিষ্ট আরাম! কখনও বা মনে বোধ হয় একটু স্ফূর্ত্তি হয়, গুন্ গুন্ করিয়া তাহার জাতীয় ভাষায় কি একটা প্রেমের গানের সুর ভাঁজে।

একদিন একটি মেয়ে আসিল সেই ঘাটে গঙ্গা নাইতে। সঙ্গে একটি বুড়ী, —বোধ হয় তাহার কোন আত্মীয়া।

মেয়েটী সুন্দরী। ডাগর ঢল্ ঢলে দুটি কালো চোখ, তুলি দিয়ে আঁকা, বাঁকা ভুরু। আপেলের মত টুক্‌টুকে দু'টি গাল—হাসিলে হয়ত তাহাতে টোল খায়। পাতলা দু'টি ঠোঁটের ফাঁকে সিঁদুর-মাখা মুক্তা-পাঁতির মত দাঁতের সারি। চিবুকে ছোট্ট একটি কালো তিল। মুখখানি ঠিক যেন সদ্যফোটা স্থলপদ্ম!

তরুণী মেয়ের মুখের লাবণ্যে বোধ হয় কি-যেন একটা মোহময় আকর্ষণ আছে.........

ঘাটের লোকগুলা হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে তাহার ঐ মুখের দিকে!

মেয়েটি স্নান করে, চুল ঝাড়ে। শেষে গোবিন্দর কাছে আসিয়া কপালে চন্দনের ছাপ নেয়।

গোবিন্দ সন্তর্পণে মেয়েটির মুখখানি তুলিয়া ধরে। আল্‌গোছে আল্‌গোছে ছাপ দেয়।—বুঝি বা ভয় হয়, পাছে তাহার কঠিন হাতের অসতর্ক স্পর্শে মেয়েটির কচি মুখে ব্যথা লাগে!

ছাপ-দেওয়া যেন আর শেষ হয় না…………

এই একটুখানি স্পর্শ-পাওয়ার সুখটুকুকে স্বেচ্ছায় শেষ করিতে মন যেন কিছুতেই চাহে না!

বুড়ী বলে,—কই গো বাছা, হল তোমার?

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি করে। বলে,—হ্যাঁ এই যে হল মা!

সেদিন একটি বাবু পাশ দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার সঙ্গী বন্ধুটিকে ছোট্ট একটি ধাক্কা দিয়া বলিলেন,—দেখছিস্ ব্যাটা উড়ে কি ভাগ্যবান!

উত্তরে বন্ধুটি আর কিছু বলিলেন না, শুধু গোবিন্দ আর মেয়েটির দিকে হাসি-ভরা চোখে একটি কটাক্ষ হানিয়া চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দ কিন্তু সে কটাক্ষের অর্থ বুঝে!

রোজই এমনি হয়।

মেয়েটি আসে, গোবিন্দ ছাপ দেয়। ছাপ-দেওয়া শেষ হইলে সেই সুগন্ধ-ভরা চিত্রিত মুখখানি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে!

ভাবে,—কী পুঞ্জীভূত রহস্য লুকানো আছে ঐ দু'টি নিবিড় কাল চোখের তারায়………কী স্বর্গীয় সুধা সিঞ্চিত আছে ঐ দু'টি ডালিম-ফাটা তুলতুলে ঠোঁটে!

কিন্তু এমন কেলেঙ্কারী যে হইবে কে জানিত!

দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন,—পশুবিশেষের কোনও একটি শ্রেণী হইতে মানুষের উৎপত্তি।—কঙ্কালে এখনও নাকি তার সাদৃশ্য আছে!

কিন্তু মানুষের মনে……… ?

আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কালের প্রভাবে; প্রকৃতির……… ?

স্বভাবের শক্তি তাহাকে সাহায্য করিয়াছে তাই কাল তাহার নিকট পরাজিত !

মানুষের মনের পশুটা আজিও মরে নাই.........অন্তরের কোন্ গোপন অন্তরালে বসিয়া এখনও যেন সে ঝিমাইতেছে !

—তাই মানুষের সমাজ-শাসন এত কঠোর, রাজার আইন এত নির্ম্মম, সভ্যতার সীমা এত অপ্রশস্ত ! মানুষ সহস্র বিধিনিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য বেষ্টনীর মধ্যে মনের এই পশুটাকে পঙ্গু করিয়া রাখিতে চাহিয়াছে,—কিন্তু দুর্ভাগ্য মানুষের ....পঙ্গু সে হইল না কোনদিন, দুরন্তপনা তাহার ঘুচিল না কখনও !

তাই সে যখন ক্ষ্যাপে তখন শাসন, আইন, সীমা—সব বৃথা !

সহসা ঠিক তেমনি একটা ঘটনাই ঘটিয়া গেল সেদিন।

মেয়েটির দুধে আলতা গোলা কপালখানিতে চন্দনের ছবি আঁকিয়া দিয়া তিনটি আঙুলে তাহার কচি মুখখানি অল্প একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া গোবিন্দ তাহারই দিকে অপলক চোখে চাহিয়াছিল !

মেয়েমানুষের রূপে বোধ হয় কি-যেন-একটা কী মাদকতা আছে !—দেখিতে দেখিতে মন মাতাল হইয়া উঠে, বিষের উগ্রতায় চোক কান দিয়া যেন আগুনের হল্কা ছুটে, মাথার মগজে একটা অসম্ভব কামনা যেন আগুনের শিখার মত লক্‌লক্ করিয়া জ্বলে...........স্থান-কাল-পাত্র.........খেয়াল নাই......মানুষ যেন ক্ষিপ্ত ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র জানোয়ার !

হঠাৎ কী যেন হইল.........

বুড়ী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল.........

হৈ হৈ করিয়া স্নানের ঘাট ভাঙ্গিয়া লোক ছুটিয়া আসিল.........

লোকারণ্য !

কেহ হাঁকিল,—পুলিশ ! পুলিশ !.........

কেহ বলিল,—মেরে গুঁড়িয়ে দাও শালাকে.........

সহসা একটা লাঠির চোট্ আসিয়া গোবিন্দর মাথার উপরে পড়িল।

দর্ দর্ করিয়া রক্ত......... !

ফিরিয়া দেখিল,—লাল পাগ্‌ড়ী !

কিন্তু তখনও তাহার দু'টি সবল দৃঢ় বাহু বন্ধনের মধ্যে মেয়েটি ভয়ে লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া কাঁপিতেছিল !

ঘটনাটি অবশ্য আকস্মিক.........

কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞান যখন ফিরিল তখন—নিরুপায় !

জীবনের পথে চলিতে চলিতে মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় মাত্র একটি বারের এই প্রথম পদস্খলন............ !

কিন্তু সমাজ বা রাজার বিচারে ক্ষণিক ত্রুটিরও ক্ষমা নাই !

পরদিন হইতে গঙ্গার ঘাটে গোবিন্দকে কিন্তু আর কেহ কখনও দেখে নাই !

হয়ত ফৌজদারী আদালতে তাহার বিচার হইয়াছে।—শাস্তি পাইয়াছে কি না কে জানে !

তবে একথা ঠিক যে আইনের কেতাবে উদ্দেশ্যে-বিচার থাকিলেও মনস্তত্ত্বের পুঁথি তাহা নয় !



শিকলির দাম

—শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য

এক জুয়াড়ী রাজাকে অপমান করেছিল,—বিচারে তাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া হল।

জন্মভূমি ছেড়ে গিয়ে মনের দুঃখে আশপাশে সে ঘুরে বেড়াল কিছুদিন। ফিরে আসতে সাহস হয় না, কি জানি প্রহরীরা যদি জানতে পেরে তলোয়ারের খোঁচায় তার ইহজগতের যত কিছু সুখ আহ্লাদ সব এক নিমিষেই সাঙ্গ করে দেয় !

তাই ভয় করে !

একদিন কিন্তু সাহস করে' নিরিবিলি দেখে ঢুকে পড়ল স্বদেশের দেউড়ীর মধ্যে।

প্রহরীকে ফাঁকী দেওয়া কি সহজ কথা ?

কোথা থেকে ছুটে এসে প্রহরী পথরোধ করে দাঁড়াল—বললে "আপনার ত রাজার বিচারে নির্ব্বাসন দণ্ড হয়েছে ?"

"হাঁ, তা ঠিক বটে অস্বীকার করব না ! তবে কি না, আমি আবার পরের ট্রেণেই চলে যাব—"

"ঠিক ত' ? বেশ, এই ঘণ্টা দুই সময় দিলুম, এর মধ্যে আপনি বেড়িয়ে যেতে পারেন—কিন্তু খপরদার। ঠিক সময়ের যেন অতিক্রম না হয় !"

এমনি করে লোকটা প্রতি হপ্তাতেই একবার আসে ;—প্রতি বারেই প্রহরী সেই একই প্রশ্ন করে এবং সে তার একই উত্তর দেয়।

আহা ! স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে একটীবার মাত্র দেখে যাবে—এ'তে আর বাধা কি ?

রাজার বিচার-নীতি এমনি উদার !

যে কোন শাস্তির গুরুত্ব যতটা পারা যায় লঘু ও সহনীয় করবার জন্য যেন সে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে ! দেশটা নেহাৎই ছোট ! তবে—

রাজার রাজকার্য্য এবং আইন কানুনের ভড়ংটা ছিল পুরাণে বর্ণিত সবচেয়ে নামজাদা রাজাদের চেয়েও জমকালো। ভূভারতে রাজা কাকেও ভয় করে চলেন না ; কিন্তু মানুষের দুর্ব্বলতা এবং পাপের শাসন করিতে গিয়ে মাঝে মাঝে ক্ষমা দেখাবার উদারতাও ত কারও চেয়ে তাঁর কম দেখি না !

তাঁর মহত্ত্বের আরও প্রমাণ চান ?

তবে আর এক ঘটনার কথা বলি—

এ'রকম রোমাঞ্চকর ব্যাপার আর কখনো ঘটে নি।

লোকটা ছিল ভারি বদরাগী—রাগের মাথায় তার স্ত্রীকে খুন করে ফেললে একদিন।

রাজ্যময় একটা হুলস্থূল পড়ে গেল। ভয়ে সবারই বুকের ধকধকানি বুঝি হঠাৎ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

আদালতের সৃষ্টি হল এই অভূতপূর্ব্ব হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার করতে।

অনেকদিন বিচারের পর সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রাণ দণ্ডই লোকটার উপযুক্ত শাস্তি বলে বিবেচিত হল।

রাজাও এত বেশী রেগে গিয়েছিলেন যে আদালতের দেওয়া এই শাস্তি, মোটেই মাপ হবে না বলে রায় দিলেন।

তবে একটা সমস্যা জাগল, কেমন করে ফাঁসী দেওয়া যায় লোকটাকে!

ভারি মুস্কিলের কথা।—দেশটাতে ফাঁসীকাঠও ছিল না, জহ্লাদও ছিল না। কি করা যায় তাহালে? মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা প্রতিবেশী এক প্রজা তন্ত্র সরকারের কাছে, জহ্লাদ একজন এবং শিরশ্ছেদের উপযুক্ত যন্ত্রাদি চেয়ে চিঠি লিখলেন। অনেক লেখালেখির পর তাঁরা খবর পাঠালে জহ্লাদ পাঠাবার খরচা হিসাবে ষোল হাজার টাকা জমা দিতে হবে।

খরচের হিসাব দেখেই রাজা দমে গেলেন!

সামান্ত একটা একটা খুন,—তার'ই তদন্ত করে একটা লোককে ফাঁসী দিতে এত টাকা খরচ করা? অসম্ভব।

রাজা ভাবলেন, একজন সৈনিক এসে তরোয়াল দিয়ে লোকটার মাথা কেটে ফেলুক!—অত ফাঁসীকাঠ, জহ্লাদ প্রভৃতি চেয়ে আনবার দরকার নেই মোটেই!

সেনাপতির মতামত জিজ্ঞাসা করা হলে, সে আপত্তি জানিয়ে বল্লে, তার সৈন্য সামন্ত, যুদ্ধবিগ্রহের অভাবে তলোয়ার চালাতেই ভুলে গেছে;—মানুষের মাথা কেটে নেবার জন্য যতটা কৌশল এবং অভিজ্ঞতা জানা থাকা দরকার তার কোন সেনারই তা' নেই!

অগত্যা, রাজা আদালতের বিচারকদের আর একবার ডাকিয়ে এই ঘোরতর সমস্যাটী ভাল রকমে মীমাংসা করতে বলেন।

বিচার সভা অনেকক্ষণ ধরে মাথা ঘামিয়ে অবশেষে ঠিক করলে—আসামীর মৃত্যুদণ্ডটা মাপ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা যাক।

কিন্তু দেশে কারাগারও ত' নেই! কি করা যায়?

কাজেই সরকার বাহাদুরকে কারাগার তৈরী করতে হল। একজন প্রহরীও নিযুক্ত হল আসামীর উপর কড়া নজর রাখতে।

ছমাস আর কোন গোলমাল হয় নি। বন্দী সেই অন্ধকার ঘরটাতে খড়ের বিছানা করে একরকম সারাদিন ঘুমিয়ে কাটায়। কারাধ্যক্ষ দরজার সামনে এক চেয়ার পেতে বসে থাকে ও ঝিমোয়! এমনি করেই দিন যায়।

মিতব্যয়ী রাজা কিছুদিন পরে একদিন এই আসামীটার জন্যে যা কিছু খরচ পত্তর হয়েছে এবং হচ্ছে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন!

আসামী এবং প্রহরী—দুটা লোকের খোরাক পোষাক—তাছাড়া প্রহরীটার মাহিনাও আছে! বন্দীর বয়স ত বেশী নয়! শীঘ্রই নিপাতের কোন সম্ভাবনা নেই! এরকম ভাবে তাকে কতদিনই বা রাখা যেতে পারে?

রাজা শশব্যস্ত হয়ে মন্ত্রীকে বলে পাঠালেন চিরদিন ধরে এরকম অসম্ভব খরচ করতে গেলে চলবে না! খরচ কমাতেই হবে!

মন্ত্রী আবার বিচারপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেন।

এবারে ঠিক হল,—আসামীর জন্য পাহারার দরকার নেই। আসামীকে বলা হবে সে নিজেই যেন নিজের পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মন্ত্রীদের ভেতরে ভেতরে মতলব ছিল, আসামী নিশ্চয়ই একলা থাকবার সুযোগ পেয়ে পালাবেই! তা হলে ত খরচ একেবারেই বন্ধ হবে।

এই বিদ্ঘুটে সমস্যাটার এ রকম মীমাংসা হতে দেখে কেউ আর আপত্তি করলে না।

পাহারাওয়ালাকে বিদায় দেওয়া হল। রাজবাড়ীর এক রাঁধুনী সকালে এবং সন্ধ্যায় বন্দীকে খাবার দিয়ে আসতে লাগল।

বন্দীর কিন্তু মোটেই পালাবার লক্ষণ দেখা গেল না।

একদিন ইচ্ছা করেই আসামীকে খাবার পাঠান বন্ধ রইল। দেখা গেল—হতভাগাটা নিজে এসে তার প্রাপ্য আহার্য্যের দাবী করলে।

সেদিন হতে কোন লোকই আর বন্দীর খাবার নিয়ে যায় না। বন্দী নিজেই সময় মত দুবেলা রাজবাড়ীতে এসে খেয়ে যায়। প্রাতিরাশের পর সে এখন খানিকটা করে রোজ বেড়িয়ে আসে। ইচ্ছা হলে কোন দিন বা হয়ত ভাগ্য পরীক্ষার জন্য, জুয়াড়ীদের আড্ডায় দু' চার টাকা দিয়ে একবার খেলেও দেখে। যে দিন জেতে, সহরের নামজাদা কোন হোটেলে ঢুকে পেটভরে কিছু চব্য চোষ্য খেয়ে নেয়। অবশেষে রাত হলে রোজই আপন কারাকক্ষটীতেই ফিরে এসে লম্বা ঘুম।

রাত্তের বেলা কোন দিনই সে বাইরে থাকত না।

যতদিন যায় বিচারকদের পক্ষে ব্যাপারটা সত্যিই গুরুতর হয়ে উঠ্ছিল। বন্দীর অবশ্য কোন কষ্ট ছিল না। সরকারের যথেষ্টই ক্ষতি হচ্ছিল, বিচারকেরা অবশেষে আবার একদিন সমবেত হলেন, এবং ঠিক করলেন আসামীকে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করা হোক্।

আসামী এ কথা শুনে বল্লে "ধর্ম্মাবতার, আপনারা আমার প্রতি যথেষ্ট দয়া দেখিয়েছেন। দয়ার আপনাদের সীমা নেই! কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দিলে আমি বাঁচব কেমন করে সে কথাটাও ভেবে দেখুন। আমার সংসারে আপন বলতে কেউ নেই। জীবিকা রোজগারের কোন সংস্থানই আমার নেই। এখন আমায় কি করতে বলেন আপনারা? আমার ফাঁসীর হুকুম দিয়েছিলেন কিন্তু সে আদেশ অবশেষে প্রত্যাহার করলেন। আমি তাতে একটা কথাও বলি নি! তারপর আমায় সারাজীবনের জন্য কারাবাস দণ্ড দিলেন।—আমার জন্য পাহারার বন্দোবস্ত করেছিলেন, একদিন কিন্তু প্রহরীকেও সরিয়ে দিলেন। তখনও আমি বিন্দুমাত্র আপত্তি জানাই নি। আজ আমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন। কারণ কি বুঝতে পারছি না। আমি হতভাগ্য আসামী;—আমি আপনাদেরই বন্দী!—আপনারাই আমার বিচার করেছেন;—আপনারাই আমাকে শাস্তি দিয়েছেন! আমি আপনাদের দেওয়া শাস্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি, বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি করিনি কোনদিন!—আমি এখানেই থাকতে চাই!"

সদর আদালতের সবাই স্তব্ধ ও নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাগে রাজা ত' যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আদেশ দিলেন, বন্দীকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, একেবারে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাক্!

বিচারকেরা সে কথা শুনে, মত দিলেন, আসামীকে বছর অন্তর ছ'শ' টাকা বৃত্তি দেবার বন্দোবস্ত করে অন্য কোন রাজার রাজ্যে চলে যেতে বলা হোক্।

এবার আর আসামী আপত্তি করে নি!

স্বদেশের সীমা থেকে পাঁচ মিনিটের পথের মধ্যেই একটা জমি ভাড়া নিয়ে সে এখন বাস করছে। চাষ বাস করে সুখে স্বচ্ছন্দে তার এখন দিন কেটে যায়।*

---

* সোপান' হইতে।

স্বপ্নসাধ *

স্বপ্নলোকের স্বর্ণ-আলোকে রঞ্জিত, নবীনতার শিশির-স্নাত, গোপন মরমের শোণিমায় রঙীন কয়েকটী কবিতা-পুষ্পে পুস্তক-সাজি ভরিয়া তরুণ-কবি হুমায়ুন কবির বাংলার কবিতা-রস-পিপাসুগণের সম্মুখে উপস্থিত। কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার উপায় এখন নাই। তবে শুধু এইটুকু বলিতে পারা যায়—কবির যাহা সাধ পাঠকের পক্ষে তাহা সুধা হইয়াছে।

কিন্তু মনে হয়—কবি-হৃদয়ের বেদনা-সিন্ধু মন্থন করিয়া এই সুধার উৎপত্তি। 'পদ্মা'র ভীম-সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে দারুণ কারুণ্য আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা লেখকের প্রায় প্রতি কবিতার মধ্যেই সপ্রকাশ। তাঁহার 'কোকিলের' কণ্ঠে 'বিষাদ-কোমল গান এত সকরুণ।' তাঁহার সন্ধ্যার অন্ধকারে পুঞ্জিত মেঘ ঘনায়—

'মুমূর্ষু বিবর্ণ দিবা শেষ রক্ত-কনক-কিরণে,
প্রান্ত সীমা উজলিয়া তুলিয়াছে পাণ্ডুর বরণে'

তাঁহার অন্তরে একবার 'উৎসবের' 'রোমাঞ্চপুলক' উঠিয়া আবার পরক্ষণেই—

'হৃদয় আমার ছেয়ে গেল তাই
গভীর আঁধার কালো!'

'সমাধি' কবিতাটীর সৌন্দর্য্য অশ্রু-মুকুতা-হারের সৌন্দর্য্যের ন্যায়; সমাধি-পাষাণে যে মসৃণ ঔজ্জ্বল্য বিরাজ করে ইহাতেও সেই ঔজ্জ্বল্য বিরাজমান; কিন্তু সে পাষাণ-স্তূপের হিমশীতল ভাব আমাদের অন্তর ভারাক্রান্ত করে।

'আমার সমাধি'পরে সন্ধ্যাদীপ নাহি জ্বালে কেহ,
দিনান্তের অবসানে গোধূলির যত্নে-আনা স্নেহ,—
তাও আর নাহি মোর তরে
নিশীথ প্রান্তরে
উত্তরী-শীতের বায়ু বহে সারা নিশি,

* * *

---

* হুমায়ুন কবির প্রণীত কবিতা-পুস্তক। এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত।

কেবল একটি তারা তরল আঁধারে,
নীরব নিমেষহীন আঁখি মেলি' চাহে,
আমার সমাধি পানে !'

'শাহজাঁহা' কবিতাটি বড় মর্ম্মস্পর্শী। শিল্পী-সম্রাট অবনীন্দ্রনাথের তুলিকা-পাতে শাহজাহানের শেষজীবনের যে করুণ দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই কবিতাটীতে সেই করুণ রস ছন্দে উৎসারিত হইয়াছে। 'স্বপন-খচিত তুষারিত অশ্রু-বিরচিত' 'তাজমহল' সুন্দর—

'পরিপূর্ণ লাবণ্যের অকলঙ্ক শ্বেত শতদল
বৃন্তহারা ফুটিয়াছে সৌরভের গৌরবের সুখে।'

'জাহানারা' কবিতাটিও সুন্দর। যে সম্রাটবালা সিংহাসন মুকুট মণিমালা চাহেন নাই, যিনি—

'আপনি মাগিয়া নিলে আপনার লাগি'
দুঃখ, ব্যথা, অপমান, কারাবাস কঠিন জীবন,
পলে পলে দুঃসহ বেদন,'—

তাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত কবির এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি সার্থক হইয়াছে।

বাঙালী কবি—'শেলি'র উদ্দেশে কবিতা লিখিয়াছেন! 'শেলি' দুঃখের কবি—'শেলি'র প্রতি কবির এই ভক্তি কবির মনোভাবের পরিচায়ক। তাই কবি শেলির যে কয়টি কবিতার পদ্যানুবাদ দিয়াছেন তাহা প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। Ode to Nightএর অনুবাদ যখন Presidency College Magazineএ বাহির হয় তখনই সুন্দর লাগিয়াছিল। Ode to the West-wind, The Indian Serenadeএর অনুবাদও অতি সুন্দর হইয়াছে। অন্যান্য যে কয়টি ইংরাজী কবিতা অনূদিত হইয়াছে, সেগুলিরও অধিকাংশ করুণ রসাত্মক। দৃষ্টান্তস্বরূপ Keatsএর La Belle Dame Sans Merci এবং Ode to a Nightingale, Wordsworthএর The Reverie of Poor Susan ('গোলাপজান') ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে।

করুণ রসের ফল্গু ধারাটির অনুসরণ করাই এতক্ষণ ধরিয়া হইল। সমগ্র কবিতা-পুস্তকের ভাষা অতি মার্জ্জিত——যাহারা আজীবন বাংলা ভাষায় কথোপকথন ও আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাও অনেকেই ইহা অপেক্ষা অধিক মার্জ্জিত ভাষা

ব্যবহার করিতে পারিবেন না। নবীন মুসলমান কবির পক্ষে ইহা কম ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। কবির হৃদয় আকবরের মতই উদার—

মহাভারতের স্বপ্ন মেলি' স্থির আঁখি অচপল
দেখেছিল হিয়া।

কবি-হৃদয় করুণ ও উদার—কিন্তু আকবরের হৃদয়ের ন্যায় কর্ত্তব্য-পথে নির্ভীক। 'সঞ্চয়' কবিতার শেষ অংশে সেই ভাব ফুটিয়াছে।

বাংলায় এখন রবীন্দ্রনাথের যুগ—এ যুগে বাস করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করা সহজ নহে। কবির কবিতাগুলিতে স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বড় বেশী বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাব এবং এমন কি ভাষার ঢেউ তাঁহার কবিতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

কবিকে 'সুখ দুঃখ দান লাগি' নম্র চিত্তে করি নমস্কার,' ক্ষুদ্র সমালোচনা শেষ করিলাম।

—ক্ষ—

সওদা

বিচিত্রায় যিনি সাহিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে সূক্তি উচ্চারণ করেছেন তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ,—ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ নন্।

মানে, যিনি নষ্টনীড় নির্ম্মাণ করেছেন, বিনোদিনীকে বিনোদিনী করেই রচনা করেচেন তিনি নন্।

ঘরের সঙ্কীর্ণ নিরুদ্ধতা থেকে আত্মদর্শনের জন্য বিমলা যেদিন বাইরে এল, সেদিনকার সমালোচকেরাও সেই ব্যাপারটা 'অসত্য' বলে নয়, তাদের মতে 'অসঙ্গত' বলেই গলা ছেড়ে প্রতিবাদ করেছিল। তবে তাদের কলম ছিল ভোঁতা, তাতে কালিই ছিট্‌ত বেশী—তাতে না ছিল ধার, না বা ছিল কুশলতা!

ব্যবহারের অতীত করে' দেখা,—কবির দেখা ; কিন্তু ঔপন্যাসিকের কাজ ব্যবহারিক জীবনকে পরিহার করে' নয়, তাকে স্বীকার করে' শ্রদ্ধা করে'। কবি হয়ত তাঁর প্রিয়ার কণ্ঠে শুধু শেফালি বা বকুলের মালাই দেখতে চান্ ; কিন্তু ঔপন্যাসিক তাঁর আভিজাত্যহীন দরিদ্র কেরাণী-নায়কের স্ত্রীর খোঁপায় স্নিগ্ধ 'সজ্‌নে-মঞ্জরী' দেখেও তৃপ্ত হন্। পাড়াগাঁয়ে গরুপূজার সময় যে আকন্দের মালা গরুর গলায় দোলে, সেই কদর্য্য-গন্ধ-বিশিষ্ট আকন্দকেই কবি "কাব্যের দুয়োরাণী"—আরো কত কি বলে' সম্ভাষণ করেছেন। তাই নামের গৌরবহারা কুরুচিকে নিয়ে কাব্য করাও তিনি কুরুচি বলে' মনে করেন নি। কবি সমস্ত কিছুকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়েই পেতে চান হয়ত।

তত্ত্ব ও আর্ট, দর্শন ও কাব্য—সমস্ত কিছুর থেকে জীবন বড় ও পরিব্যাপী। এবং জীবনবাদই সত্যিকারের উপন্যাসের কথাবস্তু। সে জীবন ব্যবহার্য্য জীবনই।

তেমন করে' দেখ্‌তে গেলে নারীকে প্রয়োজনাতীত, অর্দ্ধেক বা সম্পূর্ণ কল্পনা ক'রে দেখারও প্রয়োজন আছে কখনো কখনো—যখন প্রথম প্রেম-প্রাবল্য-জনিত আবেগে মনুষ্যমন মুগ্ধ ও পঙ্গু হয়ে গিয়ে থাকে। নিষ্প্রয়োজন প্রেম অতি-প্রয়োজনীয় বিবাহে পর্য্যবসিত হয়। দুয়েরই প্রয়োজন আছে।

রসবোধে যে আভিজাত্য আছে তা শুধু আলম্বিত অবগুণ্ঠনান্তরালেই নয়,—যে অবগুণ্ঠন জীবনকে বিড়ম্বিত, কলুষিত করে, মাঝে মাঝে সেই অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেও, এমন কি ছিন্ন করেও। আব্রুই নিত্যকালের স্বাস্থ্য নয়।

আধুনিক সাহিত্যে বে-আব্রুতা এসেছে বলে' রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস, তা তিনি কি নিজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌ছেন না আর কারু ভুয়ো ফালতু উপদেশ শুনে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ কর্‌বার যথেষ্ট কারণ আছে। আধুনিক সাহিত্যে যে নির্জ্জলা নির্লজ্জতা এসেছে এবং তার অন্তরালের মনোভাব যে একান্তই অসঙ্গত,—আজকালকার লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গবেষণা করে' তিনি যদি এই সহজ সিদ্ধান্তেই এসে থাকেন,—তবে অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তার আব্রু খুলে কেন তিনি বল্‌তে সাহস করলেন না, কা'র কা'র ও কোন্ কোন্ লেখা মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে পঙ্কিল হয়েছে! অন্ততঃ সমালোচনা থেকে আব্রু বাদ দিলে হয়ত রসবোধের আভিজাত্য লাঞ্ছিত হয় না।

আধুনিক সাহিত্য বলতে তিনি কি বুঝেছেন তাও স্পষ্ট করে' জানানো দরকার ছিল। কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজেও পৌরাণিক নন্। এক কাল ছিল যখন তাঁর বিমলাও সকলের চোখে বিমলা ছিল না। অনেকের তাকেই অত্যন্ত বে-আব্রু লেগেছিল।

ব্যক্তিগত বা বিশেষ কালের মানদণ্ড দিয়েই নিত্যতা বা সঙ্গতি সুষমার বিচার চলে না। কালের নিক্তিতে আজ যা নীতি বলে' গ্রাহ্য হচ্ছে দু'দিনবাদে তাই হয়ত নবযুগের তৌলদণ্ডে দুর্নীতিই মনে হবে। এর হুবহু দৃষ্টান্ত আছে। বিবর্ত্তনবাদ শাশ্বত ও স্থির বলে' কিছু মানে না।

কালিদাস বা সেক্সপীয়রের বে-আব্রুতা তাঁ'দের ঐশ্বর্য্য ও মহিমাকে ম্লান করতে পারে নি, স্থানে স্থানে জ্যোতির্দীপ্ত করেছে।

সব অত্যন্ত পুরাণো কথা। বাজে বুলি।

আধুনিক সাহিত্যেরই একজন পাণ্ডা,—রবীন্দ্রনাথের বিচারে যাঁর সাহিত্যে আব্রুর একটুক্রো আঁচলও নেই বলতে হবে—তাঁকেই তিনি তাঁর সাহসের জন্য বিস্তর তারিফ্ দিয়েছেন। খুব সম্ভব ঠাট্টা করে'ই নয়। সে লেখক মহাশয়ের একটা বইয়ের ভুমিকায় তা লেখা আছে।

মোট কথা, আধুনিক সাহিত্যে এমন কোনো বে-আব্রুতা আসে নি, যা'কে নির্বিচারে অসঙ্গত বলা যেতে পারে। যদি কিছু বা এসেই থাকে তার নাম অশ্লীলতা নয়,—অক্ষমতা। আধুনিক সাহিত্যে হট্টগোলই বা কোথায়, অট্টহাস্যই বা কোথায়,—তবে এতে যে নব সৃষ্টিশক্তির উদ্দীপনা আছে, আছে মৌলিকত্ব, জীবনকে নূতন সুসম্পূর্ণ করে' লাভ করবার জন্য আগ্রহ ও সংগ্রাম, দুঃখ দারিদ্র্য অভাব উৎপীড়নের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্টতা,—এবং জ্যোতির্ম্ময় আদর্শের অনুপ্রাণনা —সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই।

পরিশেষে, চিৎপুর রোডের মারফতে তিনি আধুনিকতার যে স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন সেটা সুখের হয় নি। তবে চিৎপুর রোডের প্রান্তে বহুদিন বসবাস করার দরুণই ওরকম দৃষ্টান্তের কথা তাঁর সহজে মনে পড়ে থাক্‌বে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে গুলাল্ পিচ্‌কিরি গান ও কুঙ্কুমের কিছুমাত্র স্বল্পতা নেই —সবাই ল্যাঙট্-পরা,—এমন ধারণা রবীন্দ্রনাথের কিসের থেকে হোলো?

নিজের নাম দস্তখতটাও যে রবীন্দ্রনাথের মতো, তাই দেখাবার জন্তই বুঝি নামটা একেবারে ব্লক করে' ছেপে দেওয়া হ'ল ?

শ্রীকান্তিচন্দ্রের একটা ভ্রান্তি হয়েছে। তাঁর হু'টি সনেটেরই নাম রাখা উচিত ছিল—"বিফল"।

কূপমণ্ডুকেই সামান্ত কূপকে সমস্ত জগৎ বলে' ভেবে থাকে। নিজের মনের আলোয় পরকে দেখতে গেলে তাকে কোনকালেই চেনা যায় না—অচেনা থেকে যায়।

অসুখের ভাণ করে যা'রা হাঁসপাতালে নার্শদের সৌন্দর্য্য ও চোখের দৃষ্টির বিশ্লেষণ করতে যায় তাদেরই কলুষিত চোখ 'করিডোরে' লালসার স্বপ্ন সৃষ্টি করে। ন্যাবায় ভুগলে সব জিনিসই হলদে দেখায়—এত জানা কথা! ডাক্তার হ'তে গেলে যতখানি সংযম ও চরিত্রবলের দরকার—তা'র সহস্রভাগের এক ভাগও যদি এই সব ছ্যাবলা প্রণয়ীদের থাক্‌তো তা'হলে তা'রা নিজের চোখের লালসা দিয়ে হাঁসপাতালের বারাণ্ডার পবিত্রতাটুকু কলুষতার কালিতে কালো করতে পারত না।

জনৈক মনীশ ঘটক শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা নিজের নামে চালিয়াছেন ব'লে প্রকাশ। সবাই বল্‌ছে—ছিঃ! আর কবি ছিল না? শেষকালে প্রিয়ম্বদা দেবীর থেকে ?

কেই বা পড়্‌ত 'কর্ম্মচক্রের' কবিতা ? মনীশ ঘটকের কৃপায়ই না সবাইএর চোখে পড়্‌ল। উচিত প্রিয়ম্বদা দেবীর মনীশ ঘটককে খাইয়ে দেওয়া।

নওরোজ খালি ওপর-চালাকিতে ভর্ত্তি।
তাও তোতাপাখীর তোৎলামি সব।



একটী নিবেদন

"ধূপছায়ার" অনুগ্রাহকবর্গের কাছে একটী নিবেদন আছে আমাদের।

সাহিত্যজগতে যেদিন 'ধূপছায়া' প্রথম পদার্পণ করেছিল, সেদিন থেকে অনেক বাধাবিপত্তি সহ্য ক'রেই তা'কে অগ্রসর হ'তে হয়েছে। ইহার ভিতরে অনেক বন্ধুবান্ধব এবং অপরিচিত জনসাধারণের কাছে যে সব সহানুভূতি এবং সাহায্য পেয়েছি তা'র জন্য তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজ তাঁ'দেরই অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে আমাদের এই ছোট কাগজখানিকে নূতন কলেবরে কিঞ্চিৎ বড় করেই' গড়তে চাই।

আগামী মাস থেকে 'ধূপছায়া' প্রচলিত অন্যান্য বড় মাসিক পত্রিকাগুলির মত 'ডবল ক্রাউন সাইজে'র হবে।

এই পরিবর্দ্ধনের জন্য আমরা প্রতি সংখ্যায় এখনকার চেয়ে অনেক বেশী লেখা ছাপতে পারব। 'ধূপছায়ার' নিজস্ব ধারাটীকে ঠিক বজায় রেখেই গল্প কবিতা এবং প্রবন্ধের মধ্যে নূতন বৈচিত্র্য দেখাতেও চেষ্টা করব।

বর্দ্ধিত আকারে বিজ্ঞাপনদাতাদিগের বিজ্ঞাপনগুলিও অধিকতর প্রসারতা লাভ করবে একথা বলা বাহুল্য।

বিজ্ঞাপনের দর সম্বন্ধে আমাদের বাধ্য হয়েই কিছু পরিবর্ত্তন ক'রতে হবে। **তবে এতদিন যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন তাঁ'দের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি সুবিধাজনক বন্দোবস্ত ক'রতে রাজী আছি।**

এই বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে আমাদের সহিত পত্র বিনিময় করতে অনুরোধ করি।

নূতন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে মূল্যাদির কথা এই সংখ্যাতেই অন্যত্র ছাপা হয়েছে।

পত্রিকার দাম সম্বন্ধেও সামান্য পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

পয়লা আশ্বিন হতে 'ধূপছায়া' কার্য্যালয় ১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে উঠে যাবে। অতএব ভবিষ্যতে 'ধূপছায়া' সংক্রান্ত সমস্ত চিঠিপত্রাদি এবং টাকাকড়ি উক্ত ঠিকানায় পাঠা'তে অনুরোধ করি।

পরিশেষে বক্তব্য—নানা কারণে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্য্যাধ্যক্ষের ভার দিয়া এবং আপনাদিগের নিকট প্রণতি জানাইয়া বিদায় লইলাম। ইতি—

বিনীত—
শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য।
কার্য্যাধ্যক্ষ—"ধূপছায়া"

Printed at the Bela Printing Works,
14, Ramanath Mazumdar Street, & Published from
79/23, Lower Circular Road, Calcutta,
by Sj. Suren Bhattacharyya.